প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৫

প্রকাশক :
কংশো মিত্র
সাহিত্য প্রকাশ
৬০ জেমস লঙ সরণি
কলকাতা ৩৮

মুদ্রক :
শ্রীমতী রেখা দে
শ্রীহরি প্রিণ্টার্স
১১২/৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৪

: সূচীপত্র :

নাটক :

ছোটগল্প :

রম্য রচনা :

জুঁই ফুল ফুটল

: একটি রূপকথা :

গ্রামের নাম স্বস্তিপুর। রাম-লক্ষ্মণ পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গ্রাম। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ময়না নদী। এই নদীতে মাছ ধরে খায় মালোরা। সেই মালোদের সুন্দরী মেয়ে মুক্তা।

বসন্তোৎসব শুরু হয়েছে ফাল্গুন মাসে। গাঁয়ের ছেলেরা ও মেয়েরা এসেছে দল বেঁধে দেবতার মন্দিরে। নাচে গানে তারা মুখর করে তুলেছে বসন্ত উৎসবকে। এমন সময় গ্রামের প্রবীণরা ছুটে এল, খবর জানাল, নৌকো বোঝাই দিয়ে বিদেশী বণিক এসেছে। তারা দস্যু, ডাকাত। তারা লুটপাট করে নিয়ে যাবে গ্রামের ধনদৌলত মান সম্ভ্রম সব। উৎসব থেমে গেল। সবাই ছুটল বিদেশী বণিক দস্যুদের রুখতে।

মুক্তা আত্মভোলা। আপন খুসীতে আপনিই ভেসে বেড়াচ্ছে। দস্যুদের খবর শুনল সেও, কিন্তু বুঝতে পারল না কি তার অর্থ। অবুঝ খুসীর ঝোঁকে সে এসে দাঁড়াল ময়না নদীর ধারে।

বিদেশী বণিকদের তরুণ নায়ক অন্বেষণকুমার। মুক্তার মুখোমুখি এসে হাজির হল বিদেশী বণিককুমার। ব্যাকুল আগ্রহে চাইল তাকে নৌকোয় তুলে নিয়ে যেতে। মুক্তা আত্মরক্ষার জন্তে জলে ঝাঁপ দিল সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় ঝিনুক নিল তাকে আপন কোলে টেনে। অন্বেষণকুমার ব্যাপার দেখে হতভম্ব!

এদিকে জেলেরা মাছ ধরছে! সেই জালে ধরা পড়ল মস্ত এক ঝিনুক। ঠিক হল, রাণীকে দিয়ে আসবে তারা এই ঝিনুক উপহার হিসাবে, তার বিনিময়ে পাবে তারা অনেক বখশিস। এমন সময় এক গ্রামবাসী এসে জানাল, বিদেশী বণিকেরা গ্রামে দারুণ অত্যাচার চালাচ্ছে। সবাই জোট বাঁধল, তাদের তাড়াতে হবে। সশস্ত্র গ্রামবাসীরা বেরিয়ে পড়ল তাদের দূর করে দিতে।

ওদিকে রাণীকে দিয়ে এল জেলেরা সেই বড় ঝিনুকটি। মণিকার, ঝিনুক খুলে মুক্তর হার তৈরি করে দিল রাণীকে।

রাণীর হার দাসী শান্তা চুরি করে নিয়ে গেল রাত্রিবেলা। বিনুর উদ্যানে পুঁতে এল সেটা লুকোবার জন্যে। ভোরবেলা মালী ও মালিনী দেখল শান্তা বাগানে ঘুরছে একা একা। বুঝতে পারল না তারা কি তার ব্যাপার। এদিকে রাজবাড়ীতে হৈ-হৈ পড়ল। মন্ত্রী কোটাল সিপাই সবাই হুড়োহুড়ি শুরু করল চোর ধরার জন্যে। কিন্তু পাওয়া গেল না চোরকে।

পরদিন সকালে শান্তা এল বিনুর উদ্যানে তার সুহৃদ মহেন্দ্রের সংগে। খুঁজল পাতি পাতি করে, কিন্তু লুকান জায়গায় নেই সে হার। তাকিয়ে দেখল, সারা বন আলো করে তার বদলে ফুটেছে রাশি রাশি জুঁই ফুল। বুঝল মুক্তই ফুটেছে জুঁই ফুল হয়ে।

চরিত্র-লিপি

মুক্তা [ধীবর কন্যা], অশান্তা [রাণী], মহাভুজ [রাজা], মহেন্দ্র [পরিচারক], শান্তা [দাসী], অন্বেষণকুমার [বণিকপুত্র], কৃপাণপাণি [কোটাল]

প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

বসন্তোৎসব। মদন দেবতার মন্দিরে এসেছে গ্রামের ছেলেমেয়েরা

মেয়েরা : এল এলরে ফাল্গুন বনে বনে,
ভাসে কুসুম সৌরভ সমীরণে।
শোন বিহ্বল কোকিল ডাকে,
মুকুলিত কিংশুকে শাখে,
জাগে যৌবন হিল্লোল গগনে।

ছেলেরা : নাচ নাচ উদ্দাম উল্লাসে,
বাঁচ ঝঞ্ঝায় ঝঞ্ঝাটে ত্রাসে।
এই পল্লব পুষ্পিত কানন তলে,
হাতে হাতে ধরাধরি দলে দলে,
রেখ না মনের কোণে দুঃখ দৈন্য,
এই দিন শুধু হাসি খুসীর জন্য,
দেখ না সুমুখে পিছে কে যায় আসে ॥

[গ্রামবাসীদের প্রবেশ]

গ্রামবাসী : ঘরে আগুন লেগেছে যে,
ওরে খেয়ালী,
তবু তোদের কাটেনি ঘোর,
সাজাস দেয়ালী ?
পাসনি কি টের সাঁঝ সকালে
আসছে ওরা পালে পালে,
ঢালছে কানে হাজার সুরের
রঙীন হেঁয়ালী ॥

ছেলেরা : তারা কে, তারা কে ?
কোথেকে আসছে,
কোথায় থাকে ?
চায় কি, চায় কি ?
বল শুনি এক্ষুণি
চায় বা কাকে ?

শান্তির নীড়ে এই
ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই,
দূর কর ঘাড় ধরে
সব কটাকে ॥

গ্রামবাসী : নৌকো বোঝাই দিয়ে যারা হাজির হল কাল,
নাম না জানা ডাকাত তারা পিশাচ পঙ্গপাল।
তারা ধন ধান্য নিচ্ছে কেড়ে,
দেখলে মেয়ে আসছে তেড়ে,
মারছে মানুষ ঘাটে মাঠে,
করছে গ্রামের দারুণ হাল।
তারা পিশাচ পঙ্গপাল ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

ময়না নদীর ধার। মুক্তার প্রবেশ।

মুক্তা : আমি সাঁঝের শিয়রে জেগে রই,
দিগন্তে আঁকি সোহাগ সিঁদুর
বাতাসে বাতাসে কথা কই।
আমি ফুলকলিকার প্রাণ,
গাই দিন ফুরানর গান গো,
আমি অস্তরবির গভীর পিপাসা ভরা
দূর আকাশের সই ॥
আজ আর কোন কথা নয়, কথা নয়।
নিবিড় নীরবতা এ সময়।
তিমির আবৃত অরণ্য ছায়ায়
জোনাকি খুশির পাপড়ি ঝরায়,
ঝিঁঝির নূপুরে ঘুমের গান ঝুরে,
কঙ্কণ রুমু ঝুমু বনময়।
আজকে প্রদীপ জেল না বাতায়নে
পাংশু চাঁদ ঐ তাকায় ঝাউবনে,
পাপিয়া ওকে ডাকছে দূরে থেকে,
স্বপ্নে যেন কারা কথা কয় ॥

[অন্বেষণকুমারের প্রবেশ]

অন্বেষণ : কে আমায় নাম ধরে ডাকল ?
উদ্দাম কি পিপাসা জাগল।
বেদনার মৃত্যুর ভয় আর নাইরে,
হাসি দিয়ে দশদিক যেন কাছে পাইরে,
যৌবনে ঝলমল, আকাশ ধরণীতল,
সারা গায়ে শুভাশিস রাখল।
দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিই দ্বিধা ভয় ভাবনা,
পাবই তা এতদিন জেনেছি যা পাবনা,
নূতনের আহ্বানে চলি অজানার পানে,
অতীত সে পিছে পড়ে থাকল ।।

মুক্তা : মৌমাছি, ওরে প্রিয় মৌমাছি,
তোর আলো দিয়ে বোনা পাখনা,
তুই গুণ গুণ করে উড়ে যেতে যেতে
নাম ধরে তাকে ডাক না।
সে ফুলের কুলায়ে আছে চোখ বুঁজে
পরাগ রেণুতে অবলীন,
সে যে পাপড়ির দলে রঙে ঝলমলে
হাওয়া ছুঁয়ে চলে নিশিদিন।
তার একটু আবেশ অরণ্য থেকে
এইখানে এনে রাখ না ।।

অন্বেষণ : কে তুমি কোন স্বপ্ন লোকের রাণী,
দূরের থেকে পাঠালে হাতছানি ?
তেপান্তরের তৃষ্ণা বুকে নিয়ে,
তোমার দেশে এসেছি লুকিয়ে,
পাব তোমার পরম প্রসাদ জানি ।।

মুক্তা : যাও যাও তুমি অচেনা পথিক যাও,
আমার দুচোখে কেন অকরুণ চাও ?
আমি ভীরু প্রজাপতি
চির চঞ্চল গতি,

উড়ি ফুলে ফুলে কেন জানি নাক তাও ।।

অন্বেষণ : আমি উদ্দাম উন্মন,
আমি অফুরান যৌবন ।
আমি নিষ্ঠুর কামনায় মিশা,
নিখিল প্রাণের অতৃপ্ত তৃষা,
মৃত্যু সাগর পার হয়ে আসা
সুচির অন্বেষণ ।।
ওগো অচিন দেশের কন্যে,
ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে এলাম
শুধু তোমার জন্যে ।
তুহিন জমা মেরুর কোলে
নীল সায়রের অতল তলে,
খালি তোমায় খুঁজে বেড়াই,
হে চির অনন্তে ।।
পাহাড়তলীর শ্যামলা মেয়ে
চাওগো ফিরে চাও,
বুকে আমার জ্বলছে আগুন,
ফুলের ফাগুন,
জানতে কি তা পাও ?
গলায় তোমার পলার মালা দুলছে,
সাপের মত বিলোল বেণী ফুলছে,
ঝুমকো জবা পাপড়ি কি তার খুলছে ?
একটু মধু মৌমাছিকে দাও ।।

মুক্তা : আমায় পারবে নাক ধরতে,
পারবে নাক ।
যেমনি দাঁড়িয়ে আছ
তেমনি থাক ।
আমি বাতাসে উবে যাব,
নদীতে ডুবে যাব,
পাবেনা কেউ খুঁজে আর

যে যত ডাক ॥

নদী ওগো ময়না নদী

সাগরবাহিনী,

তোমার জলে যাক হারিয়ে

আমার কাহিনী।

কোলে তোমার নিলাম শরণ

এক করে দাও জীবন মরণ,

নাওগো কোলে ঝিনুক খোলে,

স্বপনদায়িনী ॥

[মুক্তা জলে ঝাঁপ দিল। মস্ত বড় একটা ঝিনুক খোলা খুলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে টেনে নিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

নদীর ধার। জেলেরা মাছ ধরে উঠে আসছে

একজন : আয় এবারে জাল গুটাই,
সারাটা রাত মাছ ধরেছি,
বাড়ল বেলা ভাই।
ঢের পেয়েছি রুই কাতলা,
চিংড়ি চিতল চাঁদা,
ভেটকি ভাঙড় ন্যাদস বোয়াল,
কাঁকড়া গাদা গাদা
মাছের নৌকা ডাঙায় তুলে
চল ফিরে বাসায় ॥

আর একজন : আরে আরে দেখ দেখ,
ঝিনুক এই এক
অদ্ভুত কি যে ইস।

আর একজন : বাহবা রে ভোল ওটা,
ভাঙিসনে রাখ গোটা
দিলে গিয়ে রাণীমাকে
পাব মোটা বখশিস।

অন্যজন : তাই হক, তাই হক,
ঠিক কথা বলেছিস ॥

প্রথম জন : যাব, আমরা রাজবাড়ীতে যাব,
ঝিনুক খুলে মুক্ত তুলে
রাণীকে দেখাব।
তাতে হবে নূতন হার,
খুলবে বিচিত্র বাহার,
রাজার হাতে শাল শিরোপা
বহুত এনাম পাব ॥

[একদল গ্রামবাসীর প্রবেশ]

গ্রামবাসী : ছি ছি, ধিক ধিক,
দুর্দিনে একি ঠিক ?
দেশ গেল মান গেল,
তাকাস না কোনদিক !

জেলেরা : কেন, কেন, হলটা কি ?
হলটা কি ?

গ্রামবাসী : হতে আর কি বাকী ?
মুক্তা ডুবল জলে
ঘর গেল রসাতলে
লুঠে নিল ধন জন
ভিনদেশী ও বণিক ॥

জেলেরা : সইব না, এ সইব না,
দাসের মত লাসের মত
ভূতের বোঝা বইব না।
ভাঙব শিকল শক্ত হাতে,
হানব আঘাত দিনে রাতে,
ওরা যারা খাচ্ছে লুঠে
মানুষ ওরা, দৈব না ॥

[সশস্ত্র গ্রামবাসীদের প্রবেশ]

গ্রামবাসী : জাগ বীর, জাগ বীর, জাগ বীর,

পরদেশী বণিকের বৈরিতা ক্ষণিকের
শেষ হয়ে যাবে এ মাটির ॥
জাগ জাগ লাঞ্ছিত যুগে যুগে বঞ্চিত
পীড়িত পৃথিবী পথ যাত্রী,
নূতন প্রভাত আসে নব আলো পূর্বাকাশে
অপগত বেদনার রাত্রি।
ভীতিহীন অন্তরে জেগে ওঠে ঘরে ঘরে,
উদ্ধত পৌরুষে দিগন্তে তোল শির ॥
নেই ভয়, নেই ভয়,
হবে জয়, হবে জয়।
এই দৈন্য যাতনা ব্যাধি বন্ধন,
এই ক্ষুধিতের ব্যথিতের ক্রন্দন,
এই অতল গ্লানির কাল রাত্রি
হবে হবে নিঃশেষে ক্ষয়।
এই ঈর্ষা অসূয়া লোভে পূর্ণ
পুরান দুনিয়া হবে চূর্ণ,
নতুন উষার প্রাচী শৈলে
নব দিনের হবে উদয় ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । প্রথম দৃশ্য

রাজবাড়ী। রাজা মহাভুজ ও রাণী অপরূপা জেগে উঠেছেন

রাণী ঃ যখন অচেতন ঘুমঘোরে,
ঘর থেকে মালা নিয়ে গেল কোন চোরে
সে যে দুচোখ জুড়ান মুক্তর হার,
হীরার ঝিনুকে ছিল বাসা তার,
সাগর রাণীর জমাট অশ্রু যেন
উঠে ছিল দেহ ধরে ॥

রাজা ঃ আদরের ধন থাকে না থাকে না রাণী,
তাই অবেলায় খোয়া গেল মালাখানি।
হয়ত কখন ক্ষণিকের ভুলে,

গলা থেকে হার রেখেছিল খুলে,
সেই অবসরে নিয়ে গেল হারে
কোন ঘরসন্ধানী ।।

[সহচরীদের প্রবেশ]

১ সহচরী : বল কে সে কে সে,
কোন ডাকাত সর্বনেশে
এই স্বপনপুরীর গোপন ঘরে
সিঁধ বসাল এসে !
তার সাহস ত কম নয়,
তার নেই মরণের ভয় ?
তাই মন্ত্র পড়া মোতির মালায়
হাত দিল সে হেসে ।।

২ সহচরী হয়ত কোন পরীস্থানের মেয়ে
খোলা জানাল দিয়ে,
জোৎস্না রাতে চুপি এসে
গেছে ও হার নিয়ে।
নয়ত রাত্রিজাগা পাখী,
দিয়ে রাজপুরীকে ফাঁকি,
গানে ঘুম পাড়িয়ে রেখে
নেছে দু-ঠোঁটে উঠিয়ে ।।

রাণী : না, না, নারে,
এসব অলীক, কথা তোর,
আমি জানি ঠিকই মনে
নেহাৎ চেনা চোর !

রাজা : দাসদাসীতে এতগুলো
কেউ দিয়েছে চোখে ধুলো,
সরিয়ে নেছে আলতো হাতে
রাত্রি যখন ভোর ।

রাণী : আমার এখনি চাই চোর ।।

রাজা : জাগো জাগো সব সিপাই সলাস্কার,

পাইক পিয়াদা প্রতিহারী চোপদার।
তোল রে হট্টগোল
বাজাও নাকড়া ঢোল,
যেই হক চোর দাসী কি নফর,
কর তাকে গ্রেপ্তার ।।

সহচরী : জাগ জাগ.........চোপদার।

নেপথ্যে : পালারে, পালারে, পালারে,
সকাল বেলা একি জ্বালারে !
ধর ধর মার মার,
চার দিক তোলপাড়,
চুরি গেছে মুক্তর মালারে ।।

রাজবাড়ী। কোটাল কৃপাণপাণি ও দাসদাসী

কৃপাণপাণি : রাণীর গলার মুক্তমালা
কে করেছে চুরি ?
আমার কাছে চলবেনাক
ওসব জারিজুরি।
জনে জনে ধরব ঘাড়ে
করব সাবাড় এক আছাড়ে,
নয় হাত পা বেঁধে চৌমাথাতে
দোব গলায় ছুরি ॥

১ দাসী : বারে বেশ ও জুলুম দেখি,
যাকে তাকে চোর সাজান, একি ?
আমরা গরীব রাত্রিদিনে
খাটনি খেটেই কূল পাইনে,
হারে মুক্ত কাকে বলে
আমরা জানি সেকি ॥

কৃপাণপাণি : রাখ ন্যাকামি রাখ,

মেরে বানাব জয়ঢাক।
ধরে মুড়াব চুল,
ফোটাব হুল,
কাটব কান নাক॥

১ দাস : অমন সবাই দেখায় ভয়,
এটা মগের মুল্লুক নয়।
রাণীর গলায় ছিল কিসের হার,
দাসী বাঁদী কি খোঁজ রাখে তার ?
মিছি মিছি চোখ রাঙানি…
এ কোন অত্যাচার ?
এমন হলে বিদ্রোহ নিশ্চয়॥

সবাই : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিদ্রোহ দরকার,
জুলুম চলবে নাক আর।
ডাক তোমার লোক,
হক তদন্ত হক,
দেখুক তারা পায় কি না পায়
রাণীর গলায় হার॥

কৃপাণপাণি : পায় যদি কি করবি ?
ফাঁসি কাঠে মরবি ?

সবাই : না পায় যদি তুমিও পাবে
উচিত জবাব তার।
হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিদ্রোহ দরকার॥

তৃতীয় দৃশ্য

কিন্নর বন। শান্তার হার হাতে প্রবেশ

শান্তা : এই মিনতি জানাই করজোড়ে,
আজকে উঠ সূর্য ঠাকুর
অনেক দেরী করে।
এই পাতায় ঢাকা পাখী ডাকা
ছায়ার আস্তরণ,

এই গন্ধে বিধুর বয় ঝুর ঝুর
অধীর সমীরণ,
এ বন থাকুক আমার সুখের
স্বপনে বুক ভরে ॥

[মালী ও মালিনীর প্রবেশ]

মালী : প্রভাত জাগ জাগ
জাগ শিশির ভেজা ঘাসে,
তরুণ অরুণ রাগ
হের দূর দিগন্তের ভাসে ।
জাগ কুসুম কোমল চক্ষে,
ঢাল গন্ধ মাধুরী অলক্ষ্যে
আন শুভদ শান্তি ধারা
এই নির্মল ধরণী আকাশে ॥

মালিনী : ফুল বাগানে কে ও
এই নিঝুম ভোরবেলা,
কেউ সঙ্গে ত নেইও,
কেন বেড়াচ্ছ একেলা ?
বুঝি রঙ লেগেছে বুকে,
তাই ঘুম গিয়েছে চুকে,
খেয়ে ফুলে ফুলে মধু
খেল আপন খুসীর খেলা ॥

শান্তা : বন থেকে কে বাঁশী বাজায়
মন কেড়ে নেয় স্বরে,
ঘরে থাকি কেমন করে ?
উদাসী তাই ঘুরে বেড়াই
বনে বনান্তরে ।
তাকে ধরব কেমন করে ॥

মালিনী : তুই পাগল নাকি ?
না এ তোর সব চালাকি ?
বাঁশী সে কি বনে বাজে ?

না ও তোর মনের মাঝে ?
বল দেখি তোর
বাসনা কি ॥

[স্বপ্নরূপে মুক্তার প্রবেশ]

শান্তা : কে আসে নেচে নেচে লঘু পায়,
ঝুম ঝুম।
পরশে সারা বন চোখ চায়,
ভাঙে ঘুম।
চমকে হাই তোলে ফুলকলি,
গুঞ্জনে মেতে ওঠে শত অলি,
বাতাসে নাচনের লাগে ধুম,
ঝুম ঝুম ॥

তৃতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

কিন্নর উদ্যান। ভোর বেলা শান্তার প্রবেশ

শান্তা : হাজার জোনাকী ফুল হয়ে কেন হাসে ?
বাদল হাওয়ায় কিসের সুরভি ভাসে ?
আমার লুকান মুক্তর হার,
ফুল হাসি একি তার ?
আবছা আঁধারে খুঁজে মরি তারে,
সুবাসে তন্দ্রা আসে।

[শান্তার সুহৃদ মহেন্দ্রের প্রবেশ]

মহেন্দ্র : আজ কি আসবে তুমি মেঘলা রাতে ?
বল আসবে নাকি ?
এই পিউ পিউ পাখী গাওয়া মেঘ জ্যোছনাতে
বল আসবে নাকি ?
আজ সবার ঘরের দোর বন্ধ করা,
ঘুমের নেশায় বুঁদ বসুন্ধরা,
শুধু তোমার জন্যে চাঁদ আকাশে জাগে,
আর মাটিতে তৃপ্তিহীন আমিও জাগি।

এস তেপান্তরের গান বাঁশীতে ধরে
ওগো সুরের পরী,
এস ফুটিয়ে কদম কেয়া বনান্তরে,
পরে নীলাম্বরী।
দেখ তোমার জন্যে দোর খোলাই রাখি,
বল আসবে নাকি ॥

শান্তা আমার গোপন অপরাধ
হে প্রিয় কখনো যদি জানতে,
যদি জানতে কি গভীর বিষাদ
জলে ধূ ধূ এ হৃদয় প্রান্তে!
জানিনা কি ক্ষণিকের ভুলে
নিষেধের বাতায়ন খুলে
দুরাশার আকাশ কুসুম
গিয়েছি সেদিন তুলে আনতে ॥

মহেন্দ্র কাটালে সারা বেলা রোদনে,
এবার প্রাণ খুলে হাসতো।
ঝরছে ঘন জল শ্রাবণে
খুসীর সে প্লাবনে ভাসতো।
থাকুক হায় দেবী বেদনা শোক,
সাহসে উঠে বস মোছ চোখ,
বাজিছে বরষার যে সুর ভরসার
আজকে তাকে ভাল বাসতো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঐ উদ্যান। ফুল পরীদের প্রবেশ

পরী: ওঠ ওঠ জেগে ওঠ,
পাখী ডাকা ছায়া ঢাকা
এই অরণ্যে জেগে ওঠ।
হাসিতে দিক আলো করে,

ঘনের অঁাচল দাও গো ভরে
ভোরের আলোয় নূতন রূপ,
ফুলে ফুলে আপনি ফোট।

বৃষ্টির মঞ্জীরে রুম ঝুম
রূপমতী ও কে আছ রঙ্গে ?
ওর চঞ্চল চাহনি দুচোখের
চমকায় চপলা ভ্রূভঙ্গে।
মেঘ দুকূলে ঢাকা কদম্বকুঞ্জ,
রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ নূপুর শুনছ ?
ও আসে উল্লাসে অরণ্য ময়ূরীর
উদ্বেল নৃত্য তরঙ্গে।

[পুষ্পময়ী মুক্তার প্রবেশ]

মুক্তা : গোপনে আমি লুকায়ে থাকি
গভীর বন ছায়,
সবুজ ঘাসে জোনাকী হাসে
যেখানে পায় চায়।
পাতার ফাঁকে ডাইনে বামে,
চুমোর মত জ্যোৎস্না নামে,
ফুল পরীরা উড়ে বেড়ায়
রেশমি চাদর গায়।

ওগো আমাকে চেন না কেউ,
আমি বাদল দিনের জুঁই ফুল।
তুলে হাওয়ায় সুরভি ঢেউ,
ভরি রাতের কাজল ঘন চুল।
দিই আকাশে বাতাসে হাসি মেলে,
ফুটি সজল সবুজ মাঠে বনে,
চলি অলস হাওয়ায় হেসে দুলে
একে স্বপন মদির অঁাখি কোণে'

সবার গলায় মালা হয়ে
দোল খাই দোদুল দোদুল।

পরী : বাদল দিনের আদর ভরা
ও রূপালী জুঁই,
কানন রাণীর শ্যামল গলায়
মুক্তামালা তুই।
সোহাগে তোর আনন্দিত
আকাশ পৃথিবী,
মুগ্ধ মাটির সোহাগে আজ
সাড়া কি দিবি ?
সৌরভে তোর স্বপনপুরীর
বন্ধ দুয়ার ছুঁই !

যবনিকা

আলোর সংকেত

চরিত্র-লিপি

সুখ, স্বপ্ন, আনন্দ, জ্যোতি, আশা, বিশ্বাস, মেহনৎ, সুবুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি, আলো, অন্ধকার, কণা, রতন, মণিধর, হিমসাগর, দুধসাগর, শঙ্খচূড় ও চন্দ্রচূড়।

[এই নাটকের কোন চরিত্রই মানুষ নয়। প্রত্যেকে এক একটা মানবায়িত ভাব। হাসি কান্না ও জন্ম-মৃত্যুর আলো আঁধারি অতিক্রম করে, অবিশ্বাস ঘৃণা ও হিংসার জটিলাবর্ত এড়িয়ে, যে অন্ধ জীবন প্রবাহ চলেছে দুর্নিরীক্ষ্য অজ্ঞাতের অভিমুখে, তার পথ চলা যেখানে এসে ফুরায়, সেখানে দেখা যায় যাওয়াটাই শেষ কথা, গন্তব্য বলে কিছু নেই। তা কি নির্বেদ, না মোক্ষ, না অবসান, সে প্রশ্নটিই তুলে ধরা হয়েছে এই নাট্যে।]

১.

জ্যোৎস্না রাত্রি। মাঠের মাঝে আনন্দ, সুখ, স্বপ্ন ও জ্যোতি বসে বসে আগুনে গাছশুদ্ধ কাঁচা ছোলা ঝলসাচ্ছে, আর খাচ্ছে। একজন বাজাচ্ছে ঢোল, আর একজন করতাল। বাকিরা দিচ্ছে হাততালি। আস্তে আস্তে দুটি লোক এসে দাঁড়ায়। তাদের নাম আলো ও অন্ধকার।

আনন্দ: তোমরা কারা গো?

আলো: আমরা? আমাদের তোমরা সবাই চেন, শুধু চোখেই দেখনি। আমার নাম আলো, এর নাম অন্ধকার। আমরা আসছি সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে।

সুখ: তোমরা কি দু-ভাই।

অন্ধকার: বলতে পার। আবার দু-বন্ধুও বলতে পার। আসলে আমরা একই সত্তার দু-পিঠ।

স্বপ্ন: তা অতদূর থেকে এলে কি করে?

আলো: আমরা এসেছি হাওয়ায় হেঁটে। চাঁদের আলোর সুতো ধরে ঝুলতে ঝুলতে ঝুপ করে নেমে পড়েছি মাটিতে।

আনন্দ: কি কর তুমি?

আলো: আমি? আমি দিই ফুলের পাপড়িতে রং আর গন্ধ। পাখীর গলায় দিই গান।

জ্যোতি: তাহলে ত তুমি ভারী বাহাদুর। আর তুমি?

অন্ধকার: আমি? আমি আনি চোখের পাতায় কান্না, হাসির আলো দিই ধপ করে নিবিয়ে।

সুখ: ও: তাহলে তুমি ত আরো বাহাদুর!

স্বপ্ন: বুঝতে পারছি দু-জনেই তোমরা এমন কিছু খেয়েছ, যা পেটে পড়লে মাথায় ঘুরপাক শুরু হয়, চোখের চাওয়া যায় ঘুলিয়ে।

আলো: ঠিক বলেছ। আমাদের দেশে ফোটে রাশি রাশি মধুকষার ফুল। সে ফুল ফোটে শীতের শেষে। দুধে মধুতে টুস টুস করা সেই ফুল গোটাকতক খেলে সত্যিই পা ফেলে হাঁটা যায় হাওয়ার ওপর।

অন্ধকার: শুধু কি আমরা? হরিণ খরগোস কাঠবিড়ালী ময়ূর সবাই খায়, আর খুশীতে হাল্কা হয়ে নাচে।

আনন্দ: ভারী মজার দেশ ত তোমাদের। নিয়ে যাবে আমাদের?

অন্ধকার: ঠিক সময়ে নিশ্চয় নিয়ে যাব। শুধু তোমাদের নয়, সকলকেই। গেলে দেখবে সেখানে দুঃখ নেই, কান্না নেই। ভয়-ভাবনা, অভাব কষ্ট কিছু নেই।

আনন্দ: তবে যে বললে তুমি চোখের পাতায় কান্না নিয়ে আস, ঘরে ঘরে দাও হাসির আলো নিবিয়ে?

অন্ধকার: সে ত তোমাদের এখানে। আমরা যেখানে থাকি সে দেশ ওসবের বাইরে।

জ্যোতি: তাহলে ত তোমরা সুবিধের লোক নও। আমাদের মুল্লুকে এসে খালি ভালকে কাল কর।

আলো: কিন্তু শুধু ত ও নয়। আমিও আছি যে ওর পিছন পিছন। নিবোন আলো আমি আবার জ্বালিয়ে দিই, ঝরে পড়া আশা জীইয়ে তুলি আবার।

স্বপ্ন: দু-জনে বুঝি এই ভাঙা-গড়াই করে চলেছ তোমরা দিনরাত।

অন্ধকার: হ্যাঁ। কিন্তু এক এক সময় মন হাঁপিয়ে ওঠে আমাদেরও। তখন হুট করে সব ফেলে পালিয়ে আসি আমরা তোমাদের দেশে। এক চক্কর ঘুরে গিয়ে মন দিই নিজের নিজের কাজে।

আনন্দ: আজ বুঝি সেই ভাল না লাগার দিন তোমাদের? তাই চলে এসেছ আমাদের নিশ্চিন্দিপুরের এই নির্জন মাঠে?

আলো: হ্যাঁ দেখলাম তোমরা চাঁদের আলোয় মাঠের মাঝখানে বসে গাছশুদ্ধ কাঁচা ছোলা ঝলসিয়ে খাচ্ছ, আর ঢোল করতাল বাজাচ্ছ। ইচ্ছে হল তোমাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে খানিকক্ষণ আমোদ করি।

স্বপ্ন : বেশ, বসে যাও। না, না, চল বরং ঐ ঘরটায় নিয়ে যাই। তোমাদের মত মধুকষার ফুল হয়ত নেই আমাদের। তবে তারই মত হাওয়ায় ওড়ানর জিনিস আছে একটা আমাদেরও, যা খেলে তাক লেগে যাবে।

জ্যোতি : ঐ যে দেখছ দীঘির পাড়ে সারি সারি আকাশছোঁয়া গাছ, ওর মাথা থেকে নামিয়ে আনি আমরা।

অন্ধকার : তাই নাকি? তাহলে চল একটু খেয়েই দেখি। যাবি?

আলো : যাব না? নিশ্চয় যাব।

সুখ : চলরে চল। নূতন বন্ধুদের নিয়ে তাহলে আজ একটু নূতন আমোদ করা যাক।

সকলের প্রস্থান। একটু পরে আলো আর অন্ধকার ছাড়া অন্যদের প্রবেশ।

আনন্দ : ভাঙা নীলকুঠির গুদামে থাক ওরা তালাবন্ধ হয়ে। দিন কতক পরে ছেড়ে দিলেই হবে।

জ্যোতি : তখন কিন্তু বেশ করে ধোলাই দিয়ে দিতে হবে দু-জনকেই।

সুখ : নিশ্চয়। পাগলামির আর জায়গা পায় নি!

২.

খামার বাড়ির উঠান। সকালে আশা, বিশ্বাস আর মেহনৎ মিস্ত্রী দু-হাতে চোখ ঢেকে বসে আছে। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে সুবুদ্ধি সর্দার হাত নেড়ে বক্তৃতা করছে। তার চোখে কালো ঠুলি। খোলা চোখে শুধু বাচ্চা রতন দাঁড়িয়ে আছে সর্দারের জামা ধরে।

সুবুদ্ধি : গ্রামের সমস্ত মানুষ কানা হয়ে গেল। আর সেই ফাঁকে সকলকার ক্ষেতের ধান নৌকয় উঠিয়ে নিয়ে সোজা চলে গেল ভিনদেশী মহাজনরা। দাম বলে দিয়ে গেল না একটা কানা-কড়িও। কেমন করে হল্ল এমনটা?

বিশ্বাস : কি করে বলব সর্দার? নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে কে যেন দুটো তিনটে ফুঁ দিল বাঁশীতে। সঙ্গে সঙ্গে বেতাল হয়ে গেলাম সবাই। তাকিয়ে দেখি সামনে নেমেছে অমাবস্যার কালি।

আশা : দেখতে পেলাম না কিছু! আওয়াজে টের পেলাম মরাইয়ের ধান নৌকায় উঠল। বুঝলাম ঝুপঝাপ দাঁড়ের ঘায়ে জল নৌকা দক্ষিণে পাড়ি জমাচ্ছে। বুদ্ধি হারিয়ে আঁকুপাঁকু করতে লাগলাম। করা হল না কিছু। চোখের সামনে থেকে লুঠ হয়ে হয়ে গেল সবকিছু।

মেহনৎ : সব মিথ্যে হয়ে গেল সর্দার। সব খাটুনি পণ্ড হল। সব ভরসা তলালো জলের নীচে।

বিশ্বাস : এখন ত দুনিয়া আছে কি নেই, জীবন থাকবে কি যাবে, খেতে পাব কি না খেয়ে মরব, কিছুরই ঠিক ঠিকানা নেই। গ্রামকে গ্রাম চোখ হারিয়ে বন্দী হয়েছি অন্ধকারের হাতে। এ থেকে কে বের হবার রাস্তা দেখাবে ?

মেহনৎ : বেঁচে থাকার আসল পুঁজি হল আলো। তাই আনে আশা, জাগায় আনন্দ, আর এই দুয়ের জোরেই দেহ খাটায় মানুষ। তা দিয়ে মাটিতে সোনা ফলায়, আকাশে ওঠায় ইমারত।

আশা : সেই আলোই হারিয়েছি আজ আমরা !

বিশ্বাস : সর্দার মশাই, তুমি যদি কাছে থাকতে, যদি দিতে একটা কোন সুবুদ্ধি, তাহলে কি আর এমনটি হয়।

আশা : তাহলে রুখে দাঁড়াতাম সবাই। ডুবিয়ে দিতাম মহাজনি বজরা এক এক করে নদীর জলে।

সুবুদ্ধি : ভাইরে তোমাদেরই মত চোখ হারিয়েছি যে আমিও। বুদ্ধির পুঁজি খোয়া গেছে যে আমারও। ঐ যে ভিনদেশী মহাজনী নৌকা, ওর পিছু পিছু এসেছে ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে মোহন বাঁশীওয়ালা। তার বাঁশী যে শুনছে, সেই চোখ হারাচ্ছে, হারাচ্ছে বুদ্ধির সম্বল।

বিশ্বাস : কে এই মোহন ? ধরা যায় না তাকে ? নিশ্চিন্দিপুরের মশানে এনে বলি দেওয়া যায় না ? ডুবিয়ে মারা যায় না বারুণীতলার কুয়োয় ফেলে ?

সুবুদ্ধি : না রে ভাই, সে নাকি পরমেশ্বরের অংশ। তার নাকি ক্ষয়-ব্যয় নেই, মৃত্যু নেই। যাদুর ফাঁদ পেতে সে নাকি এমনি করেই চিরদিন মানুষের চোখের নজর আর মাজের বুদ্ধি লুট করে নেয়। তাদের বানায় কেনা গোলাম। আপন সর্বনাশ তাই ঠিক ঠিক বুঝতেও পারে না কেউ।

মেহনৎ : তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কেন সর্দার ?

সুবুদ্ধি : আজ পারছি, কাল হয়ত পারব না আর। ঠাকুর ঠাকুর করে তার পিছন পিছন নাচতেই শুরু করব হাত তালি দিয়ে !

আশা : কোনই কি উপায় নেই তা হলে ?

সুবুদ্ধি : আছে। রাজবদ্যি বলেছেন এখান থেকে অনেক অনেক দূরে, পূর্বস্থলী পরগণার করুণাপুর মহল্লায় আছে ঝুমুর নদীর কোলে কোমর বাঁকা একটা পাহাড়। তার নাম বেতন পাহাড়। তা থেকে বেরিয়েছে যে ঝর্ণা, তার জল চোখে পড়লেই নজর ফিরে আসবে সকলের।

বিশ্বাস : কিন্তু কে যাবে আনতে ? সবাই ত অন্ধ আমরা।

রতন : আমি যাব। আমি ত বাঁশী শুনি নি, চোখও তাই অন্ধ হয়নি আমার। তোমরা আশা করে থাক, জল নিয়ে এলাম বলে আমি।

সুবুদ্ধি : তাই যা দাদু। ভেঙে দে তুই অন্ধকারের পাঁচিল। নিয়ে আয় নূতন দিনের আলো, নূতন মন আর চোখ নিয়ে তাকাবে মানুষ দুনিয়ার দিকে।

৩.

বিকেল নিশ্চিন্দিপুরের জঙ্গলে কাঠ কাটছে আনন্দ, সুখ, স্বপন, আর জ্যোতি। জঙ্গলের নীচে দিয়ে বইছে বীড়াই নদী। তার কিনারা ঘেষে উঠেছে একরাশ কালকাশিন্দা ও ফণী মনসার ঝোপ। চারদিকে উঠছে রকমারি পাখীর কিচির মিচির।

দূরে রাখাল ছেলেদের গান।

শাল মহুলের মিষ্টি ছায়ায় নাম না জানা পাখী,
সারা বেলা কাকে এমন
করছে ডাকাডাকি।
ছিল সে কোন সোনার দেশে,
যাবে কোথায় খেলার শেষে,
দেখতে কেমন সেই পাখীটা,
কেউ তা জানিস নাকি ?
মন ছুটে যায় ধরবে বলে
যায় না তাকে ধরা,
আকাশ বাতাস জল মাটি তার
সুরের ছোঁয়ায় ভরা,
সেই পাখীকে দেখবি যদি
আয় লুকিয়ে থাকি।

স্মৃতি আর ধৃতির প্রবেশ। হাত ধরাধরি করে যেতে যেতে ঘন ঝোপের মুখে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তারা।

আনন্দ : তোমরা কারা গো ? অবেলায় এই কাঁটা জঙ্গলে ঢুকছ ? ওখানে সাপ আছে, গোসাপ আছে, আছে লম্বা লম্বা দাঁড়াওয়ালা কাঁকড়া বিছে।

স্মৃতি : আমরা দুই বোন। আমার নাম স্মৃতি, ওর নাম ধৃতি। আমরা বেরিয়েছি আমাদের গাই খুঁজতে।

ধৃতি : বুধী আর রুণী দুটো গাই আছে আমাদের। বরফের মত ঠাণ্ডা গা তাদের ক্ষীরের মত মিষ্টি দুধ।

স্মৃতি : দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। এখনো বাড়ী ফেরেনি।

সুখ : ভাবনার কথা বৈকি। হয়ত হুঁড়ারে টেনে নিয়ে গেছে।

স্বপ্ন : না, না, এখনো পশ্চিমে একটু লালের ঝিলিক রয়েছে। এখনি হুঁড়ার বেরবে না। তোমরা বাড়ী যাও, হয়ত এতক্ষণ গোয়ালেই ফিরে এসেছে তারা।

ধৃতি : যাব কেমন করে? আমরা কি দেখতে পাই?

আনন্দ : কেন দেখতে পাও না?

স্মৃতি : আমরা যে মোহনের বাঁশী শুনেছি! ও শুনলে আর চোখ থাকে কি মানুষের? আমাদের গ্রামের সবাই শুনেছে, সবাই হয়ে বসে আছে অন্ধ। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পথ হাঁটি এখন আমরা।

সুখ : মোহনের বাঁশী? মোহন কে?

ধৃতি : জান না? শোন নি তার নাম? মোহন যাদুকর। তার বাঁশীতে ভেল্কী আছে, শুনলেই ঝুপ করে আলো নিবে যায় মানুষের চোখের।

স্মৃতি : তোমরা বুঝি শোন নি সে বাঁশী?

স্বপ্ন : না ত।

ধৃতি : তোমরা তাহলে দেখতে পাও?

জ্যোতি : পাই বৈকি। এই ত তোমাদের দেখছি। দেখছি আকাশ জল বন মাটি।

সুখ : দেখছি নদীর রং বদলাচ্ছে। দেখছি ওপারে ঘরে ঘরে পিদিম জ্বলে উঠছে সন্ধ্যার।

ধৃতি : আমরাও একদিন তোমাদের মতই সব দেখতে পেতাম গো। আমাদের সেই দেখার দিন ফুরিয়েছে।

আনন্দ : সত্যি ভারী দুঃখের কথা। আমাদের নিশ্চিন্দিপুরে কিন্তু সবাই দেখতে পায়।

স্মৃতি : কি ভাগ্যি তোমাদের! তোমরা দিনের আলোয় চোখ মেলে দেখ সূর্য উঠছে, ফুল ফুটছে, ফুলে ফুলে উড়ছে প্রজাপতি।

ধৃতি : রাতের নীল পর্দায় ছড়ান রাশি রাশি চুমকির মত দেখি রূপালি তারার ঝিকিমিকি।

স্মৃতি : আর আমাদের? আমাদের খালি রাতের পর রাত, তারপর রাত, তারপর রাত।

জ্যোতি : চল, তোমাদের বাড়ী পৌঁছে দিই গে। কি নাম, তোমাদের গাঁয়ের গো?

ধৃতি: আমাদের বাড়ী বীড়াই নদীর পূব পারে সান্ত্বনা গ্রামে।

স্বপ্ন: আচ্ছা, এই ধর দু-জনে আমাদের দু-জনের দু টো হাত।

সুখ: নিয়ে যাচ্ছি আমরা তোমাদের অন্ধকারের সীমানা পার করে।

ছোট্ট ঝুমুর নদীর এক পারে উঁচু পাথরের প্রাচীরের ঘেরা বাগান, অন্য পারে ঢালু পাথুরে পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে দক্ষিণে অনেক দূর। এই পথে এসে দাঁড়াল রতন। তার কাঁধে একটা ন্যাকড়ার ঝোলা, হাতে তালপাতার ছাতা। তখন দুপুরবেলা।

রতনের গান

আমার নেইক কোন ভয়,
হক না বাধা যতই কঠিন,
করব তাকে জয়।
পাষাণ প্রাচীর থাকুক খাড়া,
ভিত ধরে তার দোব নাড়া
হাঁকে ডাকে তুলব সাড়া
সারা পাড়াময়।

৪•

প্রাচীরের ওপর থেকে মুখ তুলে তাকাল নাগকন্যা কণা।

কণা: এমন মিষ্টি গলায় কে গান করছিল গো? তুমি?

রতন: হ্যাঁ। ভাল লেগেছে, তোমার?

কণা: খুউব। তোমার গানও ভাল লেগেছে, তোমাকেও ভাল লেগেছে। তোমার নাম কি?

রতন: আমার নাম রতন। সান্ত্বনা গ্রাম থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি এখানে, ঝুমুর নদীর ধারা ধরে।

কণা: সত্যি তুমি রতন। যাবে কোথায় তুমি?

রতন: যাব কেতন পাহাড়ে। সেখানে আছে যে ঝর্ণা তার মোহনা থেকে জল নিয়ে আসব। গ্রামের লোকের অন্ধ চোখের আলো ফিরিয়ে আনব, তা ছিটিয়ে দিয়ে।

কণা: কেতন পাহাড়ের ঝর্ণায়? ওরে বাবা! সেখানে হাজার হাজার শঙ্খচূড় সেপাই ফণা তুলে পাহারায় আছে দিনরাত। সেখানে যেও না রতন।

রতন: পাহারাদাররা আমায় দেখতেই পাবে না। আমার কাছে আছে এমন একটা মজার বাঁশী, যা বাজালে সবাই অন্ধ হয়ে চারদিকে দৌড়ে পালাবে।

কণা : সে বাঁশী কোথায় পেলে তুমি ?

রতন : শুনবে ? মোহন যাদুকর সেই বাঁশী বাজিয়েই ত গ্রামের মানুষদের অন্ধ করে দিয়েছে। বাঁশীটা কিন্তু আর তার কাছে নেই। সেটা কিনারায় রেখে মোহন নেমেছিল নদীতে চান করতে। সেই ফাঁকে পালিয়ে এসেছি আমি, সেটা উঠিয়ে নিয়ে।

কণা : বাজাও ত সেই বাঁশী। দেখি কেমন শুনতে !

রতন : সর্বনাশ ! সে বাঁশী শুনলে আর তুমি কিছু দেখতে পাবে না। এক্ষুণি অন্ধ হয়ে যাবে।

কণা : তাহলে থাক। তুমি বরং তার বদলে আর একটা গানই গাও।

রতন : গান শুনবে ! আচ্ছা দাঁড়াও। আমি আগে সাঁতরে পার হই, পাঁচিলে উঠে তোমার কাছে যাই, তারপর গান শোনাচ্ছি।

কণা : না, না, অমন কাজও কর না। এটা হল নাগেদের বাগান। এখানে লতাপাতা, ফুল-পাখী যেখানে যা আছে সব মিথ্যে। আসলে এখানে সবই সাপ, সবাই সাপ। তুমি নামলে তোমাকেও ওরা সাপ করে দেবে গায়ে ফুঁ-দিয়ে।

রতন : কিন্তু আমার যে তোমাকে খুব ভাল লাগছে। ইচ্ছে করছে তোমার কাছে যেতে। তোমার সঙ্গে গল্প করতে। তোমাকে গান শোনাতে।

কণা : তাহলে এক কাজ কর। সোজা চলে যাও দক্ষিণে হাঁটতে হাঁটতে। ঝুমুর নদীর মোহনায়, যেখানে পাহাড়ের বুকে মাথা রেখে দামাল ছেলের মত গা এলিয়ে শুয়ে আছে নদীটা, আর দিনরাত খলখল হেসে খালি খেলা করছে হাত পা ছুঁড়ে, সেখানে আছে মাজা বাঁকা একটা বাদামী রঙের জয়ন্তী গাছ। তার নীচে বসে অপেক্ষা করগে। আমি আসছি।

রতন : ঠিক আসবে ত ? দেরী কর না কিন্তু। হ্যাঁ কি বলে ডাকব তোমায় বললে না ত !

কণা : আমার নাম কণা। একদিন আমিও মানুষদের মেয়ে ছিলাম। আমার বাড়ী ছিল আমার ঐ কেতন পাহাড়েই। নাগেরা ঘুমের মধ্যে আমাকে তুলে এনে মন্তর দিয়ে নাগকন্যা করেছে। তোমার হাতের ছোঁয়া পেলেই দেখ আবার আমি মানুষ হব।

রতন : চলে এস তাহলে এক্ষুণি। আমি এগোলাম।

কণা : হ্যাঁ, আর একটু অাঁধার হলেই নাগকেশরের বন পেরিয়ে দক্ষিণের দেউড়ি

দিয়ে বেরিয়ে যাব চুপি চুপি। বাঁশীটা কিন্তু সঙ্গে রেখ। দূর থেকে যেই নাগদের দেখতে পাবে, বাজাতে ভুল না যেন কিছুতেই !

রতন : না, ভুলব না। তুমিও কিন্তু ভুল না আমার খোঁজে পথে পা বাড়াতে।

৫.

বেগুনবাড়ীর রাস্তা ধরে চলেছে স্মৃতি ও ধৃতি। আনন্দ আর জ্যোতি চলেছে তাদের হাত ধরে পথ দেখিয়ে। স্মৃতি ও ধৃতির চোখে বাল কাপড়। আনন্দের গলায় একটা ঢোল, জ্যোতির হাতে এক জোড়া করতাল। তখন দুপুর।

আনন্দ : কি বললে তোমাদের ভাইয়ের নাম ? রতন ?

জ্যোতি : সুন্দর ফুটফুটে একটা ছেলেকে ঢের দিন রাস্তায় দেখেছি। তার নামও রতন। খাসা গান করে। তার গানে ফুলেরা চোখ মেলে। দক্ষিণ হাওয়া পথ হারিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দীঘির বুকে।

স্মৃতি : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেইত আমাদের সোনা ভাই।

ধৃতি : ওরকম রতন এদেশে মোটে একটাই আছে। ভোরের আলো দিয়ে তৈরি তার দেহ। অপরাজিতার পাপড়ি দিয়ে গড়া তার চোখ। আর ফাল্গুনী কোকিলের গান দিয়ে সাধা তার গলা।

আনন্দ : বেশ চল, এগিয়ে যাই। ঠিক খুঁজে পাব তাকে এক্ষুণি। এই সড়ক ধরে কয়েক রশি হেঁটে গেলে পড়বে উথলির মাঠ, তারই আঁচল ধরে বয়ে গেছে ঝুমুর নদী। সেই নদীর মোহনাতেই আছে কেতন পাহাড়। আর তারই গা দিয়ে নেমেছে ঝর্ণা।

জ্যোতি : শুনেছি সেখানে লম্বা লম্বা দেবদারুর মত শঙ্খচূড় সাপেরা দিন রাত দাঁড়িয়ে থাকে পথ আগলে। দূর থেকে নিঃশ্বাস দিয়ে টেনে নেয় তারা মানুষকে। যাওয়াই যায় না কাছাকাছি।

স্মৃতি : কি করে জল নিয়ে আসবে তাহলে রতন সেই পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে ?

ধৃতি : ঠিক আনবে দেখিস। গান দিয়ে ঠিক বশ করবে সে সাপেদের। নদী বন পাহাড় পশুপাখী সকলকেই পোষ মানাতে জানে সে।

আনন্দ : কেন পাঠিয়েছ গো তোমরা তাকে ঝর্ণার জল আনতে ?

স্মৃতি : গ্রামের অন্ধ মানুষদের বন্ধ চোখ খুলবে ঐ জলে, বলেছেন যে রাজবদ্যি।

জ্যোতি : তা তোমাদের গ্রামে মোড়ল টোড়ল নেই কেউ ? সে গেল না কেন ?

স্মৃতি : আছে বৈকি। নাম করা মোড়লই আছে সুবুদ্ধি সর্দার। কিন্তু সেও

ত অন্ধ। যাবে কি করে? গ্রামের মধ্যে দুটো চোখ খোলা আছে শুধু সোনা ভাইয়ের, তাই সে গেছে।

স্মৃতি: ও ছাড়া যাবেই বা কে আর? ও যে তীরের মত তরতরে, হাওয়ার মত হাল্কা। ওর মনের ইচ্ছে ফোটে ওর চোখের চাওয়ায়, পায়ের গতি উপচে পড়ে ঠোঁটের হাসিতে।

স্মৃতি: দেখলেই চিনতে পারবে তাকে তোমরা। পায়ের আওয়াজ শুনলেই চিনতে পারব আমরাও।

আনন্দ: ঐ দেখ মাঠের কোণায় বিকেলের ছায়া নামছে। চল তাড়াতাড়ি।

একদিক দিয়ে ওদের প্রস্থান, অন্যদিক দিয়ে বিশ্বাস, আশা, মেহনৎ ও সুবুদ্ধির প্রবেশ।

মেহনৎ: কি হল তো সর্দার? ঠাকুর মহাশয়কে শুধোও না একবার ব্যাপার-খানা কি দাঁড়াচ্ছে।

সুবুদ্ধি: শুধিয়েছি রে, আজই শুধিয়েছি। বললেন খড়ি পেতে গুনছি। পরে বলব।

আশা: দেখা যাক রতন যদি জল নিয়ে আসে পাহাড়ী ঝর্ণার, আর তাতে ফের যদি নজর ফিরে আসে চোখে, তাহলে…

বিশ্বাস: তা হলে কি করব আমরা? সময়ের ঝাঁপি থেকে দিন রাত্তিরের হিসেবের খাতা চুরি করে এনে তুলে দোব তা মানুষের হাতে? খুশীতে ভরে উঠবে দশদিক তাতে?

মেহনৎ: তা কি করে হবে? খুশী ত আর দিন রাত্তিরের মধ্যে নেই। তা আছে মনের মাটিতে শিকড় গেড়ে।

আশা: খুঁজে বের করতে হয় তাকে হাহাকারের বেড়া ডিঙিয়ে।

বিশ্বাস: তা বটে।

সুবুদ্ধি: তাহলে কথাটা কি দাঁড়াল?

আশা: কি দাঁড়াল বল।

বিশ্বাস: না তুমিই বল।

সুবুদ্ধি: কি জানিস? আমরা যা চাই, কোনদিন পাই না তা। যা পাই তা নিয়ে আবার কোন দিন খুশী হতে পারি না। আসলে খুশী আপনি এসে ধরা দেবে, যখন সব চাওয়াকে পারবি পোষ মানাতে।

বিশ্বাস: কি হবে তাহলে?

সুবুদ্ধি: তাহলে সব দোর খুলে যাবে, সব আলো জ্বলে উঠবে, সব দূর এগিয়ে আসবে হাতের কাছে হুঁহু করে।

হেমন্ত: সে খুশীর বন্ধ কপাট খুলে দেবে এমন মিতে কে আছে?

আশা: মনে হচ্ছে দেবে রতনই।

সুবুদ্ধি: ঠিক বলেছিস। সেই আনবে এই অন্ধকারে আলোর হাতছানি!

৬.

নাগরাজ্যের বাগান। নাগেদের রাজা মণিধর দাঁড়িয়ে আছেন দক্ষিণের খোলা ফটকের সামনে। তাঁর এক পাশে দুধসাগর, অন্য পাশে হিমসাগর। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে শঙ্খচূড় আর চন্দ্রচূড় ফণা নাচাচ্ছে। সবে সকাল, একটু একটু করে আলো ফুটছে।

মণিধর: সবাই তোমরা বাগান আগলে আছ সারাদিন সারা রাত। তার ভেতর থেকে কি করে পালাল রাজকন্যা? এত উঁচু পাঁচিল টপকাতে পারে না সে। এত বড় ফটকও খুলতে পারে না।

দুধ সাগর: সেই জন্যই ত বিষম ধাঁধা লাগছে রাজা মশাই।

হিম সাগর: নিশ্চয় বাতাসে ভর করে পাতাল-সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে গেছে রাজকন্যে।

মণিধর: সুড়ঙ্গের মুখে পাহারা রাখনি কেন?

শঙ্খচূড়: আমিই পাহারায় ছিলাম রাজা মশাই। কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়েছিলাম রাস্তা আটকে।

চন্দ্রচূড়: কাল দুপুরে আমি কিন্তু রাজকন্যেকে দেখেছি রাজা মশাই পাঁচিলের ওপিঠ থেকে মুখ বাড়িয়ে ঝুমুর নদীর ওপারে রাস্তায় দাঁড়ান ফুটফুটে একটা মানুষদের ছেলের সঙ্গে গল্প করতে!

মণিধর: অত ওপরে তুলে দিল কে তাকে?

চন্দ্রচূড়: তা ত জানিনে রাজা মশাই। আমি ছিলাম শিরিষ গাছের মগডালে। সেখান থেকে দেখলাম পাঁচিলে মুখ রেখে রাজকন্যে কথা বলছে। শাঁ শাঁ করে নেমে এলাম যখন, তখন দেখলাম রাজকন্যেও নেই, সেই ছেলেটাও নেই। পাঁচিলের নীচে শুয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে ময়াল মাসি। বুঁদ হয়ে আছে আফিঙ ঘুমে।

দুধসাগর: তাহলে সেই পিঠে নিয়ে উঁচুতে তুলে ধরেছিল কি রাজকন্যেকে?

হিমসাগর: হতে পারে তা। একটা মিষ্টি গানের আওয়াজ আসছিল কাল পাঁচিলের ওপার থেকে। হাওয়ায় ভেসে আসা সেই গানের সুর শুনে হয়ত রাজকন্যে বলেছিল ময়াল মাসিকে, পিঠে উঠিয়ে পাঁচিলে দাঁড় করিয়ে দিতে।

মণিধর : ডাক ময়াল মাসিকে।

চন্দ্রচূড় : মুস্কিল কি জানেন রাজামশাই, তাঁকেও পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও আজ সকাল থেকে।

শঙ্খচূড় : ফটক খোলার মন্তর জানে সে। নিশ্চয় খুলে দিয়েছে বন্ধ খিল। তারপর নিজেও গা ঢাকা দিয়েছে ধরা পড়ার ভয়ে।

মণিধর : তোমরা জান না রাজকন্যা মানুষের মেয়ে? তাকে ঘর থেকে ধরে এনে গায়ে ফুঁ দিয়ে নাগকন্যা করেছিলাম আমরা। একটি মানব শিশু এনে তাকে নাগশিশু করব, আর তারই সঙ্গে বিয়ে দোব ওর·· ···এই ভেবে রেখেছি। সব মতলব মাটি হয়ে গেল!

চন্দ্রচূড় : রাস্তার সেই ছেলেটা কিন্তু সত্যিই রাজার জামাই হবার মত দেখতে রাজামশাই। শুনলাম, রাজকন্যেকে বলল তার নাম রতন। সে যাচ্ছে কেতন পাহাড়ের ঝর্ণায় জল আনতে, গাঁয়ের লোকের অন্ধ চোখে আলো এনে দেবে বলে!

মণিধর : কেতন পাহাড়ে? তার ঝর্ণার খবর কি করে জানল সেই মানুষের ছেলেটা?

শঙ্খচূড় : মানুষের মাথায় কত বুদ্ধি রাজা মশাই। কত বই-পুঁথি আছে তাদের বস্তা বস্তা। তারা কি আর এই লুকান ঝর্ণাটার খবর জেনে ফেলে নি?

মণিধর : মহারাজ বাসুকীর কোপে প্রাণ হারিয়েছিল যে পঁচিশ লাখ সাপ, তাদেরই দেহ পাথর হয়ে গিয়ে রূপ ধরেছে এই কেতন পাহাড়ের। আর নাগ বৌদের চোখের জলে তৈরি হয়েছে তার ঝর্ণা। ওর জলে মরা বেঁচে ওঠে। পাথুরে মাটিতে ফলে সোনার ফসল। শুকনো গাছে ফোটে নূতন ফুল।

চন্দ্রচূড় : এই জল হাতে পেলে মানুষ ত আর মরবে না। তারা ত তাহলে যে কোন দিন এসে নাগরাজ্য তছনছ করে দেবে রাজা মশাই।

হিমসাগর : কি হবে তাহলে?

দুধসাগর : আমরা কি সব ঝাড়ে বংশে শেষ হয়ে যাব?

মণিধর : না, না, কিছুতেই হবে না তা। হতে দেওয়া হবে না। যাও তোমরা, দৌড়ে যাও লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে। ধরে আন রতনকে আর রাজকন্যে বর্ণাকে। আর আকাশ মাটি জল বাতাস বিষিয়ে দাও, বিষিয়ে দাও ঝর্ণার জল, ফণা উপুড় করে কলসী কলসী কালকূট বিষ ঢেলে। যে যেখানে আছ শিগ্‌গীর এস।

সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল কাড়া-নাকাড়া, রামশিঙা। ছুটে এল চার দিকে থেকে রাশি রাশি সাপ ফণা উঁচু করে।

হিমসাগর : চল সবাই কেতন পাহাড়ে।

দুধসাগর : দৌড়ে চল, লাফিয়ে চল, উড়ে চল।

৭.

ঝিশ্চিন্দিপুর মাঠের মাঝে পুরান নীলকুঠি। একটা দরজা ভেঙ্গে পড়েছে বাঁ দিকের বড় ঘরটার। তার চাতালে বসে আনন্দ, স্বপ্ন ও জ্যোতি মাছ ধরার জাল বুনছে। সুখ একটা লাটাইয়ের সুতো গোটাচ্ছে অল্প দূরে একটা থামে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে।

সুখ : এটা হল কি বল দেখি। বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, না জন্মাচ্ছে একটা ছেলে, না মরছে একটা বুড়ো। দেশটা দুনিয়াটা যেন পুরনো, শেওলা ধরা একটা সাবেকী বাড়ী হয়ে পড়ছে।

আনন্দ : দেখতে দেখতে সব নূতনত্ব চলে গেল জীবন থেকে। থাকার মধ্যে আছে পুরান নদীটা, আর তাতে আছে মাছ। খালি মাছ ধর, আর খাও।

জ্যোতি : মন্দ কি? লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে, মচ্ছ মারিবে খাইবে সুখে, বলেছে না শাস্তর!

স্বপ্ন : ও কথা শুনতেও ভাল, শোনাতেও ভাল। কিন্তু মাছ ধরাটাও সোজা নয়, খাওটাও নয়।

আনন্দ : সোজা ত নয়ই। বাঁচার জন্যে যা যা করতে হয়, তার কোনটা সোজা বলত। সহজে হয় কোন কাজটা?

সুখ : রাখ, রাখ, ওসব বকেয়া কথা। ব্যাপার কি জানিস? মাছেরা ভীষণ চালাক হয়ে গেছে আজকাল। বঁড়শির টোপ ত গেলেই না, জালের পাল্লা থেকে বিশবাঁও নীচে চলে যায় ধরার বেলা এলেই।

জ্যোতি : সব ভাল জিনিসই তাই করে রে। হাত বাড়ালেই নাগালের মধ্যে আসে যা, তার জন্যে হা—পিত্যেশ করে থাকে কে বলত। সকলের সব তপস্যাই ত দুর্লভের জন্যে!

স্বপ্ন : ঠিক বলেছিস। একটা কথার মত কথা বলেছিস।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় বড় ঘরের দরজাটা ঝন ঝন করে খসে পড়ল। আর ভেতর থেকে চুল-দাড়ির জঙ্গলে অর্ধেকটা মুখ ঢাকা-দুজন লোক বেরিয়ে এল। তারা আলো আর অন্ধকার। এতদিন ঘুমিয়েছিল দু-জন ঐ তালাবন্ধ ঘরে।

আনন্দ : ওরে ভূ-ভূ ভূত! পা-পা-পালা!

স্বপ্ন ও জ্যোতি : পালারে, পালারে। ধ-ধ-ধরবে!

সুখ : ধরল রে, মারল রে, দো-দো দৌড়!

আলো : এই পালিয়ো না, কথা শোন। ভয় নেই কিছু করব না।

অন্ধকার : পালাবেই কিন্তু ধরে ঘাড় মটকাব সকলকার। শিগ্‌গী এস।

আনন্দ : ওরে মানুষের মত কথা বলছে। আয় ত শুনি কি বলছে।

স্বপ্ন : ভূত নয়, ভূত নয়, দিনের আলোয় ত ভূতেরা বেরোয় না।

জ্যোতি : খোক্কস-টোক্কস হতে পারে ত!

আনন্দ : কি বলছ? তোমরা কারা? কোথেকে এলে এখানে?

আলো : চিনতে পারছ না?

আনন্দ : না, তা কোথায় দেখেছি বল ত?

অন্ধকার : এখানে এই মাঠেই। মনে নেই সেই জ্যোৎস্না রাত্রে মাঠের মধ্যে খড়ের বোঁদা জালিয়ে কাঁচা ছোলা ঝলসান খাচ্ছিলে, আর ঢোল বাজাচ্ছিলে।

আলো : সে সময় এসেছিল দু-জন লোক, ঢের দূরের অজানা মুল্লুক থেকে।

জ্যোতি : হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সে ত ঢের দিন আগে। হয়ত বিশ বছর পঁচিশ বছর হবে। কিংবা বেশি হতে পারে।

স্বপ্ন : তা এতদিন তোমরা ছিলে কোথায়?

আলো : কেন তোমাদের এই কুঠিঘরে ঘুমুচ্ছিলাম। তোমরা যে শরবত খাইয়েছিলে তাতেই হয়েছিল এই দশা।

জ্যোতি : আজকে ফের জাগলে কি করে।

আলো : গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলে পাখিরা বাসা করেছিল, খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে। তাদের ঝাঁঝাল গলার কিচি কিচি আর ধারাল ঠোঁটের ঠোক্করেই ঘুম ভেঙে গেল।

আনন্দ : বাব্বা এমন ঘুম ত দেখিনি কারো।

আলো : তা তোমাদের খুব কষ্ট হয়েছে ত এই বছরগুলোয়? গ্রামে একটি মানুষও মরেনি, একটি বাচ্চাও জন্মায়নি। বুড়োমির স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় জং ধরে গেছে ত তোমাদের দেহে-মনে?

স্বপ্ন : তোমরা ত ছিলে ঘুমে অচেতন। জানলে কি করে?

আলো : জানব না কেন? কি না জানি আমরা?

অন্ধকার : আমরাই যে জন্ম-মৃত্যুর আলোছায়া নিয়ে খেলা করি দিনরাত।

জ্যোতি : আরে কি সব আবোল-তাবোল বকছে দেখছিস!

সুখ : এখনো নেশার ঘোর কাটেনি আর কি।

আনন্দ : না, না, সেদিনও এইরকমই এলোমেলো অনেক কিছু বলেছিল ওরা।

অন্ধকার : বিশ্বাস হচ্ছে না ত? আচ্ছা, এই দেখ তোমাদের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আমি। এবার দেখবে ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠবে। [প্রস্থান]

আলো : আর এই দেখ, সব আলো আবার জ্বালিয়ে যাচ্ছি আমি। এবার উঠবে শাঁখের আওয়াজ, নূতন শিশুর জন্মের খবর জারি করতে। [প্রস্থান]

আনন্দ : তাই ত, তাই ত! কথা বলতে বলতেই চোখের সামনে থেকে কি করে উধাও হয়ে গেল মানুষ দুটো!

সুখ : ভারী আশ্চর্য ব্যাপার ত!

৮.

ঝুমুর নদীর মোহনা। অদূরে কেতন পাহাড মাথা তুলে রয়েছে। তার পশ্চিম বাহু থেকে ঝিরঝির দিয়ে নামছে ঝর্ণা। বাঁ পাশে উঁচু টিলার ওপর একটি জয়ন্তী গাছ। ঝর্ণার মুখ আগলে দুধসাগর, হিমসাগর, চন্দ্রচূড় কড়া পাহারা বসিয়েছে।

চন্দ্রচূড় : দূর থেকে সুন্দর একটা বাঁশির সুর ভেসে আসছে না?

শঙ্খচূড় : হ্যাঁ, সত্যিই পাগল করা সুর। কিন্তু একি? ভরা দুপুরে এমন আলকাতরার মত কালো রাত নেমে আসছে কেন? চোখে দেখতে পাচ্ছি না কেন কিছু?

চন্দ্রচূড় : তাই ত। দপ করে নজর নিবে গেল যেন আমারও।

হিমসাগর : সর্দার, সর্দার, আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ঝাঁক বেঁধে সব জোঁক মাছি গায়ে বসছে, আর কুরে কুরে খাচ্ছে আমাদের ছাল-চামড়া।

দুধসাগর : কেউ চোখে দেখতে পাচ্ছে না। তাই তাড়াতে পারছে না তাদের। গা জুড়াতে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে সবাই ঝুপঝাপ করে। ঝাঁপ দেওয়া ভিন্ন উপায় নেই আমাদেরও।

চন্দ্রচূড় : ঠিকই। আর সম্ভব নয় পাহারা জিইয়ে রাখা। প্রাণ নিয়ে পালাতেই হবে। রাজামশাই তাতে কেটেই ফেলুন, আর পুড়িয়েই মারুন।

শঙ্খচূড় : নিশ্চয় কোন যাদুকর আসছে কেতন পাহাড় দখল করতে। এই ঝর্ণার জল নিয়ে গিয়ে নিশ্চয় অমর করবে সে মানুষকে। তাকে বাধা দিতে গিয়ে কেন নিজেদের বিপদ ডেকে আনি?

চন্দ্রচূড় : চল পালাই এখান থেকে। বিপদ হয়েছে কি জানিস? আমরা হলাম দলের নেতা, আমরাই যদি পালাই, তাহলে ত শেষপর্যন্ত একজনও আর দাঁড়াবে না।

শঙ্খচূড় : তা ত দাঁড়াবেই না। কিন্তু আমরা ত অন্ধ জনতার অন্ধ নেতা, আমাদের পিছু নিলে রসাতল ছাড়া আর কোথায় গতি হবে বল কার?

একদিক দিয়ে নাগদের প্রস্থান, অন্যদিক দিয়ে রতনের প্রবেশ।

রতনের গান

অচিন দেশের মেয়ে ওগো,
হাসির আলো দাও বুলিয়ে,

পথের বাধা চোখের ধাঁধা
নরম ছোঁয়ায় দাও ভুলিয়ে।
দূরের সুরে হেঁটে হেঁটে,
দিন ত অনেক গেল কেটে,
কাছে এসে গলায় এবার
গানের মালা দিই দুলিয়ে ॥

রতন : এই ত ঝুমুর নদীর মোহনায় সেই কেতন পাহাড়। আর এই সেই স্ফটিকজলের ঝর্ণা। আর এই সেই বাদামি জয়ন্তী গাছ। কিন্তু কোথায় কণা? তারই জন্যে যে তেপান্তর পাড়ি দিয়ে, এতগুলো দিন রাত্তির দু-হাতে ঠেলে এখানে ছুটে এলাম। সে কি তবে আসেনি? পায়নি কি পথ খুঁজে? ইস কি থমথমে নির্জন জায়গাটা। ভীষণ ঘুম আসছে আমার। শুয়ে থাকি ততক্ষণ একটু। এক্ষুনি নিশ্চয় এসে পড়বে সে!

জয়ন্তী গাছের নিচে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। একটু পরে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে থুথুরে বুড়ির সাজে এসে ঢুকল নাগকন্যা কণা।

কণা : কই, সে রূপকথার রাজপুত্তুর রতন কোথায়? কেউ ত এখানে নেই। নাগেদের বেড়া পার হয়ে পারল না কি সে এত দূরে পৌঁছতে? কে যেন বুড়োমানুষ একজন চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে ওখানে গাছতলায়। ওকে জাগিয়ে জিগ্যেস করি ত! ওগো ঘুমন্ত লোক, শুনছ? রতনকে দেখেছ? চোদ্দ বছরের টুকটুকে ছেলে রতন, দীঘির বুকে ফুটে থাকা লাল পদ্মের মত যার রং, মখমল মেঘের মত যার চুল।

রতন : রতন? চোদ্দ বছরের রতন? তাকে খুঁজছ কেন? তুমি কে গো? বুড়োমানুষ তুমি, অথর্ব তোমার হাত পা, এই জনহীন জংলা পথে কেন এসেছ তুমি এই অসময়ে রতনের খোঁজে?

কণা : সে যে কথা দিয়েছে আমার জন্যে পথ চেয়ে থাকবে। কিন্তু কি বললে তুমি? আমি বুড়োমানুষ? আমি ত দেখছি সত্যিকারের বুড়োমানুষ তুমি। বরফের মত সাদা তোমার চুল, ঝড়ে খসে পড়া হরিতকার মত শুকনো তোমার শরীর।

রতন : তাই নাকি? কেমন করে হবে তা? নাগকন্যা কণার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে এই ত সবে এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়েছিল ছোট্ট রতন। গায়ে হাত দিয়ে জাগালে তাকে তুমিই…একটা আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি!

কণা : কক্ষনো না। রতন যাকে দেখেছিল ভোরের শুকতারার মত জ্বলজ্বলে, সেই নাগকন্যা কণাও ত এইমাত্র পৌঁছল এসে তার ঠিক করা ঠিকানায়। যাকে দেখল

সে সেখানে এসে ? একটা ঝিমিয়ে পড়া মরা গাছের মত বুড়োকে।

রতন : চল ত ঝর্ণার আরশিতে মুখ দেখি গে আমরা নিজের নিজের।

কণা : চল। মন আর চোখের ঝগড়া মিটে যাবে তা হলেই।

ঝর্ণার বুকে ঝুঁকে দাঁড়াল দু-জন।

রতন : কি দেখছ ?

কণা : একি ? সব যে কেমন ওলটপালট হয়ে গেল ! নিজেকে যে আর চিনতে পারছি না। কিছুই যে মনে পড়ছে না আর আমার !

রতন : দরকার নেই আর কিছু মনে পড়ার। পথ যেখানে ফুরয়, তারপর ত চলা থাকে না। পাওয়া-না-পাওয়ার হিসাবও তাই শেষ হয় সেখানে এলেই।

কণা : হয়ত তাই। তা হলে বাঁশিটা আর রেখেছ কেন মোহনের ? ফেলে দাও ওটা ঝর্ণার জলে। ভাসতে ভাসতে চলে যাবে সমুদ্রে।

য ব নি কা

মামার বাড়ি

বিপিনবাবু হোমিওপ্যাথ সকালবেলা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন, আর কাগজ পড়ছেন। তাঁর সামনে ডাক্তারী বাক্স, গলায় বুক পরীক্ষার যন্ত্র। বাড়ির ভেতর থেকে একটা শব্দ আসছে।

বিপিন : সাত সকালে কে এমন ঠকাঠক করছে? একটু শান্তিতে যে কাগজখানা পড়ব, তারও উপায় নেই।

ওঁর স্ত্রী মাতঙ্গিনীর প্রবেশ।

মাতঙ্গিনী : গজু কাঠ কাটছে, তারই শব্দ। কাগজ নিয়ে ত বসেছ, ওদিকে ঘরে ত নেই একচিলতে কাঠ। রান্না হবে কি দিয়ে?

বিপিন : বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু গজুটা কে?

মাতঙ্গিনী : দেখ কাণ্ড! গজু তোমার ভাগ্নে। বর্ধমানে ছিল, তোমার সেই যে মামাত বোন নিস্তার গো, তারই ছেলে।

বিপিন : সে এসে জুটল কোত্থেকে? এলই বা কবে? কিছু ত শুনিনি।

মাতঙ্গিনী : শুনবে কি করে? তুমি ত ছিলে নবদ্বীপে। হঠাৎ নিস্তার মারা গেল তিনদিনের জ্বরে। গাঁয়ের লোকেরা তখন মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে এল আমার কাছে। কি আর করব? আপন ভাগ্নে, ফেলে ত দেওয়া যায় না।

বিপিন : তা ত যায় না। কিন্তু আজকের দিনে একটা ছেলে পুষতে খরচটা কত তা ভেবেছ? রোজগার ত দিনের পর দিন কমতে কমতে শূন্য হতে চলেছে!

মাতঙ্গিনী : ভেবেছি, ভেবেছি। খেঁদির মাকে ত ছাড়িয়ে দিয়েছি সেই জন্যেই। উনুন ধরান, জল তোলা, মাঠে গরু নিয়ে যাওয়া, সব একটু একটু করে চাপিয়েছি ওর ঘাড়ে। বসে বসে খাওয়া হবে না, পরিষ্কার বলে দিয়েছি সে কথা।

বিপিন : খেঁদির মাকে ছাড়িয়ে দিয়েছ? করেছ কি? ওর মত টকের ডাল আর তেঁতুর শুক্তো কি আর কেউ রাঁধতে পারবে? তাছাড়া নিজের কথাটাও ভাব। এখন ত সকাল সন্ধ্যে তোমাকেই হাঁড়ি ঠেলতে হবে। বয়েস হয়েছে না।

মাতঙ্গিনী : দেখই না আমি কি করি। গজু বলছে ও নাকি রাঁধতেও পারে। হ্যাঁ, শোন সামনের সোমবারে আমরা কিন্তু শ্যামরায়ের মেলা দেখতে যাব বিষ্ণুপুরে। সকালে যাব রাত্রে ফিরব।

বিপিন : বাড়ি আগলাবে কে? এখন ত আর খেঁদির মা নেই।

মাতঙ্গিনী : কেন গজুই থাকবে। চালাক চতুর ছেলে। তাছাড়া লোক গিসগিস করছে চারদিকে। ভয়টা কিসের?

বিপিন : অন্যদের ভয় ত করছি না।

মাতঙ্গিনী : তবে ?

বিপিন : ভয় করছি ওকেই। যদি ঘটিবাটি কম্বল কাঁথা সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়।

মাতঙ্গিনী : বলছ কি ! মাথা খারাপ নাকি ! আপন ভাগ্নে, মা বাপ মরা অনাথ, সে পালাবে তোমার ঘটিবাটি নিয়ে ?

হঠাৎ আওয়াজটা খুব বেড়ে গেল

বিপিন : নাঃ কানে ত তালা ধরে গেল। কাটছে কি এত ?

মাতঙ্গিনী : কাঁঠাল কাঠের সেই যে পুরানো সিন্দুকটা ছিল।

বিপিন : অ্যাঁ ? ওটা যে আমার মায়ের সিন্দুক। মা ওতে রাখত বাসন-কোশন, বাতের তেল, লক্ষ্মীর হাঁড়ি, আরো হাজার জিনিস। ওটা কাটা মানে ত আমার মাকেই দু-খানা করা।

মাতঙ্গিনী : আহা কি বুদ্ধি ! উঃ আরশোলার ডিপো, ওটা রেখে ত খালি নষ্ট হচ্ছিল। তার চেয়ে সংসারের কাজে লাগল, সেটাই ভাল হল না।

বিপিন : তা তোমার ঐ বিখ্যাত গজুকে ডাক একবার, দেখি তার চেহারাখানা।

মাতঙ্গিনী : এই দেখ, খেয়ালই করিনি। ওরে গজা, শিগ্‌গির এদিকে আয়। মামাকে পেন্নাম কর। কি গাধা রে তুই !

ভেতর থেকে

গজু : মামাকে এখানে নিয়ে এস মামী। আমার ওঠার উপায় নেই। উঠলে ঘুঘুটা পালাবে।

বিপিন : ঘুঘু ধরেছে বুঝি একটা ?

মাতঙ্গিনী : ধরবে না ? হাজার হলেও ছেলেমানুষ ত।

বিপিন : ধরুক। এখন ঘুঘু দেখাচ্ছে, এরপর ফাঁদ দেখাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোকুল পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালা। পণ্ডিতমশায় ছেলেদের অঙ্ক করতে দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে গজু, পিন্টু, হাবু আর বিলু পা টিপে টিপে ক্লাস থেকে উঠে এল। তাদের হাতে বই খাতা।

গজু : চল আমার সঙ্গে। মামা-মামী দু-জনেই বিষ্ণুপুরে গেছে, শ্যামরায়ের মেলা দেখতে। এই ফাঁকে মুড়কি, বাতাসা, আমসত্ত্ব, আচার যা আছে সব সাবাড় করি।

পিণ্টু : ফিরে এসে যখন টের পাবে, তখন ত আচ্ছাসে ধোলাই দেবে। কি করবি তখন ?

বিলু : দিলেই হল! ভাঁড়ারঘরের মেটে দেওয়ালে বড়রকম একটা গর্ত খুঁড়ে রাখব। তাহলেই বুঝবে চোরে সিঁধ কেটে সব নিয়ে গেছে।

হাঁদু : হ্যাঁ, এত জিনিস থাকতে চোরে আচার, আমসত্ব আর মুড়কি, বাতাসা চুরি করেছে! তুই একটা নাম্বার ওয়ান গাধা।

গজু : কেন, ওগুলো কি আর জিনিস নয়? সব চোরই যে শুধু বাসন আর কাপড় চোপড় নেবে, তার কি মানে আছে ?

পিণ্টু : মোটেই না। এই ত সেদিন ঘটকেদের রান্নাঘরে ঢুকে পান্তা ভাত পর্যন্ত নিয়ে গেছে চোরে।

বিলু : আর টেপুদাদের বাড়ি থেকে ঘুঁটে নিয়ে যায়নি কার্তিকপুজোর দিন ? আরে চোরের কাছে ঘটিবাটিও যা, মুড়ি, আমসত্বও তাই।

হাঁদু : তাছাড়া চোরেরা ত চুরি করে খাবারের জন্যেই। হাতে হাতে খাবার পেয়ে গেলে ত তাদের ভালই !

গজু : ওরে পণ্ডিতমশায়। ঐ দেখ মেয়েদের কেলাসে ঢুকলেন। ওদের অঙ্ক-টঙ্ক দেখেই কিন্তু এদিকে আসবেন।

পিণ্টু : তার আগেই চল হাওয়া হয়ে যাই আমরা। এসে দেখবেন ভোঁ ভাঁ, কেউ কোথাও নেই।

হাঁদু : তারপর? সন্ধ্যেবেলা ত আসবেন মেজকাকার সঙ্গে দাবা খেলতে। তখন ত বলে দেবেন এই দল বেঁধে পাঠশালা পালানোর কথা।

বিলু : কি আর হবে? পিঠে দু-চার ঘা মার পড়বে, এই ত। সে ত রোজই পড়ে !

গজু : আমার মামাকে যদি বলে দেন, আমার কিন্তু কিছু হবে না। মারতে এলে মামী সামলাবে।

পিণ্টু : মামী তোকে খুব ভালোবাসে বুঝি !

গজু : ছাই বাসে। আমাকে দিয়ে রোজ দু-দুটো চাকরের কাজ করায়। সেই জন্যেই কিছুটি বলে না।

বিলু : তা তুই একদিন জব্দ করে দিতে পারিস না? এই ধর তরকারিতে আচ্ছা করে নুন ঢেলে দিলি, নয়ত ভাতের হাঁড়ির তলা ধরিয়ে সকলকে পোড়া ভাত খাওয়ালি।

গজু : একটু সবুর কর, আর একটু চেপে বসি। তারপর করছি যা করার। এখন চল পালাই গুট গুট করে।

পিন্টু : চল। ওহে মার তুমি মোরে কি দেখাও ভয়, ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়!

হাঁদু : ঠিক, ঠিক। মার ভেবে ভীত কেন আচার খাইতে, দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

একদিক দিয়ে ওদের প্রস্থান, অন্যদিক দিয়ে গোকুল পণ্ডিতমশায়ের প্রবেশ।

গোকুল : একি? সবাই পালিয়েছে! বেয়াড়ার একশেষ হয়েছে ত ছেলে-গুলো। পড়াশোনা এখন দেখছি শুধু মেয়েরাই করে। দাঁড়াও, কাল সক্কলকার হাড় একদিকে মাংস একদিকে করছি। হতচ্ছাড়া হনুমান, গাধা, ইষ্টুপিটের দল।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বিপিন ডাক্তারের বাড়ি। উঠানের চারদিকে অনেক হাঁড়িকুড়ি ছড়ান রয়েছে। রয়েছে কিছু মুড়ি চিঁড়েও। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হারিকেন হাতে বিপিনবাবু। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে মাথা চাপড়াচ্ছেন মাতঙ্গিনী।

মাতঙ্গিনী : হায় হায়! আমার সর্বস্বি নিয়ে গেছে গো! এমন সর্বনেশে চোর কোথায় ছিল গো! তুমি শিগ্রী পুলিশ ডাক গো।

বিপিন : কি যে বল তার ঠিক নেই। আচার আর মুড়ি চিঁড়ে চুরি হয়েছে শুনলে পুলিশে বিশ্বাস করবে? ভাববে আমারই মাথা খারাপ হয়েছে! তবু ভালো যে ঘটিবাটি, কাপড়-চোপড়, বিছানা, মশারি, দামি জিনিস কিছু নেয়নি। আসলে এসেছিল ভীষণ একটা পেটুক চোর, বুঝেছ। বেছে বেছে শুধু খাওয়ার জিনিসগুলোই খেয়ে গেছে। যাক, ঠিক আসতে হবে আমার কাছে। তখনই ধরব।

মাতঙ্গিনী : সে আবার কি? তোমার কাছে আসতে যাবে কেন?

বিপিন : নির্ঘাৎ পেট খারাপ হবে ত এত খেয়ে। ওষুধ দেবে কে তখন বিপিন ডাক্তার ছাড়া?

মাতঙ্গিনী : বসে থাক সেই আশাতেই।

বিপিন : আচ্ছা, গজাটা কি করছিল? তাকে রেখে গেলে বাড়ি পাহারা দিতে। এই তার পাহারা দেওয়া?

মাতঙ্গিনী : সে কি করবে? সারা সকাল কুয়ো থেকে জল তুলেছে, কাঠ কেটেছে, গোয়াল সাফ করেছে। তারপর দু-মুঠো ভাত ফুটিয়ে তা মুখে দিয়ে স্কুলে

দৌড়েছে। তখনই বলেছিলাম, ওকে লেখাপড়া শেখাতে যেও না। তা ত শুনলে না। ভাগ্যে দিগ্‌গজ বিদ্বান হবে বলে ঠেলে পাঠালে গোকুলের গোয়ালে!

বিপিন: ভদ্দর লোকের ঘরে জন্মেছে। লেখাপড়া না শিখলে শেষটা সিঁধকাঠি হাতে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরবে, নয়ত রেলে ইস্টিমারে লোকের ব্যাগ বিছানা সরাবে!

মাতঙ্গিনী: তা অবিশ্যি ঠিক! কিন্তু লেখাপড়া শিখলে কি বেশিদিন আর কাঠ কাটবে, না গরু চরাবে? এখনি দেখনি মাথায় কত বড় টেড়ি উঠেছে!

বিপিন: তাও অবিশ্যি ঠিক। তাছাড়া লোকসানও ত কম করছে না ছেলেটা! এই সেদিন কুয়োয় ঘড়াটা ফেলল। লোক দিয়ে তোলাতে লাগল আট আনা। গরুটা মাঠে কোথায় ছেড়ে দিয়ে এল। গরু ঢুকল গিয়ে পাঁচু মণ্ডলের কলাই খেতে। চটে-মটে পাঁচু তাকে জমা দিল খোঁয়াড়ে। ছাড়াতে লাগল সাড়ে পাঁচ আনা। এছাড়া তরকারি নুনে পোড়ান, ভাত ডাল নষ্ট করা—এসব ত আছেই। এইত পরশু দিন উনুন ধরাতে গিয়ে ঘরে আগুনই দেবার জোগাড় করেছিল!

মাতঙ্গিনী: তা কি আর উপায় বল। আপন ভাগ্নে, বলতে গেলে ও বাড়িরই ছেলে।

বিপিন: হ্যাঁ, ভারী আমার ভাগ্নে রে। ওর মা সেই নিস্তার না ফিস্তার, সে আমার কি করেছিল জান? শুনলে চোখ ফেটে জল আসবে তোমার।

মাতঙ্গিনী: কি করেছিল?

বিপিন: বলছি। তখন আমি নিশ্চিন্দিপুরে মাস্টারী করি। রথের সময় একবার এল আমার ওখানে। একদিন আমার ভীষণ মাথার যন্ত্রণা, প্রাণ যায় যায়, তখন দিল কোথা থেকে একটা তেলের শিশি এনে মাথায় লাগাতে। ব্যাস, তারপরই···

মাতঙ্গিনী: কি হল? তেড়ে জ্বর এল বুঝি!

বিপিন: আরে না, না। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চুল উঠে গিয়ে ফুটবলের মত তেলপানা হয়ে গেল মাথাটা। নইলে কিরকম ঝাঁকড়া চুল ছিল আমার মাথা ভর্তি!

মাতঙ্গিনী: কই বাপু, আমি ত সেই ছোট্টবেলা থেকেই দেখছি তোমার মাথা-জোড়া টাক। আমার জেঠতুত বোন আমসিদি ত তোমার নামই রেখেছিল টাকশাল।

বিপিন: বললেই হল! চুরি হয়ে গেছে, নইলে দেখাতে পারতাম ছোটবেলার সেই ফটোটা।

হঠাৎ বাইরে হাঁকডাক, অনেক লোক ধরাধরি করে গজুকে নিয়ে উঠানে ঢুকল।

একজন: ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু আছেন?

বিপিন : কি, কি, ব্যাপার কি ? কারোকে খুন করেছে, না নিজেই খুন হয়েছে ?

আর একজন : কিছু হয়নি, হাঁপিয়ে গেছে, একটু জিরোলে আর একদাগ ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

মাতঙ্গিনী : কেন ? মারামারি-টারি করেছে নাকি কারো সঙ্গে ?

অন্য একজন : না, না। ক্ষেত্তর গোঁসাইয়ের মেয়ে পানি বিলে ডুবেছিল। তাকে সাঁতরে তুলে এনেছে গজু।

বিপিন : তাহলে ত মুল্লুকের মাথা কিনে নিয়েছে।

গজু : মামী একটু দুধটুধ গরম করে রাখ ত। পাড়ার ছেলেরা মেয়েটাকে গরুর গাড়িতে করে এখানেই নিয়ে আসছে মামার কাছে, চিকিচ্ছার জন্যে!

বিপিন : তা ত আনবেই, বিনি পয়সায় ওষুধ দেবে এমন বলদ আর কে আছে এ পাড়ায়!

মাতঙ্গিনী : ঐ ত গাড়ি থামল দরজায়। দেখি কি হল মেয়েটার।

[প্রস্থান].

গজু : এই যে এখানে, এখানে এনে শুইয়ে দে।

সকলে মেয়েটাকে ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিল।

চতুর্থ দৃশ্য

বেহুলা নদীর ধারে আমবাগান। বিকেলবেলা ছবি, লক্ষ্মী, রাধা ও বিজয়া খেলা করছে। হাতে ও গলায় ফুলের গয়না পরে তারা ঘুরে ঘুরে নাচছে, আর গান করছে।

গান

আমরা রঙিন আলোর পরী
খেলি খুশীর খেলা
আকাশ জলে বনের কোণে
ছড়াই রঙের মেলা।
ফোটাই ডালে ফুলের হাসি,
পাখির সুরে বাজাই বাঁশী,
হাওয়ার বুকে সুবাস ঢালি,
জাগাই ছুটির বেলা!

ঝোপের ভেতর থেকে হঠাৎ বাঘের ডাক। তারপর গজু, হাঁদু, পিন্টু ও বিলুর প্রবেশ।

গজু : এই মেয়েগুলো, পালা এখান থেকে শিগ্‌গির পালা। আখের খেতে বাঘ ডাকছে, শুনতে পাসনি ?

ছবি : আহা, বাঘ না হাতি ! তোমরাই ত মুখে হাত চাপা দিয়ে হোঁকর হোঁকর করছিলে। আমরা বুঝি আর জানি না !

পিন্টু : আমাদের বয়ে গেছে। আমরা যাচ্ছিলাম চিনিবাস কাকার চণ্ডীমণ্ডপে কীর্তন শুনতে। হঠাৎ বাঘ ডাকল।

বিলু : ভাবলাম মেয়েগুলো নম্বর ওয়ান হাঁদা। খালি ঘ্যানর ঘ্যানর করে ব্যাকরণ পড়ে, আর ঘাড় গুঁজে বসে অঙ্ক কষে। না জানে দৌড়তে, না পারে গাছে উঠতে, নির্ঘাৎ যাবে বাঘের পেটে···

হাঁদু : তাইতেই ছুটে এলাম সাবধান করে দিতে। আর ওরা কিনা আমাদেরই দুষছে। বলছে আমরাই বাঘের ডাক ডাকছি।

গজু : তার মানে কারোর ভাল করতে নেই, বুঝলি ত। চল, আমরা চলে যাই। থাক ওদের বাঘেই থাক।

রাধা : বেশ, আসুক বাঘ। থাক আমাদের।

ছবি : যদি সত্যিই বাঘ হয়, তাহলে আসছে না কেন এতক্ষণে মানুষের গন্ধ পেয়ে ?

লক্ষ্মী : দূর বাঘ কোথায় ? ওরাই আওয়াজ করছিল।

বিজয়া : হাজরাদের ভুট্টার খেতে ঢুকে পাহারাদারকে রোজ ঐরকম করে ভয় দেখাত। হঠাৎ সেদিন ধরা পড়ে গিয়ে বেদম মার খেয়েছে। বড়দার কাছে শুনেছি সব আমি।

ছবি : শুধু শুধু আমাদের খেলাটা মাটি করে দিল। অসভ্য, উল্লুক, পাজি ছেলেরা।

রাধা : ছুঁচো, গাধা, ড্যাম, রাসকেল। কাল বলে দোব সব পণ্ডিতমশায়কে।

লক্ষ্মী : না বাচ্চু মামা ত দারোগা, তাকে বলে পুলিশে ধরিয়ে দোব।

ছবি : কিছু করতে হবে না। আয় চারজনে একসঙ্গে ভেংচি কেটে পালাই।

বিজয়া : চল। শিবতলার মাঠে খেলিগে বরং।

পিন্টু : বিচ্চু মেয়েগুলো কি শয়তান দেখেছিস !

হাঁদু : আগে থেকে জেনে গেছে কিনা, তাই ভয় পেল না।

গজু : তোরা ত জানিস না, আমার আর এখানে বেশিদিন থাকা হবে না। মামা-মামী ঠিক করেছে আমাকে বিক্রি করে দেবে রাধানগরে এক গোলদারের কাছে দুশো টাকায়।

বিলু : যাঃ বাজে কথা। মানুষ আবার বিক্রি হয় ?

গজু : হ্যাঁ রে সত্যিই আমি শুনেছি, রাত্রে ঘাপটি মেরে শুয়ে থেকে। মামা-মামী সত্যিই আমাকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর ফন্দি করেছে।

গজু : কি জানিস ? সেদিনের সিঁধ কাটায় ওরা বিশ্বাস করেনি। বুঝে আমিই তোদের সঙ্গে দল পাকিয়ে আচার, আমসত্ত্ব খেয়েছি, তারপর সিঁধ কেটেছি। পণ্ডিতমশায়ও এসে বলে দিয়েছেন পাঠশালা থেকে পালানর কথা।

পিণ্টু : তাহলে ?

গজু : কি আর করব ? চলেই যাব। তবে যাবার আগে একটু শিক্ষা দিয়ে যাব পণ্ডিতমশায়কে। এখন চল, নিতাই ঘোষের বাগান থেকে ডাব নামাইগে দু-তিন কাঁদি।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

বিপিন ডাক্তারের বাড়ির বারান্দা। দুপুরবেলা বিপিনবাবু ও মাতঙ্গিনী বসে আছেন। সামনে দাঁড়িয়ে গজু। তার হাতে একটা তীর-ধনুক। মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা। খালি গা।

মাতঙ্গিনী : কি করছিলি রে ? হাতে তীর-ধনুক কেন ?

গজু : কাগ তাড়াচ্ছিলাম মামী, তীর মেরে মেরে। তুমি যে চালের গুঁড়ো রোদে দিয়েছ না, কাগ তা ঠোকরাচ্ছিল ঠোঁট দিয়ে।

মাতঙ্গিনী : সত্যি গজু তুই আমার সোনা ছেলে। কিন্তু বাবা তোকে ত আর বেশিদিন রাখতে পারব না। ইস, বলতেই কান্না পাচ্ছে আমার। খালি মনে হচ্ছে এত মোয়া, আমসত্ত্ব আর আচার আমার খাবে কে ?

গজু : কেন মামী, আমাকে কি তাড়িয়ে দিচ্ছ তাহলে ?

মাতঙ্গিনী : ষাট, ষাট, তাই কি পারি বাবা ? নিস্তারদি ছিল আমার আপন মামাত ননদ। তার ছেলে তুই, তুই কি আমার পর ? আসলে কি জানিস ? হ্যাঁ, কই বল না গো, তুমিই সব কথা বল না গজুকে বুঝিয়ে। ও ত বোকা ছেলে নয়, বুঝবে।

বিপিন : কি জানিস গজু ? আমার আর খাটার ক্ষমতা নেই। আস্তে আস্তে তাই রোজগারটা গেছে বন্ধ হয়ে। নিজেরাই পেট ভরে খেতে পাচ্ছি না দু-বেলা। ভেবেচিন্তে তাই ঠিক করেছি, রাধানগরে আমার এক পয়সাওয়ালা বন্ধুর ওখানে রেখে আসব তোকে কাল সকালে। যাবি ত ?

মাতঙ্গিনী : এখানে তোকে রাতদিন কত খাটতে হচ্ছে। গরিবের ঘর, আমার ত লোকজন রাখার শক্তি নেই।

বিপিন : সেখানে খাসা রাজার হালে থাকবি। কিছুটি করতে হবে না। শুধু

লেখাপড়া করবি, আর খেলাধুলো করবি। একবেলা খাবি মাছভাত, একবেলা মাংস-রুটি। ইয়া তাগড়াই হয়ে যাবে চেহারা দু-দিনেই।

গজু: কিন্তু তোমাদের ছেড়ে যেতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে যে। ও হো হো মামাগো,, মামীগো, তোমাদের জন্তে ভীষণ মন কেমন করছে যে!

মাতঙ্গিনী: তা আর করবে না বাবা? আপনার জন, রক্তের টান ত!

গজু: আচ্ছা মামা, আজ ত বুধবার, বিষ্যুৎ, শুক্কুর, শনি এই তিনটে দিন থাকি আর। রবিবারে ঠিক চলে যাব।

বিপিন: তাই হবে।

গজু: এখন ত কোন কাজ নেই। এখন তাহলে একটু তরজা শুনিগে বারোয়ারিতলায়। সন্ধ্যার আগেই ফিরব।

[প্রস্থান]

মাতঙ্গিনী: মনে কষ্ট হয়েছে। দেখলে না কেঁদেই ফেলল। আহা!

বিপিন: আরে ও কুমীরের কান্না, ওতে ভুল না। ওকে বেশিদিন রাখলে শেষ-পর্যন্ত জেলে ঢুকতে হবে আমায়।

ডাক্তারবাবু আছেন বলতে বলতে এসে ঢুকলেন পান্নালালবাবু দারোগা ও একজন চৌকিদার।

বিপিন: ঐ দেখ নাম করতে করতেই পুলিশ। নিশ্চয় কারোকে খুন জখম করেছে পাজিটা, নয়ত চুরি ফুরি করেছে কোথাও। আমি কিন্তু সরে পড়ছি, বল বাড়ি নেই।

মাতঙ্গিনী: সে আবার কি? আমি মেয়েছেলে, আমি কি বলব পুলিশকে? দাঁড়াও পালিও না।

চৌকিদার: কই ডাক্তারবাবু, এদিকে আসুন। দারোগাবাবু ডাকছেন যে।

বিপিন: দোহাই বাবা, আমি কিছু জানি না। আমি আগেই বলেছি ও একদিন জেলে যাবে। তাইত এখান থেকে তাড়ানর ··

দারোগা: আপনার ভাগ্নে গজেন গুপ্ত?

বিপিন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি করেছে সে। এই যে ওর মামী, ওকে বলুন। ওর আস্কারাতেই···

দারোগা: আপনাদের গজেন সেদিন প্রসিদ্ধ ডাকাত বছির আলীকে ধরায় প্রচুর সাহায্য করেছে পুলিশকে, আচমকা তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খুশী হয়ে তাই তাকে নগদ দুশো টাকা আর একটা বন্দুক দিতে রাজি হয়েছেন। ১৪ই মার্চ দুই-ই ওদের স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যেন নিয়ে আসে।

বিপিন: আচ্ছা নমস্কার।

দারোগা : নমস্কার।

দারোগা ও চৌকিদারের প্রস্থান।

বিপিন : শুনলে ? শুনলে হতভাগাটার কাণ্ড ! ডাকাতকে পর্যন্ত ভয় নেই শয়তানটার !

মাতঙ্গিনী : শুনলাম। ভালোই ত লাগল।

বিপিন : ভালো ? ভাব এবার ঐ বন্দুক থেকে কি করে মাথা বাঁচাবে। ও ত সকলকে গুলি করে শেষ করবে। সর্বনাশ হল রে।

মাতঙ্গিনী : এ কি বলছ তুমি ? এমন ভাগ্নের মামা তুমি, তাই না মুখটা এমন উজ্জ্বল হল তোমারও।

বিপিন : অ, কি আমার উজ্জ্বল রে।

দুজনের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বেহুলা নদীর গা দিয়ে চলে গেছে জংলা পথ। এই পথের ওপর ঝাঁকড়া মাথা লোহাচাবা বটগাছ। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় ছাতা হাতে জনার্দন হাজরা ও গোকুল পণ্ডিতমশায়ের প্রবেশ।

জনার্দন : এস গোকুল, একটু বসা যাক গাছতলায়। পা দুটো বড্ড ধরে গেছে। দুপুরে রোদে অত হাঁটা কি পোষায় ? তার ওপর ভরপেট খাওয়া হয়েছে।

গোকুল : খাইয়েছে কিন্তু বেশ তাই না !

জনার্দন : খাওয়াবে না ? নাতির অন্নপ্রাশন। তাছাড়া যা তা নয় ত ওর ছেলে। সেকেণ্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ। একশো দশ টাকার মাইনের চাকরি করে জেলা বোর্ডে। সেই ছেলের ছেলে।

গোকুল : তোমার মেয়ের বিয়েতে কিন্তু এমন ভাল করে খাওয়াওনি। অর্ধেক লোক মাছ পায়নি। দইও ছিল না শেষদিকে।

জনার্দন : আমি ত আর অশ্বিনী চাটুজ্যের মত ধনী নই। তার উপর আমার ছিল মেয়ের বিয়ে। তাতে ত ঘরে কিছু আসে না, ঘরের পুঁজিই বাইরে চলে যায়।

গোকুল : ও কথা বল না জনার্দন। তোমারও টাকার গতিগঙ্গা নেই। আসলে তুমি হাড়কিপটে।

জনার্দন : আমি কিপটে !

গোকুল : কিপটে নও ত কি ? নইলে তোমার ছেলে নেই, পুলে নেই। একটা মেয়ে, তারও বিয়ে হয়ে গেছে। এই যে গাঁয়ে হাই ইস্কুল নেই, হাসপাতাল নেই, টিউবওয়েল আর পাকা সড়কের জন্যে লোকে মাথা কুটে মরছে, তুমি ইচ্ছা করলেই লাখ

তিনেক ঢেলে এসব করিয়ে দিতে পার। পার না?

জনার্দন: পাগল। লাখ তিনেক টাকা আমার চোদ্দ পুরুষেও দেখেনি।

হঠাৎ গাছের ওপর থেকে একখানা পড়ম পড়ল জনার্দনের পিঠে।

গোকুল: একি খড়ম এল কোথা থেকে।

জনার্দন: আশ্চর্য ব্যাপার ত।

সঙ্গে সঙ্গে পড়ল একটা হুঁকো গোকুলের মাথায়।

গোকুল: হুঁকো। ব্যাপার কি? লোক নেই, জন নেই, ভরা সন্ধ্যেবেলায় নদীর ধারে…

ছায়ামূর্তির প্রবেশ।

জনার্দন: পালিয়ে এস, গোকুল, ভূ-ভূ-ভূ-ত।

গোকুল: পালিয়ে চল, জ জ-নার-দন-দা।

ছায়ামূর্তি: দাঁড়াও, পালালে কিন্তু ভীষণ বিপদ হবে। জনার্দন, মিথ্যে কথা বললে কেন? তোমার লাখ টাকা নেই? পাজি কোথাকার, সত্যি বল আছে কিনা।

জনার্দন: আছে, আছে। তিন চার কেন, আটদশ লাখ আছে স্যার।

ছায়ামূর্তি: তবে? শিগ্রী বল তা থেকে লাখ তিনেক দিয়ে আজই গ্রামে ইস্কুল, আর পাকা রাস্তা করাবে কিনা? নইলে কিন্তু ঘাড় ভাঙব তোমার এক্ষুনি!

জনার্দন: করাব, করাব। আমায় ছেড়ে দিন, আমি কথা দিচ্ছি স্যার।

ছায়ামূর্তি: কথা দিচ্ছ?

জনার্দন: দিচ্ছি, দিচ্ছি। সাতদিনের মধ্যেই গাঁয়ের লোক ডেকে সমিতি করে তাদের হাতে নগদ টাকা ধরে দোব।

ছায়া: বেশ। না যদি কর, সাতদিন পরে কিন্তু তোমার মুণ্ডু নিয়ে আমি গেণ্ডুয়া খেলব। আমি কে জান?

জনার্দন: না স্যার। চিনতে পারছি না ত। বলুন দয়া করে।

ছায়ামূর্তি: নারাণ ভট্টাচার্যিকে মনে আছে? তোমার কাছারিতে কাজ করত। হিসেবে ভুলের জন্যে তাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। না খেয়ে মরে গিয়েছিল বেচারী। সেই নারায়ণ আমি।

জনার্দন: মাপ করুন, মাপ করুন ভূত বাবু। অপরাধ হয়েছে আমার।

ছায়ামূর্তি: বহুত আচ্ছা। লোকের ভাল কর, তাহলেই মাপ করব আমি। নইলে সাতদিন পরেই কিন্তু—আর গোকুল?

গোকুল : বলুন বলুন ভূতবাবু, আ-আ আমি ত কোন দোষ করিনি।

ছায়ামূর্তি : করনি? গজু, পিণ্টু, বিলু, হাঁদু, এসব ভালো ভালো ছেলের নামে তাদের বাড়িতে গিয়ে নালিশ করনি? মার খাওয়াওনি তাদের? স্কুল ফাঁকি দিয়ে বাড়ি গিয়ে নিজে ঘুম দাওনি ভোঁস ভোঁস করে?

গোকুল : আর করব না হুজুর। কোনদিন কারো নামে কিছু বলব না আর। কোনদিন আর দুপুরে ঘুমুব না।

ছায়ামূর্তি : ঠিক ত? মনে থাকে যেন। নইলে কিন্তু তোমারও ঐ সাতদিন। আচ্ছা যাও এখন দু-জনেই।

জনার্দন ও গোকুল : তাই হবে হুজুর। নমস্কার।

সপ্তম দৃশ্য

ময়নার মাঠে বসেছে মস্ত সভা। মঞ্চে গলায় মালা পরে বসে আছেন জনার্দন হাজরা ও সভাপতি গোকুল পণ্ডিতমশায়। সামনে অনেক শ্রোতা তাঁদের অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে রয়েছেন।

গোকুল : প্রথমে গাঁয়ের ছোট ছোট মেয়েরা একটু নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করছে। তারপরই আমি দানবীর শ্রীজনার্দন হাজরা মশায়কে তাঁর বক্তব্য বলতে অনুরোধ করব।

ছবি, লক্ষ্মী, রাধা ও বিজয়ার প্রবেশ

গান

কোথা থেকে বাতাস আসে, কোথায় চলে যায়?
পাখী কেন রোজ সকালে খুশীতে গান গায়?

কেমন করে বনে বনে,
ফুলরা ফোটে আপন মনে,

আকাশ মাথে সোনার আবীর নিজের সারা গায়।
আমরা পারি বলে দিতে গোপন কথা তার,
বলতে পারি ফুলের পাখীর সকল সমাচার,
বলতে পারি আকাশ জলে কি সুর ভেসে যায়॥

সকলে গোল হয়ে নাচতে নাচতে প্রস্থান।

জনার্দন : মাননীয় সভাপতি, সমবেত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়েরা, আমি বক্তৃতা করতে অভ্যস্ত নই। সভাটভায় দাঁড়ালেই সারা পেটটা কেমন যেন গুড়গুড় করে আমার। আমি শুধু একটামাত্র কথাই বলছি। আজ আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখালেন, তাতে আমি কৃতার্থ। আমার যা বক্তব্য তা বিশদভাবে বলবেন আপনাদের, আমার বন্ধু সভাপতি মহাশয়।

গোকুল : বন্ধুগণ, দানবীর জনার্দন হাজরা শুধু মহান দাতাই নন, সাধুতা এবং বিনয়েও তিনি সকলের আদর্শ। এই গ্রামে একটি পাঠশালা মাত্র ছিল, আর ছিল ছোট্ট একটা দাতব্য চিকিৎসালয়। আজ তাঁরই দানে স্কুলটিকে হাই স্কুলের রূপ দেওয়ার সুযোগ হল। সুযোগ হল হাসপাতালটি বড় করার। এ ছাড়া স্টেশন থেকে যে কাঁচা রাস্তাটা এসেছে গ্রাম পর্যন্ত, তাকে পাকা করারও ব্যবস্থা হচ্ছে। এই পাঁচমাইল রাস্তা দিয়ে এরপর দু-বেলা বাস চলাচল করবে। আর সেই রাস্তার প্রতি মাইলে চারটি করে নলকূপ বসবে। আপনারা জয়ধ্বনি দিন ওঁর নামে।

সবাই : জয় দানবীর জনার্দন হাজরার জয়।

গোকুল : উনি সবশুদ্ধ তিন লক্ষ পনের হাজার টাকা এই উপলক্ষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি এজন্যে ওঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখেছেন একখানা। সেইসঙ্গে জানিয়েছেন যে কাজ শুরু হয়ে যাবে শীঘ্রই।

সবাই : আমাদের একটা পোস্ট অফিস চাই, একটা সিনেমা চাই, চাই একটা লাইব্রেরী। একটা…

জনার্দন : হবে, হবে, সব হবে। সেসব কাজে যা লাগবে, তাও আমি দোব। কি হবে আমার টাকায়? এতদিন বুঝিনি, তাই শুধু বোকার মত জমা করেছি। আজ চোখ খুলে দিয়েছেন আমার স্বয়ং ভগবান, দারুণ একটি ঘটনার ভেতর দিয়ে।

সবাই : কি ঘটনা স্যার, বলুন একটু আমাদের।

গোকুল : বন্ধুগণ, ওঁর শরীর অসুস্থ, ওঁকে বকাবেন না আর। আমিই বলছি। উনি আর আমি দুজনে আসছি একদিন নদীর ধার ধরে, একটা নিমন্ত্রণ সেরে। হঠাৎ লোহাচোরা বটগাছের ওপর থেকে হল এক দৈববাণী। দুজনেই শুনলাম, ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল ওঁর মতি পরিবর্তন।

গজু : আমি একটা কথা বলব স্যার?

গোকুল : না, না, লক্ষ্মী ছেলে, তুমি বস। বড়দের সভায় ছোটদের কিছু বলতে নেই। তোমার কথা আমি বলছি সকলকে। এই যে গজু, বিপিনবাবুর ভাগ্নে শ্রীমান গজেন, এও আমাদের গ্রামের একটি উজ্জ্বল রত্ন। সাহসিকতা ও সমাজ সেবার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একে উপহার দিয়েছেন নগদ দুশো টাকা, আর এই বন্দুকটি। এই নাও গজু। [বন্দুক দিয়ে] ওর নামেও জয়ধ্বনি দিন আপনারা।

ছেলেরা : থ্রি চীয়ার্স ফর গজেন গুপ্ত! গজু সর্দার জিন্দাবাদ। লং লীভ গজেন ভাই!

জনার্দন : খুব বাঁচিয়েছ ভাই। আমি ত আর একটু হলে বলেই ফেলেছিলাম ভূতের কথা। এইসা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম !

গোকুল : রামো, রামো। তাহলে কি আর গাঁয়ে টেঁকা যেত ?

অষ্টম দৃশ্য

বিপিন : গজা, গজা কোথায় ? রাধানগরের সেই প্রাণকেষ্টবাবু এসেছেন। এখনি নিয়ে যাবেন ওকে। এই দেখ দুশো টাকা দাম দিয়েছেন তিনি।

মাতঙ্গিনী : ওকে ত অনেকক্ষণ থেকে দেখছি না। কোথায় গিয়েছে কে জানে ! যা মাথায় তুলেছে গাঁয়ের লোক, শেষ পর্যন্ত গেলে হয় !

বিপিন : যেতেই হবে। না গেলে বেঁধে বিদেয় করব আমি। বসে বসে খাওয়াব ওকে আমি ? দামড়া পাজি, অকাল কুষ্মাণ্ড !

মাতঙ্গিনী : ভদ্রলোককে ততক্ষণ চা-টা দাও একটু। ও আসুক।

বিপিন : হ্যাঁ চা দোব, না বাগবাজারের রসগোল্লা এনে খাওয়াব। এ হল ব্যবসা। খদ্দের এসেছে, পয়সা ফেল, মাল নিয়ে সরে পড়। কিন্তু ছুঁচোটা গেল কোথায় ? বিপদে ফেললে ত !

মাতঙ্গিনী : দেখ ত মাঝের এই দুয়োরটা খুলে, ভাঁড়ারঘর থেকে কেমন যেন বিড়বিড় শব্দ শুনছি একটা !

বিপিন : গজু ?

মাতঙ্গিনী : ওকি করছিস তুই, অ্যাঁ ?

গজু : আঃ ঈশ্বরের নাম করছি, উৎপাত করছ কেন ?

বিপিন : ঈশ্বরের নাম করছিস ত মুসলমানদের মতন করে করছিস কেন ?

গজু : মুসলমানরা মুসলমানদের মত করে করবে না ত কার মত করে করবে ?

বিপিন : মুসলমান ? কে মুসলমান ? তুই নিস্তারদি আর অম্বিকা জামাই বাবুর ছেলে না ?

গজু : কে বলছে ? আমি রোকেয়া বিবি ও মকবুল মিয়ার ছেলে। তোমার খুড়তুত ভগিনীপোত তারিণী সেন তের টাকা ঘুষ দিয়ে আমাকে গজু সাজিয়ে নিয়ে এসেছে, তোমাদের জাত মারতে।

মাতঙ্গিনী : কি সর্বনাশ ! আমরা যে তোর হাতে খেয়েছি। তোকে যে ঘরদোর হাঁড়িকুড়ি, সব্বস্ব ছুঁতে দিয়েছি।

বিপিন : জাতধর্ম সব নষ্ট হবে। এখন উপায় ?

মাতঙ্গিনী: ওরে আমার কি হল রে। ওরে হতচ্ছাড়া গজা, এ তুই কি করলি রে?

গজু: কোন ভয় নেই মামী। তুমি এক ফোঁটা গঙ্গামাটি আর একটা তুলসীপাতা খাইয়ে দাও আমাকে, আর মামা তোমার পৈতেটা ছুঁইয়ে দাও একবার আমার মাথায়। দেখবে তাহলেই ফের আমি হিন্দু হয়ে যাব।

বিপিন: যাবি? তাই যা বাবা। কিন্তু লক্ষীটি, কারোর কাছে যেন বলিসনে এসব কথা।

গজু: ওরে বাবা, তাই কখনো বলতে পারি? কিন্তু তোমরাও আর আমাকে বিক্রি করতে যাবে না বল।

বিপিন: না, না, কখনো না। আমি এক্ষুনি টাকা ফেরত দিচ্ছি প্রাণকেষ্টবাবুকে।

গজু: খেঁদীর মাকে ফের কাজে লাগাবে বল। আমাকে দিয়ে আর ভাত রাঁধাবে না, জল তোলাবে না, বাসন মাজাবে না বল। শান্তিতে লেখাপড়া আর খেলাধুলো করতে দেবে বল। নইলে কিন্তু…

মাতঙ্গিনী: ওরে না, না। তোকে আর কিছু করতে হবে না। তুই আমার সোনা ছেলে, আমার গজুমণি!

গজু: তাহলে মামী, ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া ঐ দুশো টাকা তুমিই নাও। ঐ দিয়ে তোমার আচার, আমসত্ব আর বড়ি করে নাও। আমি কথা দিচ্ছি আর কোনদিন তা চুরি হবে না!

যবনিকা

কণ্টক

সত্যবন্ধু সমাদ্দারের অফিস। আধুনিক কায়দায় সাজানো অফিস ঘর। টেবিলের একপাশে লেখার সরঞ্জাম, বেতের চৌকো টুকরিতে জরুরী কাগজ-পত্র, আর একপাশে টেলিফোন। গদি-আঁটা ঘোরানো চেয়ারে বসে আছেন শ্রীসমাদ্দার। তাঁর বিপরীত দিকে দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। দুপুর।

সমাদ্দার। কি করি বলো? সময় নেই।

সমরেশ। তা বললে হবে না স্যার, একটু সময় করে নিতেই হবে আপনাকে।

অশান্ত। বাংলা দেশে আজ বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে দু-কথা বলার লোক আপনি ছাড়া কে আছেন? আপনার এত বড় মনীষা, আপনি শুধু ব্যবসা নিয়ে পড়ে থাকবেন, এ আমাদের ভাবতেই কষ্ট হয় স্যার।

সমাদ্দার। তাই ত হে, বড্ড যে ফ্যাসাদে ফেললে তোমরা! কি জানো? এক সময় ভেবেছিলাম, সমাজসেবা আর সাহিত্যসেবা নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দোব। কিন্তু জীবন-বিধাতার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম! তিনি ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন মস্ত বড় ভার! কি করবো? মেনে নিলাম।

পূরবী। কিন্তু দেশ কি বঞ্চিত হল না তাতে?

সমাদ্দার। হল হয়ত একদিকে। কিন্তু আর একটা দিক থেকে লাভবানও হল। আমাদের দেশে সবাই করে সাহিত্য, নয় করে রাজনীতি। জাতির যাতে ঐশ্বর্য বাড়ে, মানুষের যাতে জীবিকার সংস্থান হয়, তেমন কাজ কেউ করে না। সেই কাজে এগিয়ে এলাম আমি।

সমরেশ। এ-কাজের জন্য অনেক লোক আছেন স্যার। আপনার মতো প্রতিভা-সম্পন্নদের...

অশান্ত। জন্যে এ-জায়গা নয়।

সমাদ্দার। ভুল করছো। ব্যবসার রাজ্যে জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ লোকদেরই ত আসা দরকার। তাহলে এই রাজ্যে আসবে সত্যিকার জনকল্যাণের চিন্তা, সত্যিকার শুচিতার আবহাওয়া।

পূরবী। সে কি সম্ভব?

সমাদ্দার। কেন নয়? এই দেখো, আমার এখানে যা রোজগার হচ্ছে, ছোট-বড় সবাই তার সমান অংশীদার হচ্ছে। মুনাফা নেই, শোষণ নেই। এই আমাকে তোমরা

দেখছো একটা জবরদস্ত সাহেব, কিন্তু আসলে আমি ফকির। নিজের বলতে আঁ কানাকড়িটি নেই। কি জানো? ছোট্টবেলায় নিয়েছিলাম ত্যাগের মন্ত্র, সারা জীবন তাই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। কিন্তু যাক ওসব। হ্যাঁ, তোমাদের সংস্কৃতি পরিষদের কথা বলো।

অশান্ত। সামনের শনিবার, সাতই নভেম্বর আমরা একটা সিম্‌পোসিয়মের আয়োজন করেছি। তাতে তুলনামূলক সাহিত্য সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন।

সমাদ্দার। আচ্ছা তাই হবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই কিন্তু ছেড়ে দেবে আমাকে। দেরী করবে না। সময় সম্বন্ধে হুঁশিয়ার নয় আমাদের দেশ। আমি কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ধরে চলি।

তিনজন উঠে দাঁড়াল। পূরবী ছোট্ট একখানা খাতা বের করে মেলে ধরল টেবিলের উপর

সমাদ্দার। ওটা কি আবার? অটোগ্রাফ?

পূরবী। হ্যাঁ স্যার, দু-লাইন কিছু লিখে দিতে হবে আপনাকে।

সমাদ্দার। দাও দেখি।

কলম নিয়ে লিখলেন। খাতাটি বন্ধ করে ফেরত দিলেন পূরবীকে। ওরা নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। সমাদ্দার কলিং বেল টিপলেন তারপর। উর্দিপরা বেয়ারা এসে ঢুকলো।

বেয়ারা। একটি বুড়ো ভদ্দরলোক বসে আছেন অনেকক্ষণ থেকে।

সমাদ্দার। বসে আছে থাক, দেরী হবে। যা কালীবাবুকে ডেকে আন।

বেয়ারা চলে গেল। দু-মিনিট পরে এসে ঢুকলেন কেরাণী কালীচরণ দাস।

কালী। নমস্কার স্যার।

সমাদ্দার। হ্যাঁ, শোনো কালী। তুমি ত ইংরেজীর এম-এ, না? সাহিত্য-টাহিত্য ত ভালোই পড়েছো, কি বলো!

কালী। কিছু কিছু পড়েছি স্যার। কিন্তু কেরাণীগিরি করতে করতে তার কি আর কিছু বেঁচে আছে আজ্ঞে?

সমাদ্দার। দেখো, তোমাদের এই নালিশের প্রবৃত্তিটা আমার ভালো লাগে না। যে যেখানে পড়েছো, যে যা কাজ পেয়েছো, তার মধ্যে থেকেই নিজেকে ফুটিয়ে তোলো। কেরাণী বলছো, ল্যাম্ব কেরাণী ছিলেন, শরৎ চাটুজ্যে কেরাণী ছিলেন, তাঁরা বড় হননি? পৌরুষ চাই, আত্মবিশ্বাস চাই! হ্যাঁ, একটা কাজ করো দেখি কালী। বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে একটা গুছিয়ে, কি বলে প্রবন্ধ, হ্যাঁ, প্রবন্ধ লিখে দাও ত আমাকে!

কালী। বিশ্বসাহিত্য?

সমাদ্দার। হ্যাগো, এই ইংরেজি ফরাসী-টরাসির কথা কিছু বলবে। বাংলার কথা ত বলবেই, আর দেশপ্রেমের আদর্শটা…মানে আমিই লিখতে পারতাম, এককালে দিনরাত্রি ডুবে থাকতাম সাহিত্য নিয়ে। কিন্তু দেখতেই ত পাচ্ছো, আজ আমার মরার সময় নেই।

কালী। আমি ত ফরাসী জানিনে স্যার।

সমাদ্দার। আঃ কালী, তুমি বড্ড ঘ্যানঘেনে স্বভাবের। যাও, লিখে ফেলো। শুক্রবারের মধ্যেই চাই কিন্তু। হ্যাঁ, টাইপ করিয়ে দেবে।

কালী। নমস্কার স্যার।

প্রস্থান

অফিসের আর এক কামরা। টাইপিষ্ট চামেলী দাস খটখট করে টাইপ করছেন। আর এক টেবিলে বসে কেরাণী জগন্নাথ সিগারেট টানছেন টেবিলের কোণে হাঁটু তুলে দিয়ে। কালীচরণ মোটা দু-খানা বই নিয়ে বিব্রত মুখে বসে আছেন। হাতে একটা পেন্সিল।

জগন্নাথ। এই ত কালীদা, এই জন্যেই লেখাপড়া শিখিনি।

কালী। ব্যস্ত হয়ো না ভায়া, সামনেই আসছে ইকনমিক কনফারেন্স। আর তাতে সাহেবই হয়েছেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। তখন তোমারও স্কন্ধভঙ্গ হবে। ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছিলে না ইকনমিকসে? বক্তৃতা না লিখে পার পাবে ভেবেছো?

চামেলী। একসঙ্গে সাহিত্য আবার অর্থনীতি!

কালী। আরে মিস দাস, টাকা আর ক্ষমতা যার আছে, সে সব জানে, দর্শন জানে, সাহিত্য জানে, রাজনীতি জানে, রসায়ন জানে, আইন জানে। জানে না কি?

জগন্নাথ। কেননা, যারা জানে, তারা যে তাদের দরজায় নোকর খাটে!

বেয়ারার প্রবেশ

বেয়ারা। ডাকছেন!

জগন্নাথ। কাকে? আমাকে?

বেয়ারা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালী। যাও ভায়া, বোধ করি সঙ্গে সঙ্গেই বরাত খুলে গেল তোমারও। বিশ্ব-অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি…

জগন্নাথ। কালীদা, ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

জগন্নাথ ও বেয়ারার প্রস্থান

কালী। তারপর?

চামেলী। বলেন সিনেমায় নামতে। এক বছরের মধ্যেই বাড়ি গাড়ি এবং মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স…

কালী। এক ছবির দৌলতে?

চামেলী। তা কেন? আমাকে আস্তে আস্তে স্টার বানিয়ে দেবেন যে। তিনটে-চারটে কোম্পানিতে মোটা শেয়ার আছে, ডিরেক্টর-ফিরেক্টর সব যে ওঁর হাত ধরা।

কালী। বুঝলাম। তা ওঁর স্বার্থটা কি?

চামেলী। নিঃস্বার্থ দেশসেবক ও সংস্কৃতিসাধক, ওঁর আবার স্বার্থ কি? দেশের শিল্পোন্নতি করা এবং গরিব একটি মেয়েকে কেরিয়ার গড়তে সাহায্য করা।

কালী। শুধু এই?

চামেলী। আর একটু আছে। ওঁর ঘরের মধ্যেই অ্যান্টিচেম্বার তৈরি হচ্ছে একটা, আমি বসবো সেখানে। আর সামনের জানুয়ারিতে যখন উনি রেঙ্গুন যাবেন…

কালী। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে।

চামেলী। হ্যাঁ।

কালী। বেশ ত, কন্‌গ্র্যাচুলেশন মিস দাস!

চামেলী। ভয় নেই, স্টার হয়ে বসতে পারলে, সাইড-রোল দু-একটা জুটিয়ে দিতে পারবো আপনাকেও।

জগন্নাথের প্রবেশ

জগন্নাথ। দেখুন ত জুলুম! একাউন্টেন্ট আসেননি, তাঁর জায়গায় কাজ করতে হবে আমাকে।

কালী। বেশ ত ভায়া, পরের টাকা হাত দিয়ে নাড়লে-চাড়লেও সুখ!

জগন্নাথ। ভাবছিলাম পৌনে পাঁচটা নাগাদ উঠে পিটটান দেবো। ভালো খেলা আছে।

কালী। সবই ত খেলা রে ভাই। কে খেলায় আমি খেলি বা কেন, জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন!

বেয়ারার প্রবেশ

বেয়ারা। হালদার সাহেব এসেছেন, ডাকছেন।

বেয়ারার প্রস্থান

কালী। সেই সিনেমার মক্কেল বুঝি?

চামেলী। হ্যাঁ, এখন কি করি?

কালী। ভয় নেই, চলে যাও। বলোগে, বাবা-মাকে জানাই. তাঁরা মত করলে…

চামেলী চলে গেলেন। কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে তাঁর পিছু পিছু গেলেন জগন্নাথ। কালীচরণ আবার বইয়ে মন দিলেন। কেমিষ্ট হরপ্রিয় সান্যাল এসে ঢুকলেন ঘরে। হাতে একতাড়া কাগজ।

হরপ্রিয়। না কালীদা, এ হয় না, হতেই পারে না। আমরা মানুষ নই? দেশের জন্যে কি আমাদের একটুকু দরদ নেই? আমি রেজিগ্‌নেশন দোব।

কালী। তা ত দেবে ভায়া, তাতে তুমিই চলে যাবে। অন্যায় যা, তা ত যাবে না, তা ঠিকই থাকবে।

হরপ্রিয়। তা-ও যাবে। আমি ফাঁস করে দোব এই জাল আর ভেজালের কাহিনী।

কালী। দেবে কোথায়? কে বিশ্বাস করবে? আর করলেও সাহস পাবে কে তার প্রতিকার করতে? এত সোজা হলে ত কবেই হয়ে যেত সব অন্যায়ের প্রতিকার! মাথা ঠাণ্ডা করো, গেরস্ত ঘরের ছেলে—

হরপ্রিয়। না কালীদা, এই হাত দিয়ে হাজার হাজার মানুষের খাদ্যে ভেজাল আর ওষুধের নামে বিষ চালান হচ্ছে বাজারে। এই হাত একদিন আমি ঠেকিয়েছি রবি ঠাকুরের পায়ে। এই হাতে করেছি আমার সেই ব্যাক্টেরিওভিন আবিষ্কার…এ হাতের অপমান, এ হতে দেব না আমি।

কালী। হাত আর মাথার অপমানই ত এযুগে মানুষের সবচেয়ে বড় পরাজয় রে ভাই!

শ্রীসমাদ্দার চেয়ারে বসে পাইপ টানছেন। ম্যানেজার মুরারি নস্কর দাঁড়িয়ে আছেন একখানি কাগজ হাতে। বেলা আন্দাজ এগারোটা।

সমাদ্দার। দু-বছরও হয়নি। হঠাৎ একদিন এসে কেঁদে পড়লো, একটা চাকরি দিন। ঘরে বুড়ো মা-বাপ, নাবালক ভাই-বোন। এরি মধ্যে এমন তালেবর হয়ে উঠেছে যে, এককথায় চাকরি ছেড়ে চলে যেতে চাইছে?

মুরারি। আজ্ঞে, ও বলে বিবেকে বাধছে। মহাপাপ হচ্ছে!

সমাদ্দার। পাপ?

মুরারি। হ্যাঁ। ও বলে, এই হাত দিয়ে মানুষের খাদ্য আর ওষুধ বলে যা তৈরি করছি, তা বিষ। হাতের এই অপমান—

সমাদ্দার। ননসেন্স! এখনি বিদায় করে দাও। দু-দিন পেটে দানা না পড়লে আপনি বুঝবে, কি পাপ আর কি পুণ্যি!

মুরারি। কিন্তু স্যার, অফিসের সব খবর ও জেনেছে। এখন বাইরে বেরিয়ে গিয়ে যদি ফাঁস করে দেয় সব, তাহলে ত বিপদ হবে।

সমাদ্দার। তা বটে। কিছু টাকা ছাড়ো না, বিবেকের বাঁদরামি ছুটে যাবে দু-মিনিটেই।

মুরারি। না স্যার, সে জাতের ছেলে নয়।

সমাদ্দার! বেশ, তাহলে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। এখন যাও একটু ভেবে দেখি।

মুরারীর প্রস্থান

সমাদ্দার কলিং বেল টিপলেন। উর্দি-পরা বেয়ারা এসে দাঁড়ালো

বেয়ারা। চা দোব স্যার?

সমাদ্দার। না, মিস দাস টাইপিস্টকে সেলাম দাও।

বেয়ারা চলে গেল। সমাদ্দার কেমিষ্ট হরপ্রিয় সান্যালের কর্মত্যাগের দরখাস্তখানা পড়তে লাগলেন। টাইপিষ্ট মিস চামেলী দাস এলেন।

চামেলী। আমাকে ডেকেছেন স্যার?

সমাদ্দার। হ্যাঁ। তোমার মনে আছে মিস দাস, তোমার অনুরোধেই কেমিস্ট হরপ্রিয়কে কাজে নিয়েছিলাম?

চামেলী। হ্যাঁ স্যার।

সমাদ্দার। তুমি ত তখন জানাওনি যে ও বিপ্লবী। অফিসের সমস্ত খবর জেনে নিয়ে আজ ও হুমকি দিচ্ছে, বাইরে গিয়ে সব রাষ্ট্র করে দেবে বলে!

চামেলী। না স্যার, উনি বিপ্লবী নন। কোনরকম হুমকিও দিচ্ছেন না। ওঁর মনটা ভারী কোমল, যা অন্যায় বলে বোঝেন, তা উনি কিছুতেই করতে পারেন না!

সমাদ্দার। অন্যায়! ব্যবসার জগৎ আর ধর্মের জগৎ এক নয়, বিজ্ঞানপড়া একালের ছেলেকে এটা বোঝাতে হয়, এ এই প্রথম দেখলাম। তা শোনো মিস দাস, তোমার খাতিরেই ওকে কাজে নিয়েছি। তোমার দায়িত্ব ওকে সামাল দেওয়া। আমি শুনেছি ওর সঙ্গে তোমার···

চামেলী। আমাকে আপনি শুধু-শুধু দায়ী করছেন স্যার! ওঁর ছোট বোন আমার সহপাঠিনী, সেইটুকুমাত্র চেনাশোনা। আমি ওঁকে বোঝাবো কি করে?

সমাদ্দার। সে আমি জানি না!

অফিসের অন্য অংশ। ল্যাবরেটারীর ছোট্ট একটা কামরা। কেমিষ্ট হরপ্রিয় সান্যাল মাইক্রোস্কোপে চোখ দিয়ে কি-একটা জিনিস পরীক্ষা করছেন। এক পা এক পা করে ঘরে এসে ঢুকলেন চামেলী দাস।

চামেলী। আমার ওপর হুকুম হয়েছে, তোমাকে সায়েস্তা করে দিতে হবে। কেননা, আমার অনুরোধেই তোমাকে কাজে নিয়েছেন।

হরপ্রিয়। সায়েস্তা কাকে বলে আজই দেখতে পাবে সবাই। সায়েস্তা খাঁ এলো বলে!

চামেলী। আমার ত মনে হয়, ওদের কিছুই হবে না। মধ্যে থেকে তুমিই ফ্যাসাদে পড়বে!

হরপ্রিয়। অত সোজা নয়। আমি সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ঠিক করে রেখেছি। হাতে-কলমে প্রমাণ করে দোব। আসল ব্যাপারটা বলি শোনো। অ্যান্টি করাপ্‌শনে আমি খবর দিয়েছি। কাগজ-পত্র, ফটো, স্যাম্পল, সব চালানও করে দিয়েছি কায়দা করে। আজই সরেজমিনে এন্‌কোয়ারি হবে।

চামেলী। সর্বনাশ!

হরপ্রিয়। সর্বনাশ নয়, সর্বনাশের শেষ দিন! ঘাবড়াচ্ছো কেন?

চামেলী। জলে দাঁড়িয়ে কি কুমীরের সঙ্গে লড়াই চলে?

হরিপ্রিয়। তা চলে না। কিন্তু ডাঙায় দাঁড়িয়ে কুমীরকে টেনে তোলা যায় জল থেকে। আমি সেই কাজেই কোমর বেঁধেছি।

চামেলী। আমার কিন্তু ভয় করছে।

হরপ্রিয়। ভয় করবে সত্যকে, মনুষ্যত্বকে। চোর জুয়াচোর বদমাইসকে ভয় করবে কেন? আমরা এই ভয় করি বলেই ত তারা আজ এত বেড়ে উঠেছে। এমন-ভাবে সকলের মাথায় পা দিয়ে হাঁটছে!

চামেলী। আমাদের কথা নিয়ে কানাঘুষো চলছে অফিসে, সে খবর জানো?

হরপ্রিয়। জানি। গ্রাহ্য করি না!

দৃশ্যান্তর

কিছু পরে। অফিসের বড় হল ঘর যেখানে অধিকাংশ কর্মচারী বসে।

দৌড়তে দৌড়তে চামেলীর প্রবেশ। তার পিছু পিছু অফিসের একদল কর্মচারীর প্রবেশ।

চামেলী। কালীদা, কালীদা, শিগ্রী বাঁচান আমাকে। শিগ্রী এখান থেকে বের করে দিন। মিঃ সমাদ্দারের গালে এক চড় বসিয়ে দিয়েছি।

কালী। সে কি ?

চামেলী। হ্যাঁ, তিনি আমার গায়ে হাত দিয়েছিলেন। আমাকে কিস করতে এসেছিলেন।

বিশ্বনাথ। মিথ্যে কথা! দেশবিখ্যাত একটি সম্রান্ত মানুষের নামে মিছে কুৎসা করবেন না।

গিরিজা। আমরা আশেপাশেই ছিলাম। আমরা শুনিনি, কি কথা হয়েছিল ? আপনি অফিসে বসে হরপ্রিয়বাবুর সঙ্গে প্রেমপত্র চালাচালি করেন...

হরপ্রিয়। মুখ সামলে কথা বলবেন।

গিরিজা। কেন, মারবেন নাকি ?

বিশ্বনাথ। খুব যে ডাঁট দেখাচ্ছেন!

কালী। আহা, তোমার করছো কি সব ? তোমরা এইরকম কাটাকাটি ফাটাফাটি করবে, এটাই ত চায় সবাই। তোমরা এক হলেই ত মুশকিল! সেটা বোঝো না কেন ?

হঠাৎ একজন পুলিশ অফিসার ও দু-জন কনস্টেবল সহ সত্যবন্ধু সমাদ্দার এবং ম্যানেজার মুরারি নস্করের প্রবেশ। গোলমাল চুপ হয়ে গেল। কর্মচারীরা দু-দিকে ভাগ হয়ে দাঁড়ালেন। এককোণে ঘাড় হেঁট করে চামেলী, তাঁর পাশে কালীচরণ, অন্যকোণে হরপ্রিয়।

সমাদ্দার। এই টাইপিস্ট চামেলী দাস, আর এই কেমিস্ট হরপ্রিয় সান্যাল। এরা দুটি বিপ্লবী। এরা এখানে ঢুকেছে আমার কারবার ফাঁসানোর আর আমাকে খুন করার প্ল্যান নিয়ে।

ইনস্পেক্টর। এদের ত দেখলেই চেনা যায় মিঃ সমাদ্দার। আপনার মত বহুদর্শী মানুষের ভুল হল কি করে ?

সমাদ্দার। কি জানেন ? চিরদিন দেশসেবা করেছি, আর করেছি বিজ্ঞানের চর্চা। তরুণদের দুঃখ দেখলে থাকতে পারি না। যে কাজ চায়, তাকেই দিই। আমার ত লাভের ব্যবসা নয়। তাইতেই সন্দেহ করিনি।

ইনস্পেক্টর। যাই হক, খুব একটা ক্রাইসিস সেভ্‌ড হয়ে গেছে! পিস্তল রীতিমতো লোডেড রয়েছে, একটি হিট হলেই—সিপাই লোগ, পাকড়াও দো আদমিকো।

পুলিশ গ্রেপ্তার করলো দু-জনকে। সমাদ্দার গটগট করে চলে গেলেন আপন ঘরে। তাঁর পিছু পিছু ম্যানেজার ও অন্যেরা চলে গেলেন। শুধু থাকলেন কালীচরণ, ইনস্পেক্টর, বন্দী দু-জন ও পুলিশরা। কালীচরণ এগিয়ে এলেন।

কালী। ইনস্পেক্টর বাবু!

ইনস্পেক্টর। কিছু বলছেন ?

কালী। দেখুন, বিশেষ কিছু বলবো না। শুধু একটা কথা রাখেন যদি···

ইনস্পেক্টর। বলুন।

কালী। আপনি একবার গো-ডাউনটা তল্লাসী করুন। তাহলে বুঝবেন, এ-বাড়িতে গ্রেপ্তার করার আসল লোকটিই এখনো ধরা পড়েননি। ফালতু লোকদের কেন হয়রান করছেন শুধু শুধু দাদা !

ইনস্পেক্টর। যান, যান, কেটে পড়ুন। সিপাই লোগ, দো আদমিকো ভ্যান পর চড়াও।

হরপ্রিয় ও চামেলী। নমস্কার কালীদা।

কালীচরণ ও বেয়ারা জানকী ছাড়া সকলের প্রস্থান

কালী। বিশ্বসাহিত্য লিখছি, বুঝেছিস জানকী !

জানকী। কি লিখছেন ?

কালী। বিশ্ব নামে এক সদাশয় রাজা ছিলেন, তাঁর রাণীর নাম হল সাহিত্য !

সমাদ্দারের অফিস ঘর। সমাদ্দার বসে বসে পাইপ টানছেন। ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো।

সমাদ্দার। হ্যালো ? কে মিলি ? গুড গড ! কি হুকুম ? ওঃ ! কি করি বলো ? এক গলা কাজে ডুবে আছি। সময় কোথায় ? লোক ? তা ঢের আছে, কিন্তু লোকই, মানুষ নয়। যেটি নিজে না করব সেটিই পণ্ড হবে। ল্যাবরেটারীর রিসার্চ বলো, ক্যাশ বলো, করেসপণ্ডেন্স বলো, মালপত্রের লেন-দেন বলো, সবই শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে আমার ঘাড়ে। এর উপর আছে কর্মচারীদের অভাব-অভিযোগ। এর কন্যাদায়, ওর ব্যারাম, তার মামলা ! আছে পাব্লিক ওয়ার্কস, সভা-সমিতি, স্কুল কমিটি, অনাথ আশ্রম। এখানে বক্তৃতা দাও, ওখানে উদ্বোধন করো, সেখানে চাঁদা দাও। দূর দূর, বিরক্ত হয়ে গেছি ! নাম-ধাম পয়সা এ ত আমি চাইনি মিলি। ঘটনাচক্রে এসব এসে চেপেছে আমার ওপর। আমার চেয়ে ঢের সুখী আমার টাইপিস্টরা, কেরাণীরা। তাদের ছোট্ট জীবন, ছোট্ট সমস্যা ! সত্যি ? আচ্ছা দেখি। ইচ্ছে ত করছে, কিন্তু এখন কি করছি শুনবে ? কম্প্যারেটিভ লিটারেচার সম্বন্ধে বক্তৃতা লিখছি। আচ্ছা, চীয়ার ইউ মিলি !

বিশ্বনাথ ও গিরিজার সবেগে প্রবেশ

গিরিজা। স্যার, সর্বনাশ হয়েছে ! অ্যান্টিকরাপ্‌শন পুলিশ গুদামঘরে ঢুকে বস্তা

বস্তা চুনো পাথর, তেঁতুল বিচির গুঁড়ো, আর শেয়ালকাঁটার দানা টেনে বের করছে।

বিশ্বনাথ। ল্যাবরেটারীতেও ঢুকবে বলছে। কি হবে স্যার? মুকুন্দ সোমের লাশটা যে এখনো ন্যাকড়া-জড়ানো রয়েছে ওভেনের কাছে!

সমাদ্দার। মুকুন্দ সোম? ও সেই একাউন্টেন্ট! ভারী বেড়েছিল ব্যাটা! বলে কিনা দু-হাজার টাকা বোনাস দিতে হবে। নইলে ট্যাক্স-ফাঁকির কথা বাইরে বলে দেবে। ওটাকে খতম করে ভালই করেছো! কিন্তু লাশটা বোকার মত ফেলে রাখতে গেলে কেন ওখানে?

বিশ্বনাথ। কি করবো স্যার? রাত না হলে ত উপায় নেই রিমুভ করার। লরি, ত্রিপল, সব রেডি করাই আছে।

গিরিজা। আপনি বরং চলে যান স্যার। কেমন যেন আবহাওয়াটা ভাল ঠেকছে না।

সমাদ্দার। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যস্ত হচ্ছো কেন অত? হ্যাঁ, তোমরা এখন যাও। দরকার হলেই খবর পাঠাবো আমি।

টেলিফোন তুলে নিলেন সমাদ্দার এবং ক্ষিপ্রহাতে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন

দৃশ্যান্তর

ল্যাবরেটারীর সামনে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে ঢুকলেন ম্যানেজার মুরারি নস্কর। পিছু পিছু এলেন গিরিজা ও বিশ্বনাথ। সময় প্রায় বিকেল।

মুরারি। ভিখু, ভিখু, জলদি পিছুবালা ফটক খোল দো। জরুরি লরি পাস হোগা।

ভিতর থেকে। খোলা হুয়া হজৌর।

মুরারি। যাও বিশু, তুমি নিজেই লরিটা ড্রাইভ করে নিয়ে যাও। গিরিজা, তুমিও সঙ্গে যাও। দু-জনে দাঁড়িয়ে থেকে ডেলিভারী দিয়ে এসো।

গিরিজা। আচ্ছা স্যার।

বিশ্বনাথ। ফলতায় গঙ্গার ধার ত স্যার?

মুরারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও আর দেরি করোনা।

দু-জনের প্রস্থান। নেপথ্যে লরি বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ। হুড়মুড় করে অ্যান্টিকরাপ্‌শন বাহিনীর প্রবেশ। সঙ্গে অফিসার।

অফিসার। কই, খুলিয়েছেন ল্যাবরেটারীর দরজা?

মুরারি। হ্যাঁ, এই যে চাবি আনতে পাঠিয়েছি। কই রে উদ্ধব, চাবিটা নিয়ে আয় শিগ্‌গী করে!

অফিসার। কতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবো আমরা? দেরি হলে দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে কিন্তু।

মুরারি। ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এসেছেন নাকি? চাবিটা আনতেও তর সইছে না!

অফিসার। খুব যে ওস্তাদী দেখাচ্ছেন! জানেন—

মুরারি। ঐ আমাদের প্রোপ্রাইটর মিঃ সমাদ্দার এসেছেন।

অফিসার। প্রোপ্রাইটার হন, পরমেশ্বর হন, আমার তাতে যায় আসে না কিছু। আমি অর্ডার-মত কাজ করব। সিপাই লোগ কেয়াড়ী তোড়ো।

সমাদ্দারের প্রবেশ। তাঁর সঙ্গে একজন আর্দালিসহ ক্রসবেল্ট ও তিন তারা-ধারী মিঃ সিনহার প্রবেশ। তাঁকে দেখেই পুলিশ অফিসার মিলিটারি কেতায় সেলাম দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। অফিসারকে ইঙ্গিতে ডাকলেন মিঃ সিনহা এবং কানে কানে কি বললেন।

অফিসার। অ্যাটেনশন! এব্যাউট টার্ণ! রিটায়ার!

বাহিনী বেরিয়ে গেল। পিছু পিছু চলে গেলেন তাদের অফিসার

সিনহা। অপরাধ নেবেন না স্যার, আপনাকে অযথা হয়রান করার জন্যে হেড-কোয়ার্টার খুবই লজ্জিত।

সমাদ্দার। এইধরনের হ্যারাসমেণ্ট চলতে থাকলে, ফ্রি ইণ্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ কি বলুন ত মিঃ সিনহা?

সিনহা। তা ত বটেই স্যার। কিন্তু ওদের অবস্থাটাও ভেবে দেখবেন একটু। ওরা হুকুমের দাস, ওপর থেকে হুকুম হলেই ওদের হাজির হতে হয়, আবার ওপর থেকে হুকুম হলেই…

সমাদ্দার। বুঝলাম। কিন্তু এই পলিসি নিয়ে চলেন যদি আপনারা, তাহলে দেশ গড়ব কি করে আমরা? এই এডমিনিস্ট্রেশনকে সাপোর্টই বা করব কি করে?

সিনহা। না, আর এরকম হবে না। আচ্ছা তাহলে আসি স্যার। আমাদের ভুল বুঝবেন না যেন!

সমাদ্দার। না, ভুল বুঝে আর কি করব? এই ত আমাদের দেশ! অথচ এই দেশকে ভালোবেসেই সারা জীবন দুঃখ ভোগ করলাম! হ্যাঁ, ম্যানেজার একটু চা খাইয়ে দাও ওঁকে।

মুরারি। আচ্ছা স্যার। আসুন মিঃ সিনহা।

ম্যানেজার ও মিঃ সিনহার প্রস্থান। কালীচরণ ও জগন্নাথের প্রবেশ

কালী। সেই সংস্কৃতি পরিষদের ছেলেমেয়েরা এসে বসে আছেন। ওঁদের সভায়…

সমাদ্দার। হ্যাঁ, যাচ্ছি। পারি না আর ছুটোছুটি করতে। তোমার লেখাটা পড়লাম কালী। বড্ড ভাগা ভাসা হয়েছে। আমার নামে কাগজে বেরবে ত। তাই খবটা খুঁত খুঁত করছে।

প্রস্থান

কালী। বুঝলে ত জগন্নাথ।

জগন্নাথ। তা আর বুঝিনি? ভারী দুঃখ হচ্ছে আমার চামেলী আর হরপ্রিয়ার জন্যে।

কালী। দুঃখ করে আর লাভ কি ভাই? ছেলেমানুষ, ওরা গেছে বাঘের নাকে দড়ি পরাতে! চলো, চণ্ডীতলা দিয়ে যাই। পথ থেকে মুকুন্দর খবরটা নিয়ে যাই। দু-দিন আসছে না কেন কে জানে!

যবনিকা

ফুলশয্যার পরদিন সকালে নটবর বসে চা খাচ্ছেন, আর খবর কাগজের ওপর চোখ বোলাচ্ছেন। নববধূ প্রভাতকুমারী তেলের শিশি ও সাবান নিয়ে বাথরুমে যাবার মুখে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে তাকালেন স্বামীর দিকে।

প্রভাত। এখন শরীরটা ঠিক হয়েছে ত?

নটবর। শরীর ত বেঠিক হয়নি আমার মোটেই।

প্রভাত। তাহলে?

নটবর। তাহলে কাল সারা দিনরাত বিছানা ছেড়ে উঠলাম না কেন? ফুল-শয্যার ঝামেলাটা করব না বলে!

প্রভাত। ঝামেলা?

নটবর। তাছাড়া কি? একপাল মানুষ আসবে, এক একজনে পেটে চালান করবে পাঁচ থেকে সাত টাকার মাল, আর উপহার হিসাবে ছাড়বে পালিশ করিয়ে আনা তোবড়ান সিঁদুর কৌটো একটা, নয় ত বাক্স থেকে বের করা একখানা বস্তাপচা শাড়ি। দূর দূর, মানে হয় কিছু এই ছ্যাবলামির!

প্রভাত। বিয়ে ত জীবনে একবারই হয় মেয়েদের। পাঁচটা আত্মীয় বন্ধু না এলে কেমন লাগে বল ত।

নটবর। একবার কেন? ইচ্ছে করলে বিশবারও বিয়ে করতে পারে মেয়েরা এখন। আত্মীয় বন্ধু বলছ? যখন কলকাতার রাস্তায় চানাচুর আর বেঙ্গল চাটনি ফেরি করতাম, তখন ত কোন মিঞার টিকিটি দেখিনি। এখন আত্মীয়রা আসে মিষ্টি সাঁটাতে, বন্ধুরা আসে ধার করতে! ওরকম আত্মীয়দের মুখে ইয়ে করে দিতে হয়!

প্রভাত। তবু ফুলশয্যা বলে কথা! সেটা পণ্ড হল ত!

নটবর। কেন ফুলও ছিল, শয্যাও ছিল, পণ্ড হবে কেন? আর যদি বস্তা সও জয়ে জয়ে সজ্জা বানান কর, তাহলেও পণ্ড হয়নি। কেইসা ফুলের গয়না এনেছিলাম বল ত!

প্রভাত। কিন্তু কে দেখল তা?

নটবর। কেন, তুমি দেখলে আমাকে, আমি দেখলাম তোমাকে, সেই ত আসল দেখা গো।

প্রভাত। যাই বল, তুমি বাপু মহা কিপটে! টাকা খরচের ভয়েই ..

নটবর। বিলকুল না। বালিশটা তোল, তাহলেই বুঝবে।

প্রভাত। [বালিশ তুলে] একি? এত টাকা রয়েছে কেন?

নটবর। হাঁ-হাঁ, নগদ তিন হাজার। ওটা রেখেছি তোমার জন্যে। জড়োয়ার নেকলেশ বানাও একটা, দিব্যি গলায় পোক্ত হয়ে থাকবে। ভ্যাগাবণ্ড অ্যাণ্ড লোফার্স প্রাইভেট লিমিটেড খেয়ে সাবাড় করলে ওর এক কুচিও থাকত না···বুঝেছ!

প্রভাত। তা ঠিক। নিজে খাওয়ার একটা মানে হয়, অন্যকে খাওয়ানটা সত্যিই ভুল।

নটবর। ভুল বলে ভুল! স্রেফ অর্থনাশ ও মনস্তাপ। চোখ বুজে একটা নেমন্তন্নের দৃশ্য ভাব ত! আর কিছু দেখতে পাবে না, পাবে শুধু দু-পাটি করে দাঁত, কচমচ করে দুনিয়া চিবিয়ে খাচ্ছে। এই সর্বগ্রাসী হাঁ থেকে দূরে থাকব আমরা।

প্রভাত। হ্যাঁ, একটা কথা মা জিগ্যেস করতে বলে দিয়েছে। মাস্টারীটা রাখব ত, না ছেড়ে দোব?

নটবর। ছাড়বে কেন? একশ কুড়ি টাকা মাসের মাস ঘরে আসছে, মন্দ কি? ম্যাট্রিক পাশ করেছিলে, না গাড্ডু মেরেছিল, সত্যি বল ত!

প্রভাত। গাড্ডুই। তবে সেলাইয়ের ডিপ্লোমা আছে, গানেরও আদ্য পাশ করেছি। একেবারে ফেলনা নই।

নটবর। তার মানে তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশি বিদ্বান। আমি ত ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠতেই পারি না। একবার নয়, দু-দুবার।

প্রভাত। তবু তুমি বেশী জ্ঞানী। তুমি স্বামী, আর স্বামী হল পরম গুরু। আচ্ছা, আমি চানে চললাম। *প্রস্থান*

নটবর উঠে সাজসজ্জা বদলালেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তারপর দাড়ি কামান সুরু করলেন। গালে সাবান মাখিয়ে সবে ক্ষুরটি টানবেন, এমন সময় প্রভাত ফিরে এলেন ফেলে যাওয়া তোয়ালেখানা নিয়ে যেতে:

নটবর। কি? ঘুরে এলে যে! গামছাটা বুঝি···

প্রভাত। অ্যাঁ? তুমি এমন টেকো বুড়ো? তোমার মাথায় একগাছি চুলও নেই! পরচুলো পরে বিয়ে করতে গিয়েছিলে! ছি ছি স্ত্রীর সঙ্গে জোচ্চুরি!

নটবর। আর তুমি নিজে তো বুড়ি, বাঁধান দাঁত দু-পাটি মুখে লাগিয়ে খুকি সেজেছিলে! তুমি খুব সাধুপুরুষ, না?

প্রভাত। ইস, দাঁত মেজে দাঁত দুটো পরতে মনে ছিল না। তাড়াতাড়ি তোয়ালে নিতে এসেছিলাম। তাতেই ধরে ফেললে!

নটবর। আমারও খেয়াল ছিল না, তাই চুলটা খুলেই দাড়ি কামান আরম্ভ

করেছিলাম। কে জানত, তুমি এক্ষুনি ফিরবে! যাক গে, তবে একটা ভাল হল। দুজনেরই আসল চেহারা যা, তা জানা হয়ে গেল দুজনের। এখনই আমরা দুজন দুজনকে সত্যি সত্যি ভালবাসব। তাই না? আচ্ছা বল ত তোমার আসল বয়স কত?

প্রভাত। পুরো উনত্রিশ। মা কালীর দিব্যি। ওপর নীচের চোদ্দটা দাঁত ভেঙেছে বাথরুমে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে। তা তোমার বয়স কত শুনি!

নটবর। উনচল্লিশ বছর দুমাস। মাইরি বলছি তোমার ঐ কৈবল্যদায়িনী বিদ্যালয়ের দিব্যি। ব্যাপার কি জান? একটা কাঁচের জারে মার আমলের পুরানো কি একটা ঘিয়ের মত জিনিস ছিল। গায়ে লেবেল ছিল তার তিল তৈল। তাই দেখে গালিয়ে নিয়ে মাথায় দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গেল চুলের বারটা বেজে। আসলে ওটা ছিল কুমীরের চর্বি, বাতের ওষুধ!

প্রভাত। তাই বল। কেষ্ট যাত্রার সুদামার মত চমৎকার চুল দেখে ভেবেছিলাম, কি জেতাই জিতেছি আমি! এখন দেখছি বাবরি ত নয়-ই, চুলের বংশও নেই মাথায়।

নটবর। আর আমি? দাঁত দেখে খুশী-ই হয়ে উঠেছিলাম মনে মনে। এখন বুঝছি দু-পাটির অর্ধেকই বাঁধান! তা হোক, তবু মুখটা খাসা তোমার।

প্রভাত। আর তোমার মাথাটাও কিন্তু দিব্যি অ্যারিস্টোক্র্যাটের মত।

নটবর। কৈ, কোনদিন ত তা মনে হয় নি কারো। কেউ বলেও নি ত।

প্রভাত। বলবে কি? লোকে হিংসে করেই বলেনি। আসলে কি জান? ভালটা কেউ দেখে না, দেখলেও বলেও না। মন্দটা বলার সময় সবারই গলায় আসে শাখের আওয়াজ।

নটবর। যা বলেছ। সত্যি, তোমার বুদ্ধির তুলনা হয় না।

প্রভাত। নাগো। আমার চেয়ে তোমার বুদ্ধি অনেক বেশি। তা না হলে আর এত কম বয়সে এত ধন-দৌলৎ করতে পেরেছে?

নটবর। কম বয়সে? তা মন্দ কি? এই ফাঁকে যদি দুচারটে বছর চিত্রগুপ্তের হিসেবের খাতা থেকে চুরি করে নেওয়া যায়, ত তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

প্রভাত। নেওয়া যায়? তাহলে ত দুপক্ষেরই লাভ!

নটবর। আমাদের এই সম্পর্ককে কি নাম দেওয়া যায় বল ত!

প্রভাত। তুমিই বল।

নটবর। মণিকাঞ্চন যোগ, তাই না?

যবনিকা

ছোটগল্প

জরা

স্নান ও চা-পান সেরে সাড়ে আটটা নাগাদ নীলাদ্রি মুখুজ্যে বাইরের ঘরে এলেন সকালের কাগজখানি হাতে নিয়ে।

বড় ছেলে হরিশ একটা বাচ্চা চাকর সঙ্গে নিয়ে বাজার যাচ্ছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, বাবা জানো, আজ বিকেলে টুনির বিয়ের পাকা দেখা।

দু-সেকেণ্ড চুপ করে থেকে একটা ঢোঁক গিলে বললেন, ভালোয় ভালোয় বিয়েটা মিটে গেলে বাঁচা যায়। যা ভাবনায় পড়া গিয়েছিল মেয়েটাকে নিয়ে।

নীলাদ্রি ইজি-চেয়ারখানা টেনে নিয়ে তাতে বসলেন। বসতে বসতেই শ্লেষ্মা-জড়ানো গলায় বললেন, বেশ।

আওয়াজটা তাঁর হয়ত স্পষ্ট শোনাই গেল না। কিন্তু হরিশ সেদিকে বিশেষ খেয়াল করলেন বলে মনে হল না।

যতটুকু বলেছেন, তার বেশি কিছু বলার বা করার আছে, তা তাঁর হাবভাব দেখে বুঝলেনই না নীলাদ্রি। তিনিও তাই সংক্ষিপ্ত একটি বেশ বলেই সব কথার ওপর পর্দা টেনে দিলেন।

ছেলেটি কেমন, কতটা লেখা-পড়া করেছে, বাবা-মা আছেন কিনা, ফ্যামিলি কেমন, দেনা-পাওনার কি কথা হয়েছে বাড়ির কর্তা হিসাবে এগুলো জানার অধিকার নিশ্চয় তাঁর আছে।

কিন্তু হরিশের হিসাবী উক্তির পর মোটেই আর সে-ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করলেন না তিনি।

হঠাৎ হুঁস হল তাঁর, ঐ নূতন বাচ্চা চাকরটা…ওটাই বা কবে এল? কে বহাল করল ওকে, তাঁকে না জানিয়ে?

একটা বিমর্ষ বিরক্ত মন নিয়ে বসে রইলেন বৃদ্ধ নীলাদ্রি মুখুজ্যে।

অভ্যাসমতো গড়গড়ার নলটা ঠোঁটে ঠেকানো রয়েছে মাত্র, টানার আগ্রহ নেই। খবরের কাগজের একটা কোণা উড়ছে পত্ পত্ করে, পড়ছেন না একলাইনও তিনি। বাঁ হাতে ধরেই আছেন শুধু।

ঘড়িতে টং টং করে ন-টা বাজল।

নীলাদ্রি হাঁকলেন, উদয়, খাবার দে।

দুপুরে ঘুমানোর অভ্যাস নেই, শুয়ে একটু গা গড়িয়ে নিচ্ছিলেন নীলাদ্রি, যেমন রোজই নেন।

প্রাচীন আর্যদের বাসভূমি সম্বন্ধে নূতন একখানা বই পড়তে পড়তে রেখে দিয়েছেন। ভাবছিলেন আবার ওটার পাতা খুলবেন।

হঠাৎ বারান্দায় উত্তেজিত একটা কথা-বার্তার শব্দ কানে এল। মেজো ছেলে ক্ষিতীশ টেলিফোনে কার সঙ্গে চেঁচামেচি করছেন। কে ওদিককার লোকটা?

ক্ষিতীশ বলছেন, এক-আধ পয়সা নয়, বত্রিশ হাজার টাকা। শেষপর্যন্ত লড়ে যাব আমি। মনে রেখ জানের পরোয়া করি না আমি।

বলছেন, আরে রেখে দাও। অমন ঢের মিঞাকে আমার দেখা আছে। পয়সা সম্বন্ধে সবাই সমান সাধু! এতগুলো টাকা আমার জলে দিলে রাসকেলটা···ওকে আমার গুলি করতে ইচ্ছে করছে।

বিছানায় উঠে বসলেন নীলাদ্রি।

অস্থির হয়ে বাইরে এলেন। দেখলেন টেলিফোন রেখে ক্ষিতীশ নীচে যাচ্ছেন। ডেকে বললেন তিনি, কি রে কি ব্যাপার? হয়েছে কি? বড়রকম লোকসান-টান কিছু হয়েছে নাকি ব্যবসায়? বল আমাকে শুনি।

ক্ষিতীশ থেমে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মুখে।

বললেন, ও কিছু নয়। তুমি উতলা হয়ো না বাবা। ব্যবসা-বাণিজ্যে অমন হয়েই থাকে।

নেমে গেলেন ক্ষিতীশ। প্রাচীন আর্যদের বাসভূমি সম্বন্ধীয় বইটি নিয়ে নেমে এলেন নীলাদ্রি মুখুজ্যেও।

আবার সেই ইজি-চেয়ারটায় এসে বসলেন।

বুঝলেন, লোকসান যত বড়ই হক, তাঁকে সেটা বলার দরকার নেই ক্ষিতীশের, যদিও বাবা এবং পরিবারের প্রধান হিসাবে সেটা জানতে চাওয়া অন্যায় নয় তাঁর একরত্তিও।

ঘড়িতে তিনটে বাজল।

নীলাদ্রি হেঁকে বললেন, উদয়, চা দে।

অন্যমনস্কভাবে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন একটা দুটো করে আর চায়ে চুমুক দিচ্ছেন নীলাদ্রি।

ভাবছেন, হরিশ আর ক্ষিতীশের ব্যবহারের আকারটা আলাদা, কিন্তু প্রকারটা একই। কোন প্রয়োজনের মধ্যেই আর তারা বাবাকে ডাকতে চায় না।

একখানা ট্যাকসি এসে দরজায় থামল। তা থেকে নামলেন নীলাদ্রির একমাত্র মেয়ে হেমনলিনী, আর নামল তাঁর মেজ মেয়ে অবজা।

বিয়ের মাত্র সাত মাসের মধ্যে বিধবা হয়েছে অব্জা। জামাই জুরিখের কাছে কোন-একটা জায়গায় বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

দু-জনকে দেখে বিহ্বল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন নীলাদ্রি। চাপা একটা কান্না ঠেলে আসার মতো হল তাঁর যেন।

অব্জা কিন্তু শুকনো একটা প্রণাম করেই তাঁকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। হেমনলিনী কাছে দাঁড়ালেন একটু।

বললেন, শরীরটা এখন কেমন বুঝছ বাবা?

নীলাদ্রি বললেন, আমার কথা থাক মা। ঐ বাচ্চাটার ভবিষ্যৎ কি ভাবছিস তাই বল।

হেমনলিনী বললেন, তুমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না বাবা। ঢের ভেবেছ আমাদের জন্য। এখন তাঁকে ভাব।

ভেতরে চলে গেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে করুণ কান্নার একটা কলরোল উঠল। কাঁদছেন হেমনলিনী, বড় বৌমা, মেজো বৌমা, কাঁদছেন অব্জা।

নীলাদ্রি বুঝলেন কান্নাটা তৈরিই ছিল। শুধু মুলতুবি রাখা হয়েছিল, তাঁকে ওর সঙ্গে না জড়ানোর উদ্দেশ্যে।

কিন্তু কেন? কেন সবাই সব কিছু থেকে তফাতে রাখতে চায় তাঁকে? মেয়ের বিয়ের কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসানের কথা, পারিবারিক শোক-দুঃখের কথা—সব গোপন করতে চায় কেন তাঁর কাছে?

তিনি বুড়ো বলে, একটুতেই বেশি কাতর হবেন বলে মমতা করে এটা করে, না তিনি সবকিছুরই অযোগ্য হয়েছেন বলে উপেক্ষাবশে করে এটা?

মনে পড়ল একদিন তিনি ছিলেন দুঁদে হাকিম নীলাদ্রি মুখুজ্যে। বাইরে সবাই যেমন তটস্থ থাকত তাঁর দাপটে, বাড়িতে তেমনি তাঁর অগোচরে ছুঁচটি পর্যন্ত নড়ত না।

আর আজ? আজ তিনি বুড়ো, বিপত্নীক, বেকার···নেহাৎ একটা মুখুজ্যে মশাই। নিজের বাড়িতেই প্রায় একঘরে অবস্থা তাঁর।

একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। চমক ভাঙল বাচ্চা চাকরটার ডাকে।

সে বলল, কত্তাবাবা, বড়মা বললেন আপনাকে ওপরের ঘরে গিয়ে আরাম করতে। এ ঘর সাজাতে হবে পাকা দেখার জন্যে।

খোঁচা-খাওয়া বাঘের মতো উঠে দাঁড়ালেন নীলাদ্রি মুখুজ্যে।

চিৎকার করে বললেন, চোপরও হারামজাদা, আমি কোথায় বসব না বসব সে আমি কারো উপদেশে করব? এ বাড়ি কার?

বাচ্চা চাকরটা এক দৌড়ে পালাল। ছুটে এল খাস খানসামা উদয়।

নীলাদ্রি বললেন, আমি কি পাগল না মুস্কিল আসান যে আমাকে লোকের সামনে বের করতে ওঁদের লজ্জা হচ্ছে? আমি বাড়ির মনিব না চাকর?

উদয় বলল, রোগা শরীর আপনার। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে থাকতে পারবেন না, আরো খারাপ হবেক দেহ…তাইতেই বড়মা…

…হুকুম করলেন আমাকে ওপরের ঘরে বন্দী করতে! চালাকি আমি বুঝি না, না?

বুকটান করে এগিয়ে এলেন তিনি দরজার কাছে। লাগালেন পাঞ্জাবীর বোতামগুলো।

বললেন, আমার সর্বস্বের ওপর চেপে বসে আমার সঙ্গে শয়তানি? আচ্ছা, করছি এর ব্যবস্থা। যা নিয়ে আয় আমার চাদরখানা আর লাঠিগাছটা…

ভয়ে ভয়ে উদয় বলল, এখন ত সবে চারটে। এখন কুথাকে যাবেন কত্তা বাবা?

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন নীলাদ্রি, তক্ক করিস নে। যা বলছি তাই কর।

উদয় নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আপন মনেই নীলাদ্রি বললেন, উইল করব। সব উইল করে দেব অন্যদের।

লাঠিখানা এনে টেবিলের ওপর রাখল উদয়। চাদরখানা দিল ভাঁজ করে কাঁধের ওপর চাপিয়ে।

আর একবার টান হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন নীলাদ্রি। তারপরই দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন হু-হু করে।

বললেন, তুই শুদ্ধু আমাকে তাড়াতে চাইছিস বাড়ি থেকে। তুই শুদ্ধু…

বিভ্রান্ত উদয় ডাকল, ক-ত্তা-বা-বা!

ধরা গলায় বললেন নীলাদ্রি মুখুজ্যে, আমি কর্তা নই, আমি কেউ নই। আমি মরে গেছি, আমি মরে গেছি!!

সমুদ্র মন্থন

রাত্রি প্রায় দশটায় শবযাত্রীরা যখন হরিবোল দিয়ে বাড়ি ফিরল, রামগতিবাবুর একতলায় তখন কান্নার আওয়াজ থেমে গেছে।

টিউসানি থেকে ফিরে খেতে বসেছি।

আন্নু পিসিমা গরম দুধের বাটিতে হাওয়া দিতে দিতে বললেন, এত রূপ, এত গুণ, এমন সোনার সংসার···সব ভাসিয়ে কেন যে অমন করে গেল!

অন্যমনস্কের মতো বললাম, হয়েছিল কি?

আন্নু পিসিমা বললেন, হয়নি কিছু। আত্মঘাতী হয়েছে। বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখে ফিরেছে, রান্নাবাড়া করেছে, ছেলে-মেয়েদের খাইয়েছে, তারপর স্বামীকে খাবার দিয়ে বলেছে, তুমি খাও, আমি একটু গা-টা ধুয়ে আসি। তারপরই ··

আত্মহত্যা করেছে?

হ্যাঁরে। চানের ঘরেই গলায় দড়ি দিয়েছে। রামগতিবাবু আঁচাতে গিয়ে দেখে হতভম্ব। তখনি কেষ্টকে ডেকে ধরাধরি করে নামালেন। কিন্তু প্রাণটা চলে গেছে তার আগেই।

এই পর্যন্ত বলে আন্নু পিসিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হাই তুলে আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে বললেন, হরিবোল, হরিবোল।

একটা কিছু না বললে ভালো দেখায় না।

তা-না-না-না করে তাই বললাম, দুঃখের কথা বটে। কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল কি?

চোখেমুখে একরাশ অবাক-ভাব ফুটিয়ে পিসিমা বললেন, না না। রামগতিবাবু ত দেবতা, আর বৌটিও ছিল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

তাহলে এমন হল কেন?

কেন সেই ত কথা। রামগতিবাবুর বোন পদ্মা কি বলছে জানিস?

বলছে কোন জ্যোতিষী নাকি বলেছিল, এই মাসের তেইশে অপঘাতে রামগতি-বাবুর মৃত্যু হবে। তাইতেই স্বামীর আগে···।

তাই কখনো হয় পিসিমা? একটা শোনা কথার ওপর বিশ্বাস করে মানুষ মরতে পারে?

নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন আন্নু পিসিমা, তা আবার পারে না? সতীলক্ষ্মীর কাছে স্বামীর বাড়া কি আছে?

এঁটো বাসনটা উঠিয়ে নিয়ে পিসিমা চলে গেলেন।

দরজা বন্ধ করে জানালা দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্না-ধোয়া আকাশটার দিকে তাকালাম।

মনে পড়ল আগের দিন সন্ধ্যার সেই সাময়িক বুদ্ধি-বিভ্রমের কাহিনী। অনাদির পাল্লায় পড়ে সেই রাণী মহলায় যাওয়ার ঘটনা।

পীড়াপীড়িতে রাজী হলাম। কিন্তু দরজার কাছ পর্যন্ত আসতেই সাহস ফুরল।

বললাম, থাকগে। চল ফিরে যাই।

ঘাড়ে আস্তে করে একটা ঝাঁকানি দিয়ে অনাদি বলল, দূর বেকুব। বানে ভেসে আসা কলসী যে ধরে নিতে পারে তারই। তুই ত আর লুঠ করতে যাচ্ছিস না পরের ঘরে।

বলল বটে, আমার কিন্তু কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। অকারণেই গলা আর জিভটা শুকিয়ে আসতে লাগল।

নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম দুজনে। আগে আগে আমি, পিছনে অনাদি।

বারান্দার মুখে আসতেই পিঠে একটা ধাক্কা মেরে ঠেলে দিল আমাকে ভিতরের দিকে অনাদি। তারপর পিছন থেকে দরজাটা টেনে দিয়ে বলল, দুর্গ দখল করে ফেরা চাই কিন্তু।

বারান্দার শেষে ঘরটায় দোরের কাছে মিটমিটে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। সেই আলোয় দেখলাম চৌকাঠের বাইরে হাঁটু মুড়ে উঁচু হয়ে বসে রয়েছে মাঝবয়সী একটি স্ত্রীলোক। আমাকে দেখে নিঃশব্দে উঠে এল সে এবং কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, ঘরে ঢুকে আগেই পিদিমটা নিভাবেন কিন্তু, তারপর খিল আঁটবেন।

পিদিম নিভাব কেন?

বুঝেননি? ভদ্দনোকের ঘরের কথা। কোথায় কে চেনা-শোনা বেরিয়ে পড়বে।

সপাং করে চাবুকের মতো এসে পড়ল কথাটা মুখের ওপর। মনে হল এক্ষুনি ফিরে পালাই। কিন্তু পালাব কি করে? সিঁড়িতে রয়েছে অনাদি দোর আগলে। বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম আলোর দিকে পিছনে করে উল্টো পিঠের জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে।

সারা দেহে কেমন যেন কাঁপুনি ধরল। বুকের ভেতর একটা আনচানি বোধ হতে লাগল। দেওয়ালে হাত রেখে থেমে দাঁড়ালাম।

বাইরের স্ত্রীলোকটি নিঃশব্দে হাত নেড়ে ঘরে ঢুকে পড়তে ইসারা করল দু-তিনবার।

সেইসঙ্গেই ইঙ্গিত করতে লাগল যাতে আলোটা নেভানো হয়।

অভিভূতের মতো ঢুকে পড়েই সশব্দে খিল এঁটে দিলাম। আওয়াজে ফিরে তাকাল মেয়েটি।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আমার, আপনি-এ-খা-নে?

আলোটা নিভে গেল দপ করে। আর সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে হুড়মুড় করে নেমে পালানোর শব্দ পেলাম একটা।

সাড়ে দশটায় যখন বাড়ি ফিরলাম, একতলায় তখন কান্না-কাটি, হৈ-চৈ। ছায়া বৌদি আরতি দেখে আসার পরেই আত্মহত্যা করেছেন।

নিঃশব্দে দো-তলায় উঠে গেলাম।

পরের দিন বিকাল পর্যন্ত একতলায় কান্নাকাটি, হাঁটাহাঁটি, হৈ-চৈ চলল। চারটে নাগাদ পুলিস লাশ ছেড়ে দিল। পাড়ার ছেলেরা ফুল আর সিঁদুর আলতায় সাজিয়ে ছায়া বৌদিকে নিয়ে গেল শ্মশানে।

বেরুচ্ছিলাম। সিঁড়ির কাছে চোখাচোখি হতেই রামগতিদা জড়িয়ে ধরে হে-হে করে কেঁদে উঠলেন বাচ্চা ছেলের মতো।

বললেন, আমার সংসার ফাঁকা করে অন্নপূর্ণা চলে গেল। আমার সব আলো নিভে গেল ভাই। কেন যে এইভাবে চলে গেল, সারাজীবন সেই প্রশ্ন পুড়িয়ে মারবে আমাকে।

কোন দিন কি কোন আভাস পাননি?

পেয়েছিলাম। স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিগ্রী আমার একটা বিপদ হবে। কথায় কথায় বলেছিলেনও, তার আগেই চলে যাবেন তিনি পৃথিবী থেকে। দেখছি যা বলেছিলেন, তা-ই হল।

রাত্রে শবযাত্রীরা যখন ফিরল, তখন খেতে বসে এই কথাই শুনলাম। একটু রূপ বদল হয়েছে শুধু। রামগতিদার বোন পদ্মা বলেছে, জ্যোতিষীর কাছে ভাবী বিপদের কথাটা শুনেছিলেন ছায়া বৌদি। স্বপ্ন দেখেননি। দুইদিন পরে সকালবেলা চায়ে চুমুক দিচ্ছি, সেইসঙ্গে আলগোছে চোখ বুলাচ্ছি খবরের কাগজের ওপর, হঠাৎ ডাকে একখানা চিঠি এল। খামের চিঠি, ঝকঝকে সুন্দর অক্ষরে ঠিকানা লেখা। চিঠিখানা হল এই রকম:

অসিত ঠাকুরপো, আমার যে চেহারা আপনি দেখলেন, তারপর আর আমার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

আপনি কেন রাণী মহল্লায় গিয়েছিলেন তা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু আমি কেন গিয়েছিলাম, সে আপনি না বললে বুঝবেন না।

আপনার রামগতিদা একটি পয়সাও রোজগার করেন না। আমার এই পতন তাঁর ও তাঁর সংসারের জন্যে। ইতি—ছায়া বৌদি।

আশঙ্কা

সাতটা না বাজতেই রওনা হয়ে গেল পরিমল ছোট একটা সুটকেশ হাতে নিয়ে।

বাড়তি একপ্রস্থ জামা-কাপড়, একখানা গামছা ও কামানোর জিনিসপত্র—এ-ই শুধু নিল সে। টাকাও নিল মাত্র পাঁচটি।

ভুবনেশ্বরী বললেন, কোথায় যাচ্ছিস, কদিন থাকবি কিছুই ত বললি না।

অন্যমনস্কভাবে পরিমল বলল, এই একটু কাছাকাছিই যাচ্ছি। ফিরতে খুব বেশি হলে পাঁচ-সাতদিন হতে পারে।

বলতে বলতেই সদর দরজা পার হয়ে গেল সে।

ভুবনেশ্বরী দরজার কাছ পর্যন্ত এসেছিলেন, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানেই। দীর্ঘ বাইশ বছরের জীবনে পরিমল এই প্রথম বাড়ি থেকে কোথাও গেল, তাঁকে গন্তব্য সম্বন্ধে কিছু না বলে এবং প্রণাম না করে।

অজান্তেই দু-ফোঁটা জল চোখের কোণায় এসে হাজির হল তাঁর।

আস্তে আস্তে চোখ মুছে দাওয়ায় উঠে এলেন ভুবনেশ্বরী।

দরজার কড়া নড়ে উঠল খড়খড় করে।

ভুবনেশ্বরী স্নান করছিলেন। গায়ে মাথায় কাপড় জড়িয়ে এসে দোর খুলে দিলেন। পরিমলের বন্ধু দিলীপ।

সে বলল, মণ্টু নেই মাসীমা?

অবাক হয়ে ভুবনেশ্বরী বললেন, তুমি জানো না? সে ত সকাল বেলা উঠেই বেরিয়ে গেছে। বলে গেছে চার পাঁচ দিন পরে ফিরবে।

কাল সন্ধ্যাতেই ত দেখা হয়েছে। কিছুই বলেনি আমাকে।

তা ত জানিনে বাবা। বলেনি কিছু আমাকেও।

চিন্তিত মুখে দিলীপ বলল, বুঝেছি ক্যানিং থেকে লঞ্চে সুন্দরবন গেল।

সুন্দরবন?

হ্যাঁ, ঐ যে গোঁসাইদা বলি আমরা। বেণী গোস্বামী, তিনি খুব বড় শিকারী ত, বাঘ মারতে যাবেন সুন্দরবনে কথা ছিল।

ভুবনেশ্বরী বললেন, তুমি একটু বোস বাবা। দু-ঘটি জল ঢেলে আসি মাথায়। কথা আছে তোমার সঙ্গে।

আমি বরং বিকেলে আসব মাসিমা; এখন একটু তাড়া আছে।

তাই এসো বরং।

দিলীপ চলে গেল। ভুবনেশ্বরী আবার স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

গোসাইদার সঙ্গে সুন্দরবনে গেল—সে কথা দিলীপকে বলে গেল না কেন?

বেলা দশটা নাগাদ পরিমলের নামে চিঠি এল একখানা। পোস্টকার্ডের চিঠি। একডালিয়ার বি হরিঘোষ স্ট্রীট থেকে লিখছেন জনৈক কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়: বাবা পরিমল, তোমার ইচ্ছামতো কাজই হইবে। মিথ্যা ভুলের বশে নিজের এবং আর একজনের সর্বনাশ করিও না। পত্রপাঠমাত্র দেখা করিবে।

কে এই কিশোরী বাঁড়ুজ্যে? তোমাদের ইচ্ছামতো কাজ হবে, নিজের ও আর একজনের সর্বনাশ করো না—এ তিনি কি বলেছেন?

তাহলে কি ঐ কিশোরী বাবুর মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল পরিমল এবং তিনি রাজি না হওয়াতেই বাড়ি থেকে চলে গেল মনের দুঃখে একটা কিছু করতে?

মনে পড়ল শতাব্দী মাসিক পত্রিকায় একটা গল্প লিখেছিল পরিমল, তাতে বামুনের মেয়ে শকুন্তলার সঙ্গে সদ্গোপের ছেলে প্রমোদের ভালোবাসার কথা ছিল। শকুন্তলার বাবা জোর করে বিয়ে দেন মেয়ের অন্য জায়গায়। তারপরই ফুলশয্যার রাত্রে উঠে আসে শকুন্তলা বিছানা থেকে। লেকের জলে এরপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ভেসে ওঠে প্রমোদ ও শকুন্তলার মৃতদেহ।

ঐ গল্পের মধ্যে দিয়ে কৌশলে কি নিজের কথাই বলেছে পরিমল? সেও কি ছুটে গেল আজ একই পরিণামের পথে?

ক'দিন থেকেই সে ভালো করে খায়নি, কথা বলেনি। যে কোন কথাতেই ঝাঁজিয়ে উঠেছে। সব তাতেই বিরক্তি, সব তাতেই রাগ!

ভুবনেশ্বরী যেন দিশা পেলেন এতক্ষণে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, বিকেল গিয়ে সন্ধ্যে হয় হয়।

কৈ দিলীপ ত এল না! বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে নিয়ে কি জ্বালা, তা ত সে জানে না। কিংবা আসল ব্যাপার সবই সে বুঝেছে, তাই আর দেখা দিল না!

অস্থির হয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন ভুবনেশ্বরী।

চাটুজ্যেদের বাচ্চু বাড়ি ফিরছিল।

সে বলল, মণ্টুদা নেই মাসিমা?

না ত। সে বাইরে গেছে।

বাচ্চু চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, জানেন মাসিমা, টালিগঞ্জ ব্রিজে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে একটা লোক আজ দুপুরে আত্মহত্যা করেছে। সে কি কাণ্ড।

তাহলে আর দেখতে হবে না, এ নিশ্চয় পরিমল! বুকটা কেঁপে উঠল ভুবনেশ্বরীর। সমস্ত পৃথিবীটা দুলতে লাগল। চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল ছোট ছোট আলোর ঝলকি। তারপরই সব ডুবে গেল অন্ধকারে।

টলতে টলতে দোরে খিল এঁটে দিলেন ভুবনেশ্বরী, সঙ্গে সঙ্গে কড়া নড়ে উঠল।

পরিমল। হাতে সুটকেশ।

সে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আলো জ্বালাওনি এখনো?

ভুবনেশ্বরী তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন হু-হু করে।

পরিমল বলল, কি পাগল তুমি মা! অফিস থেকে বনভোজনে গিয়ে ছিলাম ডায়মণ্ডহারবারে। দুষ্টুমি করে বলেছিলাম চার-পাঁচ দিন পরে ফিরব।

সুধীন বললো, আমি এই ঝোপটার ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিই। তুই বরং ততক্ষণ শীলাকে জীব-জন্তুগুলো দেখিয়ে আন।

প্রস্তাবটা লোভনীয়। তরুণী বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে শীতের মধ্যাহ্নে চিড়িয়াখানায় এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোর এবং আবশ্যকমতো প্রাণিতত্ত্বে পাণ্ডিত্য ফলানোর সুযোগ বাংলাদেশে কোন অবিবাহিত যুবকের ভাগ্যে সহসা মেলে না। কিন্তু কেন জানি না, গোপেন প্রস্তাবটা ঠিক লুফে নিল না। সে একটু খুঁতখুঁত করেই বললো, তুইও চ না বাবু।

না, না, তোরা যা। তোরা হলি সাহিত্যিক-টাহিত্যিক মানুষ, দু জনে মিলবে ভালো। আমি একেবারেই গদ্য, আমি একটু এখানে বসে বসে বরং···

শীলা কথা কেড়ে নিয়ে বললো, মার্ক্সের পুঁথিটা উল্টাও, কেমন? চলুন, চলুন, আমরা সরে পড়ি। দেখতে পাচ্ছেন না, আমাদের বিদেয় করবার জন্যে কি বিষম আগ্রহ!

গোপেন আর একবার চেষ্টা করলো! কিন্তু সুধীনের সেই একই কথা, যা, যা, মানুষ হলি না কোন কালে! একটা মেয়েছেলের রিস্ক্ নিতেও সাহস করিস না?

রিস্ক্? শীলা জিজ্ঞাসা করলো কৃত্রিম কোপের ভঙ্গিতে।

মৃদু হেসে সুধীন বললো, তা নয়?

বিরক্ত মুখে শীলা উত্তর দিল, ব্যাটা-ছেলে নিয়েও ত কম রিস্ক্ নয়, বিশেষ করে মার্ক্সপন্থী ব্যাটা-ছেলে নিয়ে!

সুধীনের আবার সেই হাসি।

খানিকটা বেড়িয়ে শীলা বললো, আসুন, এইখানটায় বসি একটু। ঘাসেঢাকা ঢালু জমিটা গড়িয়ে সিধে ঝিলে নেমেছে, কতরকমের পাখী কিচির-মিচির করছে চারদিকে। কেমন একটা নির্জন অথচ প্রাণবন্ত আবহাওয়া···কলকাতায় এসে পর্যন্ত এ-দৃশ্য দেখিনি!

গোপেন বললে, বসবেন? কিন্তু বাইসন আর মেরু ভালুকের ঘরটা ঘুরে এলে হত না? দেখবার মতো জিনিস··

বিদ্রূপের হাসি হেসে শীলা বললো, মার্ক্সপন্থী নই বলে কি আমার রুচি খুকি ভাবছেন? বাইসন আর সাদা ভালুক, জিরাফ আর হিপোপটেমাস, গণ্ডার আর বেবুন·· এই নিয়ে আমোদ করার বয়স আছে আমার?

—তা নয়, তা বলছি না আমি। জন্তু-জগৎ একটা মস্ত অনুসন্ধানের জিনিস ত, যেটা ··

—সেটা দেখবে ফার্স্ট ইয়ারে পড়া নেকু খুকিরা। আমার বয়সে জীবনটা এতই খেলনা নয় যে এই সব খেলনা দিয়ে তাকে ভোলানো যাবে।

—কিন্তু চিড়িয়াখানায় আসার জন্যে ঝোঁক ত আপনারই।

—সে জীব-জন্তু দেখার জন্যে নয়।

—তবে ?

—বলছি। বসুন আগে এইখানটায়।

—সুধীনের ওখানে গিয়ে বসলেই ভালো হত না ? সেখানেও ত দিব্যি ঝোপ আছে।

হঠাৎ শীলা যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে বললো, শ্রেণী-সংঘাত ও সংরক্ষিত স্বার্থ সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনার প্রবৃত্তি আমার নেই। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবো বলেই এখানে আসা এবং আপনাকে সঙ্গে নেয়াও সেইজন্যেই।

নিজের অজ্ঞাতেই গোপেন চমকে উঠল। সুধীনের কম্যুনিজম-এর বাতিক কি তাহলে শীলার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে ? হয়ত সুধীন তার প্রতি ঔদাসীন্য করছে। হয়ত তার ন্যায়সঙ্গত স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

সে সহৃদয়তার সুরে বললো, সুধীনের একটু পাগলামি আছে ঠিকই, কিন্তু ওর অন্তরটা সত্যিই ভালো।

—এতটা ভালো না হলেও চলে। খানিকটা মন্দ হলেই বা ক্ষতি কি ? আসলে মানুষটা জ্যান্ত হওয়া চাই, সে ত আর বইয়ের পাতা নয় যে খুলে পড়া আর ভাঁজ করে তুলে রাখাই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে !

—বুঝলাম না ঠিক।

—কি করে বুঝবেন ? ভালোবাসা বলে পৃথিবীতে একটা জিনিস আছে, বোঝেন কি ?

—কিছু কিছু বুঝি !

—সেই পদার্থটি মানুষ পেতেও চায়, দিতেও চায়। কিন্তু দুটোর একটাও সম্ভব নয় আপনার বন্ধুটিকে দিয়ে। উনি আগাগোড়া একটা আইডিয়া, মানুষের চেয়ে একটা কেতাবী মত। আর পাঁচটা জিনিসের মতো আমিও ওঁর চলতি আইডিয়ার একটি বাহন।

গোপেন চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর বললো, তাই ত ! আচ্ছা বলবো ওকে আমি।

—কি বলবেন ? ও-রে বৌকে একটু ভালোবাসিস, এই না ?

—ঠিক ও-রকম করে হয়ত বলবো না, তবে জিনিসটা ঐ বটে।

—আপনি নিতান্তই নাবালক !

—কেন ?

—কেন ? এই সুন্দর দুপুর, এমন একটি নির্জন নিরালা অবকাশ, এর কোন আবেদনই নেই আপনার কাছে ! নারী এখনো আপনার কাছে স্বপ্ন…তার সঙ্গে মানুষ হয়ে মেশবার সহজ ভাবই আপনার জন্মায়নি !

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল শীলা, কিন্তু হঠাৎ চুপ করে গেল।

গোপেন বললো, চলুন, এবার ওঠা যা'ক। আমার আবার একটা জরুরী কাজ আছে।

ওরা ফিরে এসে দেখলো, সুধীন একখানা বই খুলে তার মধ্যেই ডুবে আছে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গোপেন দেখলো, শীলা একটা স্টোভ ধরিয়ে কি রাঁধছে। সে গলা খাঁকারি দিয়ে জানালো তার উপস্থিতি।

শীলা মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে বললো, আসুন। উনি একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন।

— যাবার ত কথা ছিল না কোথাও !

— কে-এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনিই ডেকে নিয়ে গেলেন।

—ও, তা আপনি ত আছেন।

—আপনি ওঁর বন্ধু, আমি থাকলে আর লাভ কি ?

—কেন, আপনিও কি আমার বন্ধু নন ?

শীলা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, না। আমি মেয়ে, আপনি পুরুষ…আমাদের দেশে এ ধরনের বন্ধুত্ব হয় না।

গোপেনের মুখের ওপর যেন সপাং করে একটা চাবুকের ঘা এসে পড়লো। সে বললো, কিন্তু আমার ধারণা ছিল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন এবং…

—এবং কি ?

—এবং কাল দুপুরে চিড়িয়াখানায় আপনার যে চেহারা দেখেছিলাম, সেটা আমার সম্পূর্ণ আলাদা মনে হয়েছিল।

—আলাদা চেহারা নিশ্চয়ই। কিন্তু কাল ত আর আজ নয়। সে দুপুর চলে গেছে, সে চেহারাও বদলে গেছে তারি সঙ্গে। আজ আমি আর-পাঁচজন বাঙালি

পরিবারের বৌদেরই একজন ··

—কিন্তু কাল কি আপনি আমায় কিছু বলতে চাননি? আমার মনে হয়েছিল, এমন কিছু বলতে চেয়েছিলেন, যা ঠিক এই আদর্শের বিচারে সৎ বা সমীচীন নয়!

—নিশ্চয় চেয়েছিলাম। কিন্তু বলেছি ত, সে কালকের কথা, আজকের সঙ্গে তার কোনই সম্বন্ধ নেই। সেই প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ভেতর, মনের সেই বিশেষ অবস্থার ভেতর যা সত্যি ছিল, আজ তা মিথ্যা, মহামিথ্যা।

—কিন্তু কাল যদি সেটা আমার দিক থেকে সমর্থন পেত?

—তাহলে যা হত, তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম আমি। এমনকি, তারপর যদি তলহীন অন্ধকারে ডুবে যেতে হত, তাতেও আমি পেছ-পা ছিলাম না।

গোপেন একটু চুপ করে রইলো। তারপর নেহাৎ আহাম্মকের মতো বললো, আচ্ছা, আজ যদি সেই অবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করি? আমি বেশ ভেবে দেখেই···

শীলা উঠে দাঁড়ালো। উড়ন্ত আঁচলটা বেশ করে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বললো, আপনি বুঝি ভেবেছেন, আমি ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, কিছুই মানি না। আমি নিতান্তই একটা যাচ্ছেতাই?

তা ভাবিনি। ভেবেছি, আপনার জীবনে কোথাও একটা ব্যর্থতা আছে যা পূরণ করার সুযোগ যদি ··

—বেরিয়ে যান আপনি, এখনি আমার বাড়ি থেকে। আর কোনদিন যেন আপনাকে না দেখি আমি এখানে। বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আপনি বন্ধুর সর্বনাশ করতে চান? আপনাকে আমি পরীক্ষা করে দেখলাম! দেখলাম আপনি অতি অসৎ, অতি বাজে, অতি অন্তঃসারশূন্য! এমন মানুষকে আমি ভদ্রলোক বলে মনে করি না।

গোপেন আর একবার কি বলবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু শীলা তার আগেই ঘুরে দাঁড়ালো এবং বললো, আপনার সঙ্গে ভুয়ো তর্ক করার সময় নেই আমার। একটু পরেই উনি ফিরবেন, জলখাবার তৈরি করে রাখতে হবে।

যবনিকা

চা-টি খেয়ে সবে কাগজ কলম নিয়ে বসেছি।

হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হল মুখুজ্যেপাড়ার ফটিক। মানে গোবিন্দর বড় ছেলে।

বলল, মামা, মাস্টারমশায় এক্ষুনি একবার ডেকে পাঠিয়েছেন। বিশেষ কাজ আছে।

মাস্টারমশায় হলেন পীতাম্বর নন্দী। বড় জ্যাঠামশায় ও বাবা তাঁর কাছে পড়েছেন। পড়েছি আমরা ক-ভাই। এখন পড়ছে আমাদের ভাইপো-ভাগ্নেরা।

শুধু আমাদের না, গোটা গ্রামেরই তিনপুরুষের মাস্টার তিনি।

তাই আসল নাম তাঁর আজ আর মনে নেই কারো। এখন তিনি মাস্টারমশায় নামেই সকলের পরিচিত।

ধীর স্থির মানুষ। মাথাটি প্রায় ন্যাড়া। গলার নীচে মস্ত একটা আব। একটা চোখ ট্যারা, আধ বোঁজা গোছের। পেটটি গোল তিজেল হাঁড়ির মতো। এরই সঙ্গে সরু সরু হাত পা।

হঠাৎ দেখলে কেমন হাসি পায়!

বোধহয় এই চেহারার কারণেই বিয়ে করেননি তিনি।

মুখুজ্যেপাড়ার একখানা কুঁড়েঘরে থাকেন। নিজেই রেঁধে খান।

এতদিন স্কুলে কাজ ছিল, মাসখানেক হল অবসর পেয়েছেন। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ অবিচার করেননি। শেষদিন পর্যন্ত মাসে পঁচিশ টাকা করে বৃত্তি মঞ্জুর করেছেন তাঁর জন্যে।

মাস্টারমশায় যদিও আমাদের গোটা ফ্যামিলির গুরু এবং দেখা হলে সবাই আমরা হাতজোড় করে দাঁড়াই তাঁর কাছে, তবু কোন ফরমাস করেন না তিনি কোনদিন কাউকে। মস্ত স্বাবলম্বী মানুষ। সব কাজ নিজে করেন, বয়স প্রায় আশী হয়ে গেলেও।

হঠাৎ কেন ডেকেছেন তিনি জানি না।

চটি জোড়াটা পায়ে গলিয়েই দৌড়লাম।

মাস্টারমশায় চটের একটা নবাবজান ব্যাগে তাঁর সামান্য জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলেন।

আমি ঢুকে একপাশে মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম।

তিনি বলে উঠলেন, এসেছিস? দেখ বাবা তোরা ত চিরদিন আমাকে সাধু মহাত্মা

বলে জানিস। আসলে আমি কিন্তু সাধু নই মোটেই। যাইহোক এতদিনে সুমতি হয়েছে, ভাবছি একটু সাধু হতে চেষ্টা করব শেষ কটা দিন।

এ কথার আর কি জবাব দেব? হাত কচলাতে কচলাতে গাঁইগুঁই করতে লাগলাম আমি, সেই কোণে দাঁড়িয়েই।

মাস্টারমশাইও যথারীতি বাঁধা-ছাঁদা করতে লাগলেন।

হঠাৎ বললেন তিনি, আমি কাশী চলে যাচ্ছি রে, চিরদিনের জন্যে। চিরদিন মানে আর কদিন? এই এক বছর দু-বছর!

এ কথার জবাবে বললাম, আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কেন? আমরাই আপনার সেবা করব!

হি হি করে হেসে উঠলেন মাস্টারমশায়।

বললেন, পৃথিবী ছেড়েই যাবার দিন হল যে! আগে থেকে একটু অভ্যাস করে না রাখলে চলবে কেন? শেষটা যদি ভয় পাই!

এই পর্যন্ত বলেই বললেন, দেখ, তোরা যা ভাবিস্ তা নয়। আমার হাজার দশেক টাকা আছে। আছে এই ঘরখানা আর একটি...

একটি কি?

ছেলে।

চমকে উঠলাম শুনে।

বললাম, আপনি ত চিরদিন পঞ্চাশ টাকা মাইনের মাস্টারি করেছেন। দশ হাজার টাকা পেলেন কোথায়? আর আপনি ত চিরদিনই অবিবাহিত। ছেলে!

মাস্টারমশায় বললেন, তাইতো বলছিলাম, তোরা চিরদিন ভুল জানতিস!

একটু দম নিয়ে তিনি বললেন, আমি শ-তিনেক টাকা পেয়েছিলাম পৈতৃক সম্পত্তির বখরা হিসাবে। সুদে খাটিয়ে তাকেই চল্লিশ বছরে করেছি দশ হাজার। আর আমার বিধবা ভাগ্নী মণিকে দেখেছিস ত... মণিকে আর তার ছেলে ভোম্বলকে? ঐ ভোম্বল আমারি ছেলে। মণির স্বামী হেরম্ব রেল লাইনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, কেন?

কেন বুঝলি না? এই মহাপুরুষের কীর্তি-কলাপ টের পেয়েছিল বলে।

আবার একটা ঢোঁক গিলে বললেন, আর মণিটা মলো, সে-ও কিসে জানিস?

কিসে?

সন্তান সম্ভাবনা হয়েছিল দ্বিতীয়বার, বিধবা হওয়ার পরে। তারি দরুণ...

অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললাম, তিন পুরুষ ধরে আমরা শিক্ষা পেয়েছি আপনার কাছে। আপনাকে সবাই আমরা জেনেছি পুণ্যাত্মা সজ্জন বলে। এ সব আজ বলছেন কি আপনি? আপনি সুদখোর, চরিত্রহীন…

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, যা বলছি ঠিকই বলছি রে। সত্যি কথাটা জীবনে কোন একদিন ত বলতেই হবে কাউকে।

আপন মনেই একটু হাসলেন তিনি। তারপর বললেন, দেখ্, অন্যায় করে ধামাচাপা দিয়ে চলে যাওয়া হয়ত যায়। কিন্তু দরকার কি? মানুষের মধ্যে দেবতাও আছে, পশুও আছে। দুটোকেই মেনে ধরতে হয় সরলভাবে। তারি নাম ত সত্য। আর সত্যই হল শিক্ষার সার।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মনে হল যেন নিঃশব্দে চোখের জল মুছলেন তিনি।

বললেন, জানিনা কি শিক্ষা দিয়েছি বা দিতে পেরেছি তোদের। তবে আজ যে শিক্ষাটুকু দিলাম এর কথা স্মরণ রাখিস বাবা। সত্যকে আশ্রয় করে সব জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়াস।

এরপর আবার তাঁর সেই পরিচিত হাসি হেসে বললেন, ভোম্বলকে আমি লেখা-পড়া শিখিয়ে ভালো চাকরি করে দিয়েছি কলকাতায়। তার জন্যে আর কোন দায় নেই আমার। শুধু একটা দায় আছে, আর সেই জন্যেই তোকে ডেকেছি।

বলুন!

এই বাড়িটা আর ঐ দশটা হাজার টাকা আমি দিয়ে যাচ্ছি তোকে। এখানে একটা দাতব্য ছাত্রাবাস বসাস বাবা, গরিব ছেলেদের জন্যে। আমি কাশীতে ভিক্ষা মেগে খাব। কিছু নিয়ে যাব না।

অবাক হয়ে গেলাম তাঁর আদেশ শুনে।

মাস্টারমশায় বললেন, বেশ করে ভেবে দেখলাম, এক তোকেই দিতে পারি এ ভার।

আমাকে…কেন?

কেন জানিস? ষাট বছরের মাস্টারিতে একমাত্র ছাত্র পেয়েছিলাম আমি যে মনুষ্যত্বকে বিত্তের চেয়ে বড় বুঝতে শিখেছে… সে তুই!

আর কিছু বললাম না। নিঃশব্দে পায়ের ধুলো নিলাম তাঁর। চোখে জল এসে গেছে আমারও।

মাস্টারমশায় হঠাৎ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন শক্ত করে।

দু চোখ দিয়ে তাঁর ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

চিঠি পড়ে তেলেবেগুনে জলে উঠলেন গৃহিণী।

বললেন, নাও তোমার বিদুষী বেয়ানের চিঠি।

কি লিখেছেন?

কি তা পড়েই দেখো। ওঃ ভারী ভয় দেখায় ছেলের আবার বিয়ে দেবে বলে। দিয়ে দেখ না, কেমন না হাতে দড়ি পড়ে!

চিঠিখানা গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সবেগে গিয়ে ঢুকলেন তিনি রান্নাঘরে।

একরাশ পরীক্ষার খাতা দেখছি। হাঁকডাকে উঠে এসেছিলাম লাল পেন্সিল হাতে। আবার ফিরে এলাম নিজের জায়গায় চিঠিখানি নিয়ে।

বেয়ান লিখেছেন, সরল বিশ্বাসে প্রায় কিছু না নিয়ে তাঁরা আমাদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তার উপযুক্ত ফল পেয়েছেন। ফাঁকি দিয়ে আমরা রুগ্নী রোগওয়ালা মেয়ে চালান করেছি।

আর লিখেছেন, এখনি নিয়ে এসে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যদি সারিয়ে না দিই, তাহলে ছেলের ফের বিয়ে দেওয়া ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর থাকবে না।

এবার বুঝলাম গৃহিণীর উষ্মার আসল কারণটা। বলা বাহুল্য, বুঝে প্রমাদ গুণলাম। অপমানের কথা মেয়ের বাপের ধর্তব্য নয়, কিন্তু খরচটা ত সাধ্যাতীত।

তবু কি আর করব? বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফেরার পথে নিয়ে এলাম মণিকে। বৌবাজার থেকে মাণিকতলা কতটুকু আর?

সত্যিই শরীর তার খুব খারাপ। যখন তখন মূর্ছা হয়, দু-দিন তিনদিন বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে। হাত-পা শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে, মুখ চোখ হয়েছে ফ্যাকাশে। ঠোঁটের ওপর একরাশ ঘা।

সবচেয়ে মারাত্মক লাগল ঐ ঘাগুলো। মুখের দিকে যেন তাকানো যায় না।

বললাম, মুখে অত ঘা হল কি করে মা?

মণি বলল, ফিট ছাড়াতে ব্লটিং-এর ধোঁয়া দেওয়ার সময় পুড়ে গেছে।

শুনে রাগে কান্না এসে গেল আমার।

ইস, অমন ফুটফুটে ফুলের মতো সুন্দর মেয়ে•• একবছরে এই হাল হয়েছে তার! কে জানে বাঁচবেই কি না।

বললাম, তুই এখানেই থাক মা। আর তোকে ঐ কসাইদের বাড়ি যেতে হবে না।

মণি কিছু বলল না, শুধু ম্লান মুখে একটু হাসল।

ডাক্তার তারিণীবাবু পাড়ার লোক। ছোট্টবেলা থেকে দেখছেন মণিকে। তাছাড়া তাঁর ছোট মেয়ে অনিলা'র সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছে মণি। তাই তাঁকেই খবর দিলাম।

ডাক্তার বললেন, আপনারা বাইরে যান একটু, মণিকে আমার কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে।

গৃহিণী বললেন, বলুন না, কথাগুলো আমিও একটু শুনি। আমি ত মা।

ডাক্তার হেসে বললেন, মানুষের জীবনে এমন অনেক কথা থাকে বৌদি, যা ডাক্তারকে উকিলকে বলা যায়, মা-বাপকে বলা যায় না।

আমি বললাম ঠিকই ত, ঠিকই ত। চলো আমরা ও ঘরে বসি গে।

আমার দিকে একবার, ডাক্তারের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বাইরে গেলেন গিন্নী। পিছু নিলাম আমি।

বেরিয়ে যাবার আগে ডাক্তার বললেন, এমন কিছু অসুখ নয়। ছেলেপুলে হওয়া দরকার, তাহলেই মূর্ছাটা বন্ধ হয়ে যাবে।

দাঁত কিড়মিড়ি করে কি একটা বলার ভঙ্গি করলেন গৃহিণী, যার ভাবখানা বোধ হয় অনেকটা এই যে মুখপোড়া ডাক্তার, ছেলেপুলে কি গাছের ফল তাই পেড়ে আনবে।

রাস্তায় পা দিয়ে মণিকে ডেকে ডাক্তার বললেন, দেখো মা, বুদ্ধিমান বাপ মা অধিক সন্তান পৃথিবীতে আনে না ঠিকই। তা আনলে নিজেদেরও কষ্ট, সন্তানেরও কষ্ট। কিন্তু একেবারে না আনলেও বিপদ!

একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, গোড়া থেকেই ওটা করতে গিয়ে এইসব হয়েছে। তা ছাড়া ভেবে দেখো মা, মানুষ যদি না আসতেই পায় পৃথিবীতে, তাহলে কে থাকবে এখানে?

কথাগুলো একটু ধোঁয়া ধোঁয়া, তাই কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না।

গৃহিণীর কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ডাক্তার বিদায় নেওয়া মাত্র তাই তিনি বোমার মতো ফেটে পড়লেন, হ্যাঁরে সব্বনাশী, প্রমথ বুঝি তোকে ছেলে না হওয়ার ওষুধ গেলাচ্ছে ধরে ধরে।

কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, মুয়ে আগুন অমন জামাইয়ের। মা-মাসী আবার শাসায় ফের বিয়ে দোব বলে!

নিরুপায় মণি করুণ দৃষ্টিতে তাকাল একবার আমার দিকে।

বুঝলাম।

বললাম, আহা কি বলছ যা-তা ? আসুক প্রমথ, আমি বুঝিয়ে বলব তাকে ··

তুমি বলবে ? কথা জোগাবে তোমার মুখে ? তাহলে আর আমার এ দুর্গতি হত না। কেমন করে বলতে হয় তা আমিই বুঝিয়ে দেব, আগে আসুক একবার এদিকে।

প্রমথ এলেন জন্মাষ্টমীর দিন সকালে। আমার বরাত ভালো যে গৃহিণী ডেঙ্গু-জ্বরে ধরাশায়ী হয়েছিলেন। তাই তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি আচ্ছা-করে বলাটা আর বলা হল না।

জামাই প্রণাম করার জন্যে তক্তপোষের কোণে মাথা ঠেকাতেই তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন।

আমি বললাম, জ্বরের ধমকে বেচারী খালি এ-পাশ ও-পাশ করছে। তা বাবা তুমি পাশের ঘরটায় বোস।

পাশের ঘরে একগাদা বই খাতা ছড়িয়ে তার মধ্যে বসে শ্রীমান পটল নিবিষ্ট মনে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে কাগজের ফুল বানাচ্ছে।

প্রমথ এসে বসে গেল তার পাশে।

বলল, দে, আমি একটা নতুন রকম ফুল করি।

রান্নাঘরের দিকে হাঁক দিয়ে বললাম, মামণি, একটু চা বসিয়ে দে ত। আমি আসছি এক্ষুনি।

দোকান থেকে ফিরে দেখি, না প্রমথ, না মণি। পটলা আপন মনে সেই কাগজই কেটে চলেছে।

বললাম, জামাইবাবু কোথায় পটল্?

পটল্ বলল, দিদি আর জামাইবাবু ত চলে গেছে। এই দেখ আমাকে একটা টাকা দিয়ে গেছে, ঘুড়ি আর লাটাই কেনার জন্যে।

সে কি রে ? আমি যে খাবার নিয়ে এলাম।

তা ত আমি জানি না বাবা।

বোকার মত ঠোঙাটা নিয়ে বড় ঘরে ঢুকলাম। গৃহিণী শিবনেত্র হয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়েছিলেন।

তিক্ত গলায় বললেন, হল রুইয়ের মুড়ো আর রাবড়ির ভাঁড় আনা ? কি গুণেরই জামাই !

বললাম, বৃথাই বকছ। ওরা নেই, দু-জনে চলে গেছে। যাবার সময় পটলাকে একটা টাকা দিয়ে গেছে।

অ্যাঁ ?

হ্যাঁ।

এই কালও আমার কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি নিন্দে করল যে সোয়ামীর, শাশুড়ির।

মেয়েদের স্বামীর নিন্দাকে কি বিশ্বাস করতে আছে ? এই যেমন তুমি আমায় নিন্দা করো !

গিন্নী গুম হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। বোধহয় সমস্যাটা ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হল ওঁর মগজে।

আমি বললাম, আহা, সুখে থাকে ত থাক না। ওটাই ত ওর সত্যিকার ঘর।

হঠাৎ ডুকরে উঠলেন গিন্নী, এমন হাড়জ্বালানে মেয়েও পেটে ধরেছিলাম গো।

আমার দিকে ফিরে বললেন, আমাকেও তুমি ওষুধ খাওয়াওনি কেন ? তাহলে এই শত্তুরের পাল জন্মাত না, এত খিটকেলও পোয়াতে হত না আমাকে।

বুঝলাম। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে, এখন আর উপায় কি ?

দোষ

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেরনোর জন্যে তৈরি হচ্ছি। হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি এল। অগত্যা হাত-পা গুটিয়ে বসতে হল বারান্দায় এসে।

এখন ভাবি যদি এই বৃষ্টিটুকু না হত! যদি দশটা মিনিট আগে বেরিয়ে পড়তে পারতাম! কিন্তু থাক সে-কথা।

বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা মাথায় দিয়ে ঠুক-ঠুক করে এসে উঠলেন উমাপদ।

হাতজোড় করে বললেন, একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে দাদা। পাছে বেরিয়ে যান, তাই দৌড়তে দৌড়তে এসেছি।

উদ্বাস্তু প্রতিবেশী। খাল-পারের কলোনীতে থাকেন। মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভেবেছিলাম, নিজে আর যাব না। যাহোক কিছু উপহার দিয়ে ছেলেকে পাঠাব। কিন্তু সরাসরি এসে হাজির হলেন ভদ্রলোক। কেমন করে আর না বলব?

বললাম, শরীরটা একটু নড়বড়ে হয়েছে। ভাবছিলাম ডাক্তারের ওখান থেকে প্রেসারটা একবার মাপিয়ে, তারপর যাব। আচ্ছা চলো। ফেরার বেলাই বরং ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে।

শহরতলীর পথ। পিট-পিট করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মাথায় দু-জনে চলেছি পাশাপাশি।

উমাপদ বললেন, ভাসতে ভাসতে এসে পড়েছিলাম দাদা। কোথাও যে কিনারা পাব, ভাবিইনি তা। ভগবানের দয়ায় ঠাঁই পেলাম আপনাদের কাছে। দোকানদারি করে চলেও যাচ্ছে কোনরকমে।

বললাম, যাবে বৈকি ভাই। উদ্যমী মানুষ যেমন করেই হোক দাঁড়িয়ে যায়। কপাল ধরে বসে থাকলে কিছুই হয় না কারো।

কিন্তু বড্ড দুশ্চিন্তা ছিল দাদা, উমাপদ বললেন, মেয়েটাকে নিয়ে। ডাগর হয়েছে। তার ওপর আপনাদের মা-বাপের আশীর্বাদে মেয়ে আমার সুন্দরী। তারো ব্যবস্থা করে দিলেন ভগবান।

এই পর্যন্ত বলে একটা ঢোঁক গিললেন উমাপদ। তারপর গলা খাটো করে বললেন, আপনার কাছে লুকিয়ে কি করব দাদা? ভাব করেই ওরা করছে বিয়েটা··· পয়সাকড়ি লাগছে না।

তা করুক, আমি বললাম, আজ-কাল ত আকছার এমন বিয়ে হচ্ছে। তা ছেলেটি ভালো ত? কাজকর্ম করে টরে ত?

আনন্দে ডগমগ হয়ে বললেন, উমাপদ, আপনার অনুগ্রহে তা করে দাদা। গ্রেট ইস্টার্ন ব্যাঙ্কে চাকরি করে, পৌনে তিনশো টাকা মাইনে। চেহারা ভালো, জাতেও বামুন ··

মা-বাপ আছেন?

না, ওটাই যা একটু মনের মতো হল না দাদা। কেউ নেই। তা এক হিসাবে ভালোই। দুটিতে থাকবে সুখে-দুখে। কেউ ··

হ্যাঁ, থাকে কোথায় ছেলেটি?

খালের ওপারে। ঠিক আমাদের বাসার উল্টো দিকে। মাঝখানে ছোট্ট খাল, আর তার ওপর কাঠের সাঁকো। যেতে আসতে লাগে মোট পাঁচটি মিনিট। ভগবানই জুটিয়ে দিয়েছেন।

বৃষ্টিটা ইতিমধ্যে ধরে গেল। ছাতা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালাম।

উমাপদ কিছু দূরে একটা বাঁকের মুখে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ হল গরিবের কুঁড়ে।

দেখলাম, সেখানে মাঝারি রকম একটা ভিড় জমেছে। নর-নারী ও কুচোকাচার আনাগোনা এবং হৈ-চৈ চলছে। বিয়েবাড়ি ত।

হঠাৎ মহিলারা একযোগে উলু দিয়ে উঠলেন। মানুষের ছুটোছুটিটাও যেন বেশ একটু বেড়ে গেল।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে উমাপদ বললেন, বোধহয় বর এসে গেল। গোধূলি লগ্নে বিয়ে কিনা!

আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই ত। তা, তুমি যাও উমাপদ, দৌড়ে চলে যাও। আমার জন্যে ভাবনা করো না। আমি আসছি।

ইচ্ছে ছিল আসার সময়েই ডাক্তারের কাছে হয়ে আসব। কিন্তু যাবার পথেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম তাঁর হাতে।

বনমালী ডাক্তার রাস্তার দিকের রোয়াকে বসে তামাক টানছিলেন। বৃষ্টি বলেই বেরোননি বোধহয়।

হাঁক দিয়ে বললেন, পশুপতিদা, যাচ্ছেন কোথায়?

আমতা আমতা করে বললাম, ঠিক যাওয়া নয়। মানে উমাপদ, গরিব ব্রাহ্মণ, দেশের মানুষ মেয়ের বিয়েতে বলেছে ··

আবার নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছেন ?

না, না, খাওয়া নয়। এই একটু গিয়ে দাঁড়ানো আর কি। ছেলে যাবে, উপহার-টুপহার য-হক কিছু সে-ই দিয়ে আসবে। আমি ঐ একটু ভদ্রতা···

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা সে পরে যাবেন। আগে প্রেসারটা দেখে নিই, সেদিন থেকে ভারী ভাবছি আমি।

হেসে বললাম, আর ভাবাভাবির কি আছে ভায়া ? চৌষট্টি বছর হল। এখন যে ক-টা দিন বাঁচি, তাইত এক্সট্রা !

বনমালী বললেন, আমরা ডাক্তাররা তা স্বীকার করি না। যতক্ষণ প্রাণ, আমাদের লড়াই ততক্ষণ। তার আগে ছাড়াছাড়ি নেই।

বিশালায়তন দেহে, বিশালতর আওয়াজ করে হেসে উঠলেন ডাক্তার।

বললাম, ভায়া, তোমার হাসি শুনলে দুর্বল মানুষরা কিন্তু ভড়কে যাবে।

এ হল নিষ্পাপ মানুষের হাসি দাদা, জবরদখল করিনি, ফাঁকি দিয়ে লোন নিইনি, মেহনত করে টাকা কামাচ্ছি ·

বুঝলাম, আশপাশের রেফ্যুজীদের সম্বন্ধেই এই বাঁকা টিপ্পনীটুকু কাটছেন ডাক্তার।

বললাম, তা অবশ্য বলতে পারো তুমি। তবে কি জানো ? ভিটে-ছাড়া ইজ্জত-হারা হলে মানুষ নিরুপায়ভাবেই অন্যায় করে।

ও আমি স্বীকার করতে পারলাম না দাদা। বাঘ মাংস না পেলে অনাহারে মরে, ঘাস খায় না। সৎ কালচারের মানুষ···

বললাম, আচ্ছা, ও-তর্ক আর একদিন করব ভায়া। একবার বিয়ে-বাড়িটা ঘুরে আসি।

ডাক্তারের হাত থেকে ছাড়া পেলাম যখন, তখন প্রায় ছ-টা।

আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। ছাতা খুলে জোর পায়ে চলছি।

দর্মা, টিন, আর খোলার ঘর সারি সারি চলে গেছে অর্ধচন্দ্রাকার খালের ধার ধরে। মাঝারি আকারের রাস্তা একটা তৈরি করে নিয়েছে উদ্বাস্তরাই। বাড়ি-ঘরগুলো উঠেছে এই রাস্তাকে বেষ্টন করে।

সবই গৃহস্থ বাড়ি। তারি মধ্যে আবার কোনটা তরুণ ব্যায়ামগার, কোনটা শহীদ লাইব্রেরি, কোনটা বাস্তহারা নাট্য সমিতি। কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘিরে একটা পার্কও করা হয়েছে। হয়েছে একটা স্কুলও। মহাপ্লাবনের মুখেও বাঁচবার এবং বাঁচাবার কি মহান চেষ্টা এই ক্ষুদ্র নিঃসম্বল মানুষদের !

দেখতে দেখতে চোখে জল এল। ভাবলাম, একদিনও আসিনি কেন এদের দেখতে? লজ্জা হল ভেবে!

হঠাৎ দেখি, হন্তদন্ত হয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসছে উমাপদর ভাগনে গৌর।

আমার সামনে পড়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

বলল, আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলাম।

কেন রে গৌর, জিজ্ঞাসা করলাম কৌতূহলী হয়ে।

গৌর বলল, লগ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আপনার আশীর্বাদ না নিয়ে মামা বর আনবে না ছাঁদনাতলায়। আমাকে তাই বলল, গৌরে, তুই দৌড়ে যা। একটু পায়ের ধুলো নিয়ে আয় দাদার।

লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে বললাম, দূর, সে কি? চল আমি জোর পায়ে যাচ্ছি।

তরুণ ব্যায়ামগারের পাশেই একটু ঘেরা জায়গায় তক্তপোষে বালিশ-বিছানা দিয়ে বরের জন্যে আসন করা হয়েছে। দু-টো পেতলের ফুলদানিতে দু-কোণে রাখা হয়েছে নানা রঙের একরাশ বুনো ফুল। মাঝখানে তাকিয়া ঠেস দিয়ে চন্দন-চর্চিত কপালে বসে আছে বর। কোলের কাছে তার ন-দশ বছরের বাচ্চা ছেলে একটি, সে হল নিতবর।

উগ্র হ্যাসাকের আলোর নীচে ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালাম বরের। পিছু পিছু এলেন উমাপদ।

উমাপদ ভক্তি-বিনম্র কণ্ঠে বললেন, এই আমার জামাই দাদা। আশীর্বাদ করুন, যেন জীবন ওদের সুখের হয়।

একটু দম নিয়ে জামাইকে বললেন, প্রণাম করো বাবা। প্রেমসারের বিখ্যাত রায়বাহাদুর গণপতি বাঁড়ুজ্যের বড় ছেলে পশুপতিবাবু। ওঁর দয়াতেই এই জায়গাটুকু পেয়ে...

জামাই হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিতে এগুতেই, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল আমার, ছিটে না? ঝারিকের ব্যাটা ছিটে তুই...

থতমত খেয়ে গেল প্রণমটা জামাই।

তারপর খাটো গলায় বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাথায় হাত রেখেছিলাম কিনা মনে নেই। আস্তে আস্তে মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এলাম।

পিছু পিছু এলেন উমাপদ। আলাভোলা মানুষ তিনি, কিছুই লক্ষ্য করেননি। বললেন, একটা পান যদি অন্তত দয়া করে গালে ফেলেন দাদা...

বললাম, না, শিগ্‌গী একটা রিক্সা ডেকে দাও উমাপদ। ভীষণ বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে!

পরের দিন সকালে উমাপদ হু হু করে কাঁদতে কাঁদতে এসে ধড়াস করে লুটিয়ে পড়লেন আমার সামনে। রুক্ষ চুল, লাল চোখ, তাকানো যায় না তার দিকে।

বললেন, বাসর-ঘর থেকে কোন এক ফাঁকে উঠে গিয়ে বর রাত্রে স্কুলবাড়ির মধ্যে গলায় দড়ি দিয়েছে দাদা। এ কি হল? এ-কি সর্বনাশ হল আমার?

মুখে কথা এল না। আস্তে আস্তে মাথায় একটা হাত দিলাম তার।

বললাম, আমিই এ সর্বনাশের কারণ উমাপদ। দ্বারিক ধোপা আমার দেশের বাড়িতে কাপড় কাচত। ছিষ্টিধর তারি ছেলে, ও বামুন নয়।

একটু ভেবে বললাম, কেঁদো না উমাপদ, তোমার মেয়ের বিয়ে আমি দিয়ে দোব।

ওরা যে দু-জন দু-জনকে ভালোবেসেছিল দাদা, বলেই উঠে তীরবেগে দৌড়ে চলে গেলেন উমাপদ।

স্থির হয়ে বসে রইলাম। মনে হল, কাল বিকেলের বৃষ্টিটা যদি না হত! যদি বেড়াতে বেরিয়ে যেতাম উমাপদ আসার আগেই!

শমী বৃক্ষ

অসুখটা সন্দেহজনক। বুকে পিঠে ব্যথা, খুক খুক করে কাসি। বিকেলের দিকে রোজই একটু করে জ্বর হয়।

সঞ্জীবন চৌধুরী আগাগোড়া পরীক্ষা করে বললেন, যা ভয় করছ, তাই। তবু একটা প্লেট করিয়ে নাও।

শমী একটু ইতস্তত করে বলল, আজই ব্যবস্থা করছি। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি যক্ষা হয়, তাহলে ত বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না।

নিশ্চয় না। হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

দু-মিনিট পরে বললেন ডাক্তার, সেজন্যে চিন্তার কিছু নেই। সীট জোগাড় করে দেব আমিই। তুমি শুধু প্লেটটা করিয়ে ফেলো।

শমী বলল, আচ্ছা এত বয়সে যক্ষা হয়?

ডাক্তার বললেন, হয় বৈকি। তবে অল্প বয়সের তুলনায় কম হয়।

ডাক্তার চলে যেতে ভুবনেশ্বরী বললেন, শেষকালটা আর ওকে হাসপাতালে দিসনে রে। আমি ওকে নিয়ে বরং শান্তিপুর চলে যাই। সেখানে বিপিন কবরেজ চিকিৎসা করলেই…

শমী বিরক্ত হয়ে বলল, কি যে তুমি বলো মা, তার ঠিক নেই। অসুখটা হল যক্ষা। গেঁয়ো বিপিন কবরেজ কি করবে তার?

ভুবনেশ্বরী বললেন, দেখিস ঠিক খাড়া করে তুলবে সে ওকে। তোর দাদু বলতেন, বিপিন হল ধন্বন্তরী।

কিন্তু তুমি বুড়োমানুষ, তোমাকেই কে দেখে তার ঠিক নেই। তুমি পারবে এই রোগীর সেবা করতে, আবার রান্না-বাড়া, কাজ-কর্ম সব করতে?

না পারলে আর উপায় কি বাবা?

মনীষা পাশেই ছিল। সে ফোঁস করে মন্তব্য করল, একটা চাকরের জন্যে এত হয়রানির মানে হয় কিছু? অসুখ হয়েছে, হাসপাতালে পাঠানো হক। সারল ভালো, না সারলে কি আর করা যাবে?

ভুবনেশ্বরী বললেন, চাকর বলতে তোমরা যা বোঝ, কাঙালী তা নয়। আমার শ্বশুর ওকে নিয়ে এসেছিলেন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে। একরকম জামা-কাপড়, একরকম খাওয়া পরা দিয়ে মানুষ করেছিলেন ওকে নিজের ছেলের সঙ্গে। পড়িয়েছিলেন এন্ট্রান্স পর্যন্ত।

মনীষা ঠোঁট উল্টে বলল, আমার ও-সব সেকেলে গল্প শুনলে গা জ্বালা করে।

তা বললে ত চলবে না বাছা। সেকাল থেকেই একালটা এসেছে। বনিয়াদটা আছে বলেই দেওয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ও-সব যাক। পাঁচটি বছর একটানা বিছানায় পড়ে থেকে জোয়ান বয়সে কর্তা চলে গেলেন। যাবার সময় তিনি বলে গেছেন, সংসার রইল, আর তার মাথার ওপর রইল কাঙালী। খোকার তখনো জন্ম হয়নি।

মনীষা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে শশী বলল, আহা-হা মণি, উচিত কথা সবসময় না হয় না-ই বললে!

দু-ফোঁটা চোখের জল মুছে ভুবনেশ্বরী বললেন, অদিনে আজ ওকে হাসপাতালে ঠেলে দোব, সে হতে পারে না। আমার যতক্ষণ জ্ঞান আছে…

ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাল সকালেই আমাদের রেখে আসবি তুই। অফিস থেকে আসার সময় বরং দু-খানা টিকিট কেটে আনিস। যা বাঁধা-ছাঁদা করার, সব আমি করে রাখব দুপুর বেলার মধ্যেই।

দু-জনকে শান্তিপুরে রেখে শশী যখন চলে আসছে, কাঙালী তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, বাপ আমার রাজা হও। দুঃখী লোক যেন তোমার কাছে সোয়াস্তি পায়, হতভাগা যেন পায় একটু ভালোবাসা।

বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে এল তার। চোখদুটো উঠল চকচক করে।

বলল, আর দেখা হবে না আমার সঙ্গে। না হক, আমার আশীর্বাদ রইল তোমার ওপর চিরদিনের জন্যে।

ভুবনেশ্বরী প্রায় কিছুই বললেন না। চাপা একটা অভিমান নিয়ে চলে এসেছেন তিনি কলকাতা থেকে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, কাঙালীকে মনীষা নিছক একটা আপদ মনে করে। তার জন্যে ওষুধ-পথ্য, খরচ কোনটাই তার অভিপ্রেত নয়।

শশী যাবার আগে একশোটা টাকা দিল ভুবনেশ্বরীর হাতে।

তিনি বললেন, আমার সামান্য গয়না-গাঁটি যা ছিল তা নিয়ে এসেছি। দরকার হলে, তা বেচেই আমি মানুষটার চিকিৎসা করাব বাবা। আমি ত আর ওকে তোমাদের মতো চাকর বলে মনে করি না।

শশী বলল, মনীষার ওপর তুমি রাগ করে থেক না মা। ও এ-সংসারে নূতন

এসেছে। আমি তা কোনদিন অবিবেচনা করিনি। যাই হক, তেমন-তেমন বুঝলে, তুমি টেলিগ্রাম করো আমাকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব।

সত্যি-সত্যি টেলিগ্রাম যখন এল, শমী তখন বিছানায় পড়ে। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে।

গজগজ করতে করতে মনীষা বলল, বাড়াবাড়ি দেখে আর বাঁচি না। চাকরের অসুখ করেছে ত ত্রিভুবন রসাতলে গেছে! হৈ-হৈ কাণ্ড, রৈ-রৈ ব্যাপার! বাপের জন্মে এমন দেখিনি।

অসহিষ্ণু সুরে শমী বলল, আহা-হা, ওর কথা নয়। অনন্ত টেলিগ্রামে জানিয়েছে, মার খুব অসুখ।

হবেই ত। দিনরাত্রি ঐ নফরের অত সেবা করলে বুড়োবয়সের দেহ কদিন মজবুত থাকবে? কি দরকারটা ছিল ওকে নিয়ে দেশান্তরী হবার?

একটু সাব্যস্ত হয়ে শমী এল শান্তিপুরে।

সে-ও উঠানে ঢুকল আর হরিবোল দিয়ে শব-যাত্রীরাও এসে দাঁড়াল সদর দুয়ারে।

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল শমীর। তাহলে কি মা আর নেই?

না, দেখল রোয়াকে নিঃশব্দে বসে আছেন ভুবনেশ্বরী। বুঝল মা নয়, কাঙালী চলে গেছে।

ভুবনেশ্বরী বললেন, ওর নামে তার করলে ত বৌমা তোমায় আসতে দেবে না। তাই নিজের অসুখ বলে জানিয়েছিলাম বাবা। শেষ কালটা বড্ডই তোকে দেখার জন্তে অস্থির হয়েছিল! তা ওর যন্ত্রণার শেষ হয়েছে…

পৈঠায় চুপ করে বসল শমী। মনে পড়তে লাগল তার অনেক দিনের অনেক কথা। ছোটবেলার সেই সব মিষ্টি দিনগুলোর কথা, যা মনেই পড়েনি এতদিন। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কত তফাৎ।

সে বলল মানুষটাকে কোনদিন রাগতে দেখিনি। অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি কোনদিন। চিরদিন ছিল হাসিমুখ। এতবড় অসুখেও…

ত্রিভুবনে ওর কেউ ছিল না বাবা তুই ছাড়া, ভুবনেশ্বরী বললেন, তুই ওর একটা শ্রাদ্ধ-শান্তি করিস, নইলে ধর্মের কাছে অপরাধ হবে তোর। ভুবনেশ্বরীর কথাগুলো কেমন যেন জড়ানো জড়ানো। যেন তিনি ঘুমের মধ্যে কথা বলছেন।

শমী চঞ্চল হয়ে উঠল। একটু অবাকও হল যেন সে মনে মনে।

বলল, অমন করছ কেন মা ?

ভুবনেশ্বরী বললেন, তোর বাপ ছিল চির রুগ্ন। তোর জন্মদাতা বাপ হল ও-ই… চাটুজ্যে বাড়ীর বড় ছেলে নয়।

সে কি ? এ কি কথা বললে তুমি মা ?

কিন্তু কোন জবাব দেবার আগেই প্রাণহীন দেহটা ভুবনেশ্বরীর লুটিয়ে পড়ল দাওয়ার ওপর।

হঠাৎ পর্দা উঠলে

কল্যাণীয়াসু,

মঞ্জু, তোমার মার মৃত্যুসংবাদ কেন আমাকে জানাওনি, সে প্রশ্ন তুলছি না। তোমার না জানা থাকতে পারে বলেই, শুধু কয়েকটি তথ্য বিবৃত করছি। তোমার মা ও আমি দুই সহোদর ভাই-বোন নই। দু-টি নিরাশ্রয় বালক-বালিকা আমরা এক ধনীগৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলাম, এক নিঃসন্তান মহিলার অসীম স্নেহের মধ্যে। আমি ন-বছরের বড়, তাই দাদা। তবে পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না আমাদের বলে, ছোটবেলা থেকেই দু-জনে আমরা দু-জনকে আপন ভাই-বোনের মতো আন্তরিকতাতেই আঁকড়ে থেকেছি।

আমি ডাক্তারি পাশ করে যখন বিলেত যাই, তখন তোমার মা ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। অপূর্ব সুন্দর তাঁর চেহারা, চমৎকার তাঁর গানের গলা! পড়াশোনাতেও খুব মাথা তাঁর। হঠাৎ আমাদের পালক-মায়ের ছোট বোন বাসন্তীমাসি একদিন বললেন, আন্নার সঙ্গে ধীরুর বিয়ে দাও না দিদি। খাসা মানাবে দু-টিতে। মা বললেন, সে আবার হয় নাকি? আসলে যাই হোক আজ ওরা ভাই-বোন, আমাদের মা-বাবা বলেই জানে। কি যে বলিস তুই! আড়াল থেকে এই কথা শুনলাম আমি। মনে হল, সত্যিই ত! আমরা ত সহোদর নই, তবে কেন হয় না দু-জনে একত্রে সংসার করা?

কিন্তু মনের কথা মনেই রইলো। বিদায়বেলা আন্না দাদা গো বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ভাবনা কি? মার কাছে থেকে পড়াশোনা কর। আমি ফিরে আসি, তারপর যা করার করব। এর বেশি আর কিছু বললাম না। তবে ভাব দেখে মনে হল যে কথাটা আমার মনে উঠেছে, বোধহয় উঠেছে তা আন্নার মনেও। কিন্তু ঐ মনে হওয়া পর্যন্তই।

চারবছর বিদেশে ছিলাম। অল্প-স্বল্প চিঠিপত্র আদান-প্রদান হত দু-জনে। কিন্তু সে সবই মামুলি চিঠি। আমি ব্যস্ত পড়া নিয়ে, বোধহয় ও-ও ব্যস্ত তাতেই! দেশে ফিরে দেখলাম আন্নার একটু ভাবান্তর হয়েছে। সে বি-এ পাশ করেছে, বেতারে গান গায়, মাসিকে কবিতা লেখে এবং এক এম-এ পাশ তরুণ লেখক বয় ফ্রেণ্ডরূপে তার কাছে আনাগোনা করে। এগুলো স্বাভাবিক বলেই মেনে নিলাম, কিন্তু অস্বাভাবিক ঠেকলো তার আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টাটা।

যাই হোক, সরকারী চাকরিতে পোস্টিং হল আমার দার্জিলিঙে। চলে যাবার দু-দিন আগে হঠাৎ আন্না এসে কাঁদো কাঁদো মুখ করে বললো, দাদা, তুমি বলেছিলে

ফিরে এসে আমার ব্যবস্থা করবে। করো এবার। সস্নেহে বললাম, কি ব্যবস্থা রে? সলজ্জকণ্ঠে বললো সে, বুঝতেই ত পারছো।

মাস্টারমশায় ছিলেন উনি আই-এ পড়ানোর সময় থেকে···মা বলে, চাল-চুলো নেই ওর, খেতে দিতে পারবে না।···এই পর্যন্ত বলেই কাঁধে মুখ রেখে ভেউ ভেউ করে কান্না।

নিজের অন্তরকে দৃঢ় হাতে সংযত করেই দিলাম ওদের বিয়ে। তারপর চলে গেলাম দেশ ছেড়ে। দাদারূপে সম্পর্ক শুরু হয়েছিল, তাই থেকে গেল সারা জীবনের জন্যে। আজ তিনি চলে গেছেন, তাঁর সংবাদটুকুও পেলাম না আমি, বৃদ্ধবয়সে এটা একটা বঞ্চনার মতো মনে হচ্ছে। তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না মা। শুধু দুঃখটা জানাচ্ছি। ইতি—

শুভার্থী—মামা।

২.

স্নেহের মন্নুমা,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার মা কেন জানাতে বারণ করেছিলেন তাঁর মৃত্যু-সংবাদ আমাকে, তা তুমিও জানো, আমিও জানি। আমার একমাত্র ছেলে দিব্যেন্দুর সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছিল, আর এই ভাবকে উপলক্ষ করেই তোমার মা চেয়েছিলেন তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে। আমি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। বলেছিলাম, হতেই পারে না এ বিয়ে।

এতেই রুষ্ট হয়েছিলেন তোমার মা। ভেবেছিলেন, ছেলের বিয়ে দিয়ে মোটা দাঁও পেটার লোভেই তাঁকে অপমান করেছি আমি। তোমার মন থেকে তাকে সরিয়ে দোব বলেই, মাতৃহীন একমাত্র ছেলেকে আমি দীর্ঘদিনের জন্যে জার্মানি পাঠিয়ে দিলাম যখন, তখন তোমার মা ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে লিখলেন, একদিন আমার জীবন চুরমার করে দিয়ে নিজে চলে গিয়েছিলে দূর বিদেশে। আজ আবার আমার জীবনের পুনরাবৃত্তি করলে আমার মেয়ের বেলা। তুমি পিশাচ, ভণ্ড, নির্মম!

তিনি যে অবিচারই করে যান আমার ওপর, কোনদিন আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিনি আমি। কিন্তু মা-মণি, তুমি অবিচার করোনা। আমি দিব্যেন্দুর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিইনি নিছক নৈতিক কারণেই। তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ। একদিন বলব তোমাকে কারণটা। আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছা নিও। ইতি—

তোমার মামা

৩

আদরের মা মণি,

তোমার চিঠি পেয়েছি। ঠিকই বলেছ, বুড়ো হয়েছি, যা বলার এখনি বলে যাওয়া ভালো। পরে হয়ত সময় হবে না। আচ্ছা বলছি এখনি।

তোমার মা-বাবার বিয়ে দিয়ে আমি চলে গেলাম দার্জিলিঙে। তারপরই তোমার মার চিঠি, দাদা, কি বিয়ে দিলে আমার? একটা পয়সা আনে না, খালি বসে বসে কাব্যি করে! কি করে চলবে দিন? মার কাছে চাইতে লজ্জা করে। তুমি ব্যবস্থা করো দাদা। এসে ভগিনীপতির চাকরি করে দাও, নয়ত ঘাড় ধরে বিদেয় করে দিয়ে নিজের বোনকে নিজের কাছে নিয়ে যাও।

কলকাতায় এলাম। পরাশর বলল, চাকরি করা আমার ধাতে পোষাবে না। আমি কবি, কবিতাকে কেউ দেশে পয়সা দিয়ে আদর করে না। বিয়ের আগেই আমি এ-কথা বলেছিলাম। আপনার বোন তখন বলেছিল, মাস্টারি করে দিন চালাবে। এখন গররাজি হলে চলবে কেন? বললাম, আচ্ছা, ও করবে যা হোক্ কিছু। কিন্তু তুমিও কিছু করো। দু জনে সংসারটা চালিয়ে নাও কষ্ট করে।

শ্রীমান ভগিনীপতির উত্তর হল, কেন, আপনি ত ঢের টাকা পান। দিন না আমাদের শ-দুই করে মাসে মাসে। তোমার মামী ছিলেন খুবই উদার প্রকৃতির। অখুশী হলেন না। তা ছাড়া চিররুগ্না ছিলেন, সংসার নিয়ে মাথাও ঘামাতেন না তিনি বেশি।

বছর তিন—চার চলল এইভাবে। তারপর তোমার মা হঠাৎ একদিন পালিয়ে এলেন আমার কাছে। বললেন, পরাশর মদ্যপ, হীনচরিত্র, সে কু-পল্লীতে বেড়ায়, কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আর তার সঙ্গে ঘর করবেন না তিনি। আমি বললাম, আচ্ছা, থাক তুই এখানে। রইলো সে আমার কাছে। কয়েকদিন পরেই এলো পরাশর। সে বললো, আপনার বোন আমাকে বলে বাড়ি থেকে দূর হয়ে যেতে। বলে, আমার মুখ দেখলে ঘৃণা হয় ওর। বলে, ওর ইচ্ছে হলে অন্যের সঙ্গে ব্যভিচার করবে!

বুঝলাম, অন্তরের বন্ধন শিথিল হয়েছে ওদের। হয়েছে অভাবে, ব্যাধিতে এবং সন্তানহীনতায়। বেশ করে চিকিৎসা করলাম দু-জনের। নীরোগ সুস্থ হল দু-জনেই। দেখলাম পরাশর হারিয়েছে সন্তানলাভের সামর্থ্য চিরদিনের জন্যে, অথচ সন্তান না হলে ওদের ভাঙা সম্পর্ক জোড়াও লাগবে না। সংসারজীবনটাও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না। তখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে একটি সন্তান এনে দিলাম ওদের মধ্যে। সেই সন্তান তুমি।

এরপর অনেকটা সহজ হয়ে এলো ওদের সম্বন্ধটা। কিন্তু বেচারী পরাশর হঠাৎ নিউমোনিয়া হয়ে মারা গেল। তারপর থেকেই তুমি আর তোমার মা আমার ওখানে। তোমার মামীর মৃত্যুর পর দিব্যেন্দুকে মিশনারী হোস্টেলে পাঠিয়ে, আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম এখানে সেখানে। তোমার মা-ই হলেন এ বাড়ির কর্ত্রী এবং তোমার ও দিব্যেন্দুর অভিভাবক। এরপরের ব্যাপার ত সবই জানো। এখন বুঝলে আশা করি আসল কথাটা। আমার আন্তরিক স্নেহ নিও। ইতি—

তোমার মামা

৪

মা'গো,

এখনো বুঝলে না কথাটা? দিব্যেন্দু আর তুমি একই পিতার সন্তান, যদিও দুই মায়ের গেহে জন্ম। এই জন্যেই বিয়ে হতে পারে না দু-জনে। কিন্তু মা, এ ইতিহাস পৃথিবীতে কেউ জানে না। জানতেন না তোমার মাও। তিনি তোমাকে পরাশরের কন্যা বলেই জেনে গেছেন এবং দিব্যেন্দুর সঙ্গে কেন তোমার বিয়ে হতে পারে না, এই নিয়েই কলহ, করে গেছেন সারা জীবন। আজ তিনি নেই। তোমাকে অকপটে বললাম সব কথা। অবিচার-সুবিচার যা আমার প্রাপ্য হয়, করো। শুধু একটা অনুরোধ, দিব্যেন্দু ফিরে এলে, তাকে এই ইতিহাস জানিয়ো এবং দুই ভাই বোন পবিত্র সুন্দর প্রীতির সম্বন্ধটুকু অক্ষুণ্ণ রেখো চিরদিন। যাকে তুমি উপযুক্ত জেনে বিয়ে করবে, তার জন্যেই রইল আমার আশীর্বাদ। আমার যা কিছু, তোমাদের দু-জনকে সমানভাবে উইল করে দিয়ে গেলাম। আমি প্রব্রজ্যা নিলাম, এই পথকেই শান্তির পথ জেনেছি বলে। বুকভরা আশীর্বাদ রইল। ইতি—

তোমার মামা-বাবা?

অবিশ্বাস

সকাল বেলা চা-টি খেয়ে সবে দাড়ি কামাতে বসেছি।

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

খুলে দেখি গুপীদা। অবাক হয়ে বললাম, এমন অসময়ে যে!

গুপীদা বললেন, বলছি দাঁড়া।

চেয়ারে চেপে বসলেন তিনি। তারপরে হাতের ঝোলান ব্যাগটা খুলে তা থেকে একতাড়া নোট বের করে ছুঁড়ে দিলেন আমার কোলের ওপর।

মুখের দিকে তাকালাম।

গুপীদা বললেন, পনের হাজার টাকা আছে। তোর একাউণ্টে রেখে দে। দরকার মতো নেব।

হতভম্ব হয়ে বললাম, ব্যাপার কি?

গুপীদা বললেন, ব্যাপার আর কি? হাতে থাকলে ত পনের হাজার পনের দিনের ওয়াস্তা। তোর কাছে থাকলে তবু থাকবে।

বুঝলাম।

গুপীদা হেসে বললেন, কিন্তু ভগবানের দিব্যি, এর কথা কাউকে বলবি না। তোর বৌদি ফৌদি কারুকে না!

বলতে না বলতেই ব্যাগ গুটিয়ে হুস করে উঠে পড়লেন গুপীদা।

বললাম, একটু চা?

দূর, চা! সাড়ে নটায় ধানবাদ রওনা হতে হবে।

বছর চারেক পরে আর এক সন্ধ্যায় এসে হাজির গুপীদা।

কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বললেন, কাল সকালে আসিস। তেরই ফাল্গুন মিনুর বিয়ে।

মিনু গুপীদার বড় মেয়ে।

বললাম, বলা নেই কওয়া নেই, বিয়ে? ছেলে কি করে?

করে করে, চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট। ভালোই বাগিয়েছি রে।

তা কিরকম খরচ হচ্ছে?

গুপীদা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, চটবি না ত? হাজার বারো।

চমকে বললাম, গুপীদা তুমি পাগল নাকি? আরো দুটো মেয়ে আছে। একটু হিসেব করে চলতে হয় ত!

গুপীদা মুখ বেঁকিয়ে বললেন, দূর, হিসেব! হাজার নয় আছে, হাজার তিন লোন করছি। বড় একটা কন্ট্রাক্ট পাচ্ছি এপ্রিলে, সব শোধ হয়ে যাবে। ভাবিসনে তুই।

বললাম, না, আমি আর ভেবে কি করব? তা লোন করতে হবে না। সেই টাকাটা ত রয়েছে আমার কাছে···

গুপীদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন, মা কালীর দিব্যি অসিত। ওর নামও করবি নে। ঐ আমার একমাত্র সম্বল!

বিয়ে হয়ে গেল খুব ঘটা করেই। খরচের বহর শুনে চটেছিলাম। ছেলে দেখে মনটা খুশী হল।

তিন চার দিন হৈ-হুল্লোড় করে বাড়ি চলে এলাম।

গুপীদা বললেন, আমি ত পাগলা লোক। মেয়ে জামাইয়ের দিকে একটু নজর রাখিস।

কি একটা ছুটির দিন। দুপুরে বসে বসে নূতন বইয়ের প্রুফ দেখছি।

হঠাৎ টেলিফোনে ক্রিং ক্রিং।

হ্যালো?

আমি ভব।

ভব গুপীদার শ্যালক।

বললাম, কি ভব?

শীঘ্র আসুন অসিতদা, জামাইবাবুর ভীষণ অসুখ। হার্টের ট্রাবল।

দৌড়লাম। দেখি গুপীদার জ্ঞান নেই, অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে।

ডাক্তার বললেন, অনেক দিনের ড্যামেজ্‌ড হার্ট। অবস্থা কঠিন, তবে এরকম রোগীও বাঁচে, এই যা ভরসা!

গুপীদা বাঁচলেন না। পঁয়ত্রিশ বছরের বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেল যেন।

সন্তবিধবা বৌদি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আপনি ত ওঁর বন্ধু ছিলেন না, ছিলেন ভাই। আপনি ছাড়া আর আমাদের সহায় সম্বল কে আছে?

বললাম, কাতর হবেন না বৌদি। হবেই একটা ব্যবস্থা কিছু।

বৌদি বললেন, আমি জানতাম, এইরকমই হবে একদিন। একদম শরীরের যত্ন নিতেন না।

কি করবেন বলুন ? ওর ধরনই ছিল ঐ রকম। আমাকে এত ভালোবাসত, কিন্তু আমার কথাও শুনত না।

একটু ইতস্তত করে বৌদি বললেন, মাত্র হাজার চারেক টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে আছে। আর জোরজার করে করিয়েছিলাম কিছু গয়না, এই চার পাঁচ হাজারের মতো। এই দিয়ে দু-টি মেয়ের বিয়ে, দু-টি ছেলের পড়া…

বললাম, ভাবনা নেই বৌদি। পনের হাজার টাকা রেখেছিল গুপীদা আমার কাছে, পরে নেবে বলে। কে জানত যে তা এই ভাবে এনে দিতে হবে আমায় ?

বৌদি চোখ তুলে তাকালেন একবার।

টাকাটা নিয়েই এসেছিলাম। দিলাম। টাকাটি নিয়ে বৌদি ঘরে ঢুকলেন।

বারান্দায় খানিক বসে থেকে কি মনে হল। হাঁক দিয়ে বললাম, বৌদি যাচ্ছি এখন।

আচ্ছা।

কেমন যেন একটু ভাবান্তর দেখলাম। ব্যাপার কি ? এট ত আশা করিনি।

পরের দিন সকালবেলা গুপীদার চাকর মানিক একখানা চিঠি দিয়ে গেল। ভব-র চিঠি। চিঠিখানা এই :

অসিতদা, জামাইবাবুর আপনি ভাইয়ের অধিক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করে বহু টাকা আপনার কাছে রেখেছিলেন। আজ তিনি নেই ! তাঁর সেই টাকা আপনি এমনভাবে আত্মসাৎ করলেন ? অনাথা বিধবা ও নাবালক ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে দয়া হল না আপনার ? ঈশ্বরের দোহাই, এত বড় অধর্ম করবেন না, অসিতদা। প্রণাম নেবেন। ইতি—

স্নেহের ভব।

বুঝলাম দুনিয়াটা যা ভাবি তা নয়। কিন্তু গুপীদা নেই, বলব কাকে ?

ফাঁদ

ট্রেনের আলাপ। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রীতিমতো অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল দুজনে। হয়ত দুজনে সমবয়সী বলে, কিংবা আর কোন জায়গায় মিল ছিল দুজনে।

ভদ্রলোক বললেন, আপনাকে আমার ওখানেই উঠতে হবে। বাড়িতে আমি, আমার স্ত্রী, আর দুটি বাচ্চা চাকর। কিছু অসুবিধা হবে না আপনার।

আমি বললাম, আমি ত বেড়াতেই বেরিয়েছি। আপনার বাড়িতে আশ্রয় পেলে আমার সুবিধাই হবে। আপনাদেরই অসুবিধা ঘটাব ভেবে লজ্জা করছে।

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, কিছু না, কিছু না। আমার বাড়িতে বাড়তি ঘর আছে। আমার স্ত্রী লোকজন ভালোবাসেন খুব। যেতেই হবে আপনাকে আমার সঙ্গে।

ভদ্রলোক ডাক্তার। ঘাটশিলায় খুব পসার ওঁর। অল্পদিনেই বাড়িঘর করছেন, গাড়ি করছেন। দেখলেই বোঝা যায় অবস্থা সচ্ছল।

কি কাজে কলকাতায় গিয়েছিলেন। এখন ঘাটশিলায় ফিরছেন।

ট্রেনে ব্যাগ বিছানা, একরাশ বইয়ের বাণ্ডিল, টিফিন কেরিয়ার নিয়ে ওঠা মাত্র সেই যে ধরলেন তিনি, আর ছাড়লেন না আমাকে!

একথা-সেকথা, আলাপ-গল্প, হাসি-ঠাট্টা। তারি পরিণতিরূপে শেষপর্যন্ত তাঁর অতিথি হওয়ার নিমন্ত্রণ। কি আর করব? রাজি হলাম।

স্টেশনে নেমে দেখি, এক আপাদ-মস্তক আধুনিক মহিলা অপেক্ষা করছেন।

ঠোঁট দুটো তাঁর বড় বেশিরকম রাঙানো। চুলগুলো ঝুরো ঝুরো, হাওয়ায় উড়ছে। বোঝা যায় তেল মাখেন না। গায়ে গহনা নেই, ডান হাতটা সম্পূর্ণ ন্যাড়া, বাঁ হাতে ছোট্ট একটা ঘড়ি।

সোজা এসে কাঁধে হাত রাখলেন তিনি ডাক্তার বন্ধুর। বুঝলাম ওঁর স্ত্রী।

আমার পরিচয় দিয়ে ডাক্তার বললেন, ইনি প্রফেসার গৌরাঙ্গ সোম। জৈন দর্শনের স্কলার। ট্রেনে আলাপ, ধরে নিয়ে এসেছি জোর করে তোমার অতিথি হিসাবে।

স্ত্রীকে পরিচিত করালেন, আমার স্ত্রী মাধুরী মজুমদার। এম. এ। কবি এবং চিত্রশিল্পী।

মহিলা মৃদু হেসে নমস্কার করলেন।

মনে হল, একটু যেন গর্বিত। যেন স্বামীটির মতো খোলামেলা স্বভাবের নন এবং আমার এই গায়ে পড়ে অতিথি হওয়াতে এব খুশী হননি তিনি।

তিনজনে গাড়ি চেপে চললাম। স্টিয়ারিং ধরলেন শ্রীমতী মজুমদার, আর আমরা দু-জন পাশাপাশি বসলাম পিছনের সিটে।

উঁচু-নিচু টিলা চতুর্দিকে। তার মাঝে মাঝে ঘন জঙ্গল। দূরে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়া ধোঁয়া একটা পাহাড়ের চেহারা। অদ্ভুত একটা মানুষের মাথার মতো তার ওপর দিকটা।

বাইরের পুরো একটা মহল ছেড়ে দেওয়া হল আমাকে।

দিব্যি সাজানো গোছানো ঘর। বিছানা, টেবিল, চেয়ার, আয়না, কিছুর অভাব নেই। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম, সর্বদা তাতে জল।

অবাক লাগল, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং নিতান্ত অযাচিতভাবে এই রাজোচিত আতিথ্য ওঁরা আমাকে দিলেন কি জন্যে, ভেবে।

ট্রেন থেকে নেমেছিলাম বিকেলে। আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, স্নানটান করে খাওয়াটা সেরে নিন। দেহ ক্লান্ত আছে, দোর জানালা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন সকাল সকাল।

প্রস্তাবটা ভালোই মনে হল। যদিও খেতে বসে দেখলাম, খাবারটা এল চাকরের হাত দিয়ে এবং ডাক্তার বা তাঁর স্ত্রী কেউ একবার এলেনও না সে সময়। এটা কি?

কিন্তু অত ভাবার মতো মনের চনচনে ভাব ছিল না। অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সামান্য একটু শীত পড়েছে। দরজা জানালা বন্ধ করে, একটা আলোয়ান মুড়ি দিয়ে শুয়েছি। হঠাৎ ঠাণ্ডাতেই বোধহয় ঘুমটা ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ঝাঁঝালো ওষুধের গন্ধ নাকে আসতে লাগল।

উঠে বসলাম। মাথার শিয়রে ভেতরঘরের দিকের একটা কপাট ছিল, তার ওপরের অংশে কাঁচের পাল্লা। সেখান থেকে একটু আলো আসছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম, একটি মানুষ টেবিলে শোয়ানো। ডাক্তার মজুমদার আর দুজন সহকারী একটা কোন অপারেশনের কাজ করছেন। একটি নার্স দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঝকঝকে একটা ট্রে হাতে, তাতে অনেক ছুরি কাঁচি।

বুঝলাম, এটা ওঁর অপারেশন গৃহ এবং জরুরী কেস বলেই বোধহয় রাত্রে ছুরি ধরেছেন। আর বুঝলাম, আমার যে ঘুম ভেঙেছে, সে ভেঙেছে ঐ তীব্র এনেস্থেসিয়ার গন্ধেই।

কেমন যেন দম আটকে আসতে লাগল। মনে হল এখনি অজ্ঞান হয়ে যাব।

আলোয়ান মুড়ি দিয়ে চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে দোর খুলে নেমে পড়লাম বাগানের মধ্যে।

কয়েক পা এগিয়েছি, মনে হল ডান পাশের একটা মাচানের তলা থেকে ফস করে কে যেন সরে গেল।

নিজের অজান্তেই আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে, কে?

জবাব এল না। কিন্তু বেশ টের পেলাম কে যেন সরে যাচ্ছে ঝোপঝাড়ের আরো ভেতরের দিকে।

প্রথমটা ভয় লাগল। তারপর ভরসা করে এগিয়ে গেলাম এবং ঝোপের মধ্যে ঢুকেই খপ করে হাত চেপে ধরলাম ছায়ামূর্তিটার।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, আমি।

একি? মিসেস মজুমদার, এত রাত্রে, আর এই অবস্থায়?

মিসেস মজুমদার বললেন, আছে অনেক কথা। নিঃশব্দে চলে আসুন আমার পিছু পিছু।

অন্ধকারে তাঁর পিছু পিছু উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ঘরে।

ছোট একটা টর্চ জ্বালিয়ে তিনি আমাকে বসতে বললেন সামনের চেয়ারটায়। তারপর আলো নিভিয়ে বসলেন পাশের চেয়ারে।

বুকের ভেতরটা গুরগুর করতে লাগল কেমন যেন আমার।

তিনি বললেন, বিকেল বেলা আপনাকে দেখেই আমার ভীষণ মায়া হয়েছে। তাই কি করে আপনাকে বাঁচাতে পারি, তার উপায় বের করতেই গিয়েছিলাম বাইরের মহলে।

বললাম, বাঁচানো? কি বলছেন আপনি মিসেস মজুমদার?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তারপর একটু থেমে বললেন, আমার চেহারাটা কেমন মনে করেন আপনি?

এ কথা কেন বলছেন মিসেস মজুমদার?

বলছি, এই চেহারা নিয়ে লোককে ভোলানো যায় কি না?

তা যায়, বললাম সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়।

হঠাৎ অন্ধকারে আমার একটা হাত চেপে ধরলেন তিনি, তারপর গায়ে ঢলে পড়ে কেঁদে উঠলেন হু-হু করে।

একি অদ্ভুত ব্যাপার? বিব্রত হয়ে বললাম, কি করছেন মিসেস মজুমদার? স্থির হন, বলুন কি ব্যাপার? সম্ভব হলে নিশ্চয় সাহায্য করব আপনাকে।

তিনি বললেন, প্রফেসার সোম, আমাকে বাঁচান আপনি। আমাকে উদ্ধার করুন এই দ্বীপান্তর থেকে। আমি টাকা চাই না, পয়সা চাই না, শান্তি চাই, ছোট একটি নিরিবিলি সংসারে শাকভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

তাইত মিসেস মজুমদার, বললাম সহানুভূতির সুরে, বুঝতে পারছি আপনি এই ঘর-সংসার নিয়ে সুখী নন।

সুখ? সুখ কাকে বলে তা জানতেই পারি নি কোনদিন।

সোজা হয়ে উঠে বললেন, আমাকে কি তুমি চিনতে পারোনি?

তুমি শুনে চমকে উঠলাম। বললাম, না ত?

তিনি বললেন, কলকাতার কোন সিনেমা হাউসে জুতো দিয়ে পা মাড়িয়ে দেওয়ার জন্ম একটি মেয়ে তোমাকে চড় মেরেছিল কখনো?

হ্যাঁ।

বিয়ের জন্ম কনে দেখতে গিয়ে, সেই মেয়েকে দেখে সোজা মুখের ওপর বলেছিলে কি তুমি যে, এমন জঘন্য মেয়ে কোন ভদ্রলোকে বিয়ে করে না?

হ্যাঁ। সে কি তুমি?

হ্যাঁ। সে অপমান আমি ভুলিনি। কিংবা তখন থেকেই মনে মনে ভালোবেসেছি আমি তোমাকে। কামনা করেছি, কিন্তু যাকগে…

তারপরই ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, তুমি ভোরের আগেই পালাও প্রফেসার সোম। ঐ যে মজুমদার, ও একটি খুনী। মানুষকে অচৈতন্ম করে ও তার দেহ থেকে সবটুকু রক্ত টেনে বের করে নেয়, তারপর শুকনো দেহটা জঙ্গলের মাটিতে পুঁতে ফেলে। ওর এই লোক ধরে আনার ফাঁদ আমি। এই হল ব্যবসা আমাদের।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল আমার দুরন্ত একটা আতঙ্কে। বললাম, একটু আগে যে লোকটিকে দেখলাম টেবিলে অচৈতন্ম হয়ে থাকতে…

সে কাল এসেছিল তোমারি মতো এ বাড়ির অতিথি হতে এবং সম্ভবত গৃহস্বামীর বৌটির অনুগ্রহলাভ করতে। আজ তার শেষ হল। কাল হবে তোমারও, যদি না পালাও।

আমি বললাম, পালাব এখনি। কিন্তু তোমার কি হবে?

শ্রীমতী বললেন, আমার জন্মে ভেবো না। তুমি আমায় শুধু একটি সন্তান দিয়ে যাও, তাহলেই সমাধান করতে পারব আমি সব সমস্যার। আর সবই আমি মানিয়ে নিয়েছি।

চলে এলাম সেই রাত্রেই মোটঘাট নিয়ে। আজ ভাবি যা হয়েছিল তা সত্যি না স্বপ্ন?

একে একে অতিথিরা বিদায় নিলেন। সবশেষে অতিথি চামেলী চট্টরাজ, জেলা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, কাছেই থাকেন। এবার তিনি হাতব্যাগটি নিয়ে ওঠার জন্তে তৈরি হলেন।

ইন্দু দেবী তাঁকে সদর দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, লোকের ভিড়ে আজ আর ভাল করে কথা বলা হল না। শীগ্‌গির একদিন যাব।

স্নিগ্ধ হাস্তে উত্তর দিলেন চামেলী, নিশ্চয় যাবেন। আপনাকে দেখলেই আনন্দ হয়। তারপর রত্নার দিকে ফিরে বললেন, তুমিও যেও। চলে যাবার আগে যেন দেখা হয়।

রত্না কোন কথা বলল না, শুধু বিনম্র স্বীকৃতি জানাল মাথাটা হেঁট করে।

মা ও মেয়ে যখন খেতে বসল, রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারটা।

মফঃস্বল শহর, চতুর্দিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে এরই মধ্যে। শুধু অদূরবর্তী রেল স্টেশন থেকে রাত্রিকালীন ডাকগাড়ির তীক্ষ্ণ একটা হুইসিলের শব্দ ভেসে আসছে এক এক বার। আর পথের কুকুর দু-একটা খেঁকিয়ে উঠছে কোন অন্ধকারের যাত্রীকে দেখে, কিংবা কারো পায়ের শব্দ শুনে।

রত্না বলল, যদি কোয়ার্টার পাই, তাহলে মাসখানেকের মধ্যেই তোমাকে নিয়ে যাব মা। নইলে গ্রীষ্মের ছুটিটা পর্যন্ত একটু কষ্ট করে থাকতে হবে তোমাকে। পারবে ত?

ইন্দু দেবী ঠোঁটে একটু করুণ হাসি টেনে বললেন, না পারলে আর কি করে চলবে মা? একদিন ঠিক তোর এই বয়সেই ত আমিও মাস্টারি নিয়ে এখানে চলে এসেছিলাম, সব জানাশোনার পাট চিরদিনের জন্তে চুকিয়ে দিয়ে।

কেন মা?

তোকে সকলের চোখ থেকে আড়াল করার জন্তে!

রত্না মায়ের কথায় হঠাৎ যেন হোচট খেয়ে থেমে গেল। এ-রকম কথা ত সে তার চব্বিশ বছরের জীবনে আর কখনো শোনেনি মায়ের মুখে।

সে বলল, বাবা কি আমার জন্মের আগেই মারা যান? আমি কি কোনদিন তাঁকে চোখেও দেখিনি, তাঁর স্নেহ ভালবাসাও পাইনি?

ইন্দু দেবী বললেন, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে। আমাকে আর বকাস নে রত্নু।

রত্না চুপ করে গেল। এটা সে বরাবর লক্ষ্য করেছে যে, বাবার বিষয়ে কোন

কথা তুললেই মা কেমন যেন বিরক্ত হন। ফলে এতটা বয়স হল, তবু সে বাবার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। একমাত্র এইটুকু জানে যে তার বাবা ছিলেন একজন ডাক্তার এবং তাঁর নাম জীবেন্দ্রলাল মিত্র।

রাত্রে শুয়ে রঞ্জার ঘুম এল না। হেডমিস্ট্রেস শান্তিদির কথাটা তার কানে তখনো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তিনি উঠে যেতে যেতে বলেছিলেন, বাইরে একা চাকরি করতে যাচ্ছ, সাবধানে থেক। সুনাম ও সম্রমে যাতে এতটুকু ঘা না পড়ে, সেদিকে নজর রেখে চল। মনে রেখ তুমি বিধবা মাঁর সন্তান এবং তাঁর শেষজীবনের একমাত্র ভরসা।

তাঁর একথায় হঠাৎ তার মা কি রকম আনমনা ও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন, সেটাও তার মনে পড়ল।

সে স্পষ্ট বুঝল, তার বাবার মৃত্যু, মায়ের বৈধব্য ও নিজের জন্ম, এই তিনকে বেষ্টন করে নিশ্চয় এমন কোন রহস্যের জটিলতা আছে, যা তার মা এই দীর্ঘকালেও তার কাছে ভাঙেননি। বোধহয় কোনদিন ভাঙতেও পারবেন না, এমনি কোন ব্যাপার সেটা।

বহরমপুর কলেজে এসে অল্প দিনেই বেশ মন বসে গেল রঞ্জার! সর্বকনিষ্ঠা লেকচারার বলেই হোক, আর সেরা সুন্দরী এবং ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া চোস্ত ইংরেজি বলিয়ে বলেই হোক শিক্ষক ও ছাত্র দুই মহলেই তার কদর বেড়ে গেল হু-হু করে।

অবশ্য জলপাইগুড়ি শহর, তার নদী, পাহাড়, জঙ্গল ও মাঠের কথা, তার স্নেহশীলা সদা কর্মময়ী মায়ের কথা থেকে থেকে মনটা উদাস করে দেয়, তবু নূতন জীবনে খাপ খাইয়ে নিল সে সহজেই।

প্রিন্সিপাল মিনতি সেন একদিন বললেন, মিস মিত্র, এখনি ডক্টরেটটা শেষ করে ফেলুন, তাহলে ভবিষ্যতে এই কলেজে হোক, অন্য কোথাও হোক, প্রিন্সিপালের পদ ত আপনার বাঁধা। এমনকি সোজা বিশ্ববিদ্যালয়েও চলে যেতে পারেন।

মৃদু হেসে রঞ্জা বলল, আমার মাও তাই বলেন বটে। কিন্তু কি হবে বলুন ত মিনতিদি, এত কাণ্ড করে? আমি ত মনে মনে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই লাইন ক-টাই মটো হিসাবে নিয়েছি :

The moving accident is not my trade.
To freeze the blood I have no ready art,
It is my pleasure alone in a summer shade.
To pipe a simple song for a thinking heart !

হো হো করে হেসে প্রিন্সিপাল বললেন, না, না, ও কোন কাজের কথাই নয়। ও হল নিষ্কর্মা লোটাস ইটার্সের ফিলজফি। জীবন কাজের জন্তে। আপনি ছেলেমানুষ, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যাম্বিশান ইন লাইফ।

হঠাৎ প্রিন্সিপাল বললেন, সত্যি আপনার মার কথা ভাবি এক এক সময়। পিতৃহীনা মেয়েকে কি কষ্টে মানুষ করেছেন, তা অনুমান করতে পারি আমি। আমিও যে ভুক্তভোগী কিনা।

এই জায়গায়ই ত রঞ্জার আসল ব্যথা। আজীবন সে মায়ের মেয়ে। কিন্তু বাবা কি পদার্থ, কেমন যে তিনি ছিলেন, তার বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যাঁর মুখে তার বাবার কথা শোনার সুযোগ বা সৌভাগ্য হল কোনদিন।

সেদিন রঞ্জার মাত্র একটা পিরিয়াড পড়ানো ছিল অনার্স ক্লাসে। বেলা একটা নাগাদ ডেরায় ফিরে তাই সে বসে গেল অসমাপ্ত একখানা ফরাসী নভেল নিয়ে। ইতিমধ্যে ডাকপিয়ন এল মোটা একটা রেজিস্ট্রি চিঠি নিয়ে।

হাতের বইখানা সরিয়ে রেখে রঞ্জা আস্তেব্যস্তে পড়া শুরু করল চিঠিটা। লিখেছেন আর কেউ না, স্বয়ং তার মা।

চিঠিটা এই :

স্নেহের রঞ্জু,

তোমাকে একটা কথা অনেকদিন থেকেই বলব ভেবেছি, কিন্তু বলতে পারিনি। কথাটা আর কিছুই না, তোমার জন্ম সম্বন্ধে। তুমি প্রায়ই জানতে চেয়েছ তোমার বাবার কথা এবং আমি কোনদিন তা বলিনি।

এখন তুমি বড় হয়েছ, এজন্যে নিশ্চয় তোমার মনে হয় যে তোমার জন্মের সঙ্গে তোমার মায়ের কোন গুরুতর কলঙ্কের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। গোড়াতেই বলে রাখি যে তা নয়। তুমি যার গর্ভে জন্মেছ, তোমার সেই জননী জাহ্নবীর মত পবিত্র, ফুলের মত নির্মল।

কিন্তু এ কথা থাক। তুমি এক কুমারীর সন্তান এবং তোমার কোন পিতা নেই। বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে তোমার জীবনের উপকরণ সঞ্চিত ছিল, আমি তা আপন দেহে গ্রহণ করেছিলাম একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির তাঁর অনুসন্ধানে সহায়তা করব বলে। সেই ব্যক্তির নাম জে এন মিত্র—বিখ্যাত বায়োলজিস্ট তিনি।

অল্প বয়সের কৌতূহলে বৈজ্ঞানিক সহকারী হিসাবে তাঁর নিরীক্ষার মাধ্যম হতে স্বীকৃত হয়েছিলাম আমি। তারই ফলে তুমি এসেছিলে আমার দেহে। কিন্তু

বিপথগামিনী মনে করে বাব-মা আমাকে ঘরে ঠাঁই দিতে রাজি হননি। বিধবা সেজে তাই তোমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি অনেক দূরে। স্বোপার্জিত অর্থে মানুষ করেছি তোমাকে। আর কে তোমার জীবনের আদি উৎস তা জানিনি বলে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ডাক্তার মিত্রকেই তোমার পিতা বলে পরিচিত করেছি স্কুলে-কলেজে-সমাজে। আসলে তোমার জীবনদাতা তিনি, জনক কিনা জানি না।

আমার এই কাহিনী যদি তোমার ঘৃণা উদ্রিক্ত করে, তা হলে এখানেই বিদায় দিও আমাকে। আর যদি মনে হয় অলৌকিক এক আশীর্বাদের মতো তুমি এসেছ আমার বুকে, তা হলে ছুটি হওয়ামাত্র তুমি তোমার চির আদরের জায়গাটিতে ফিরে এস, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে।

ইতি—তোমার মা

চমকে উঠল রঞ্জা। চোখের সামনে থেকে তার যেন দীর্ঘকাল থেকে প্রলম্বিত একটা কঠিন কালো যবনিকা সরে গেল এক মুহূর্তে! নূতন সূর্যালোকের মধ্যে জন্ম হল যেন তার আর একবার! মনে হল কি আশ্চর্য জন্মকাহিনী তার!

আরো আশ্চর্য যে আজই সকালে বিখ্যাত সেঞ্চুরি পত্রিকায় ডাঃ জে এল মিত্রের লেখা 'বীক্ষণাগারে তৈরি মানুষ' প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হয়েছে সে। যৌবনে একদিন তার মা ছিলেন তাঁর সহকারী, তাকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি গবেষণাগারের টেস্টটিউব থেকে আপন দেহে বহন করে।

দু-হাত তুলে প্রণাম জানাল সে ডাঃ মিত্র ও তার মার উদ্দেশে। ঠিক করল ছুটি হলেই আগে সে কলকাতায় যাবে ডাঃ মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর সেই দেখার ইতিহাস সংগ্রহ করে সে রওনা দেবে জলপাইগুড়িতে। হাজির হবে মার কাছে, যে মা তার বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও মমতায় তুলনাহীন।

সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখল সে মাকে। আর সাতদিন পরেই ছুটি। কলকাতা হয়ে অবিলম্বে আমি তোমার কাছে উপস্থিত হচ্ছি মা।

কিন্তু দিন তিনেক পরেই জেলা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস শান্তিদির টেলিগ্রাম এল: তোমার মা ইন্দু দেবী কাল দেহরক্ষা করেছেন। অবিলম্বে চলে এস।

নক্সা

সকালের ডাকে একখানা খামের চিঠি পেলাম। চিঠিখানা আসছে আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্ট অফিস থেকে। লেফাফা খুলে যে চিঠিখানা পেলাম, তা হুবহু এই :

শ্রীচরণেষু,

মানিকদা, এই চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছুবে, তখন আর আমি এ পৃথিবীতে নেই। কেন এমনভাবে জীবনের অবসান করলাম সে কাহিনী আর কাউকে জানানোর দরকার নেই আমার। শুধু প্রকৃত ব্যাপার আপনাকে না বলে গেলে মরেও শান্তি হবে না আমার। তাই সবকথা ছোট্ট একটা বিবৃতির আকারে লিখে আমি আমার শোবার ঘরের দেরাজে রেখে গেলাম সীল করে—এই চিঠি পাবার পর আপনি এসে ওপরের ঘর থেকে দেরাজ খুলে খামখানা নিয়ে যাবেন। অনেক আবদার উপদ্রবই করেছি জীবনভোর আপনার ওপর, আর একটি [এবং এইটিই শেষ] আবদার রইল মানিকদা। আমি নেই জেনেই আশা করি রাখবেন এটা। এই বিবৃতির একটি কপি আপনি 'জয়ডঙ্কা' কাগজে ছাপাবেন আর একটি প্রধানমন্ত্রী মহাশয় যাতে পড়েন তার ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। বিদায় মানিকদা। হাজার হাজার প্রণাম। ইতি,

হতভাগ্য পাঁচু।

পাঁচু আমাদের মামাতো শ্যালক। অদ্ভুতকর্মা ছেলে সে। একবার দেখলাম 'গণমুষ্টি' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক হয়ে বসেছে আর গরম-গরম বঙ্কিমী বাংলায় অবিরাম বিদ্রোহ প্রচার করছে! এরপরই দেখলাম চোখে কালো গগলস লাগিয়ে প্যান্ট হাফশার্ট ও নেকটাই সজ্জিত হয়ে অ্যাটাচি ব্যাগ হাতে ইতস্তত দৌড়োদৌড়ি করছে। শুনলাম সিনেমা ডিরেক্টর হয়েছে। কিছুদিন পরে দেখলাম, সালোয়ার চুস্ত পাজামা পরেছে, মাথায় গান্ধীটুপি চড়িয়েছে। বলল শেয়ার বাজারে হানা দিচ্ছে, সেইসঙ্গে লাইসেন্স ও পারমিট শিকার করে বেড়াচ্ছে। এমন যে সর্বতোমুখী প্রতিভাধর পাঁচু সে কি জন্যে এমন কাপুরুষের কাজ করল? প্রেমে পড়েছিল? কিন্তু তার ত লিভারের দোষ ছিল না? কাজ-কারবারে লোকসান খেয়েছিল? উঁহু, নিজের পয়সা খাটিয়ে কারবার ত সে জন্মেও করে নি। তবে? মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম!

গৃহিণী প্রথমটা ফুঁপিয়ে, তারপর বেশ সরবেই কান্না শুরু করলেন। হাজার হলেও মামাতো ভাই আর মাতুলকুলের মধ্যে ঐ একমাত্র ছেলে। যাকে বলে সবেধন নীলমণি। তা ছাড়া পাঁচু এমনি যাই হক, তাঁকে ভক্তিটক্তি ভালোই করত; আসতে যেতে পায়ের

ধুলো নিত, রকমারি ফাই-ফরমাসও খেটে দিত হাসিমুখেই। কি আর করি? কতকটা গৃহিণীর খাতিরে, কতকটা চক্ষুলজ্জার খাতিরেও বেরুলাম ছাতাটি বগলদাবায় নিয়ে। যাই একবার দেখে আসি ব্যাপারটা কি! আর পাঁচুর সেই বিবৃতি, কি ছাইভস্ম আছে তাতে জানি না, সেটাও ত আনতে হবে। পাঁচুর শেষ অনুরোধ। বাস থেকে নেমে পর পর দুটি সুঁড়ি গলি পার হয়ে যখন পাঁচুদের দরজায় এসে হাজির হলাম তখন কেমন যেন অবাক লাগল। এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেছে বাড়িতে কিন্তু কিছুমাত্র কান্নাকাটি, হৈ-চৈ ত নেই সেজন্যে। বরং প্রাত্যহিক হাসি-গল্প ও কথাবার্তার আওয়াজই যেন ভেসে আসছে ভেতর থেকে। মজা মন্দ নয় ত।

ভেতরে ঢুকে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আর কেউ না স্বয়ং পাঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার বুলি কুকুরকে সহবৎ শেখাচ্ছে। গা ছম ছম করে উঠলো। ভগিনীপতি হলেও পাঁচু আমার সঙ্গে এইধরনের ইয়ার্কি করবে এটা কোনদিনই আশা করিনি।

আমাকে দেখেই পাঁচু আস্তেব্যস্তে বলে উঠল, মানিকদা এসেছেন? ভাবছিলাম এখুনি আপনার কাছে যাব। এসে পড়েছেন ভালোই হল। তা চলুন ওপরে চলুন অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।

নিঃশব্দে পিছু পিছু উঠে এলাম পাঁচুর সঙ্গে ওপরের ঘরে। চেয়ার এগিয়ে দিয়ে পাঁচু বলল, বসুন মানিকদা বসুন। আমি মাকে খবর দিই আর চা বানাতে বলি।

আমার তখন রাগে শরীর কাঁপছে। বললাম, চায়ের দরকার নেই কাউকে খবরও দিতে হবে না। বস। আমার সঙ্গে এই ঠকামি করার মানেটা কি? আমি তোমার ইয়ার নাকি?

আমতা আমতা করে পাঁচু বলল, রাগ করছেন মানিকদা। আমি মরে গেছি জেনে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছিলেন—যখন দেখলেন মরিনি, বেঁচে আছি তখন অসুখী হলেন। আমার জীবনের চেয়ে তাহলে মৃত্যুই ...

বিরক্ত হয়ে বললাম, দেখ পাঁচু ওসব ভাঁওতার কথা শুনতে ভালো লাগছে না আমার। আমাদের ঐ চিঠি দিয়ে মিছিমিছি অমন উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলে কেন, সেই কথাটাই সোজা ভাষায় বল ত। আমার কাজ আছে, সময় নষ্ট করতে পারব না।

পাঁচু বলল মানিকদা, আপনি ত জানেন, জীবনে কত স্ট্রাগল করেছি। আশা ছিল, দেশ স্বাধীন হলে একটা ভালো চান্সও পাব হয়ত। স্বাধীনও হল দেশ, চান্সও পেল বহু বহু লোক—পচা পাচকো ন্যাংড়া ভেংড়ো, যে যেখানে ছিল সে-ই কাজ গুছিয়ে নিল। কিন্তু কিছুই হল না আমার। জীবনে বীতস্পৃহ হয়েই তাই শেষটা আত্মহত্যা করার ইচ্ছা উঁকি দিতে লাগল মনে। কি হবে বেঁচে থেকে? কি মানে হয় এই জীবনের?

আমার মুখ থেকে অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে গেল ফু-উ-উ-ল কোথাকার। সামলে নিয়ে বললাম, আচ্ছা তারপর

পাচু বলল, দাশুকে চেনেন ত। অঞ্জুদির দেওর। সে ত কেমিস্ট্রির ডিমনস্ট্রেটর ধরিপাটি দিয়ে তারই কাছ থেকে বাগিয়ে আনলাম কয়েক গ্রাম পটাসিয়াম সায়ানাইড, বললাম, একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছি। গোবেচারী মানুষ দিয়ে দিল কোনরকম সন্দেহ না করেই। ফায়েলটা বাক্সে রেখে ঠিক করলাম আর একবার দেখব শেষ চেষ্টা—কিছু হল ত ভালো। নইলে আর কোন কথা নেই, সোজা ভক্ষণ ও মরণ।

আমি বললাম, তারপর বল।

পাচু বলল, তারপর আর কি। হল না কিছুই। কাজকর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু না। ফলে সত্যি খুন চড়ল, মাথায়। মনকে তৈরি করে ফেললাম। সেই যে বিবৃতির কথা লিখেছিলাম, সেটা রচনা করলাম। দুটি কপি করলাম তার, খামে ভরে সিল করলাম পাণ্ডুলিপি দুটো। আপনাকে চিঠি লিখে তা ডাকে দিলাম। এনসাইক্লোপিডিয়া খুলে দেখলাম, মেজোকাকার ঘরে গিয়ে, ক্রিয়া সম্বন্ধে কি লিখছে। লিখছে, মুখে দেওয়ার পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই লালার সংমিশ্রণে রক্তবাহী ধমনীতে গিয়ে হাজির হয় এবং আরো পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে শোণিতকোষগুলিকে বিদীর্ণ করে, হৃৎপিণ্ডে…

বাধা দিয়ে বললাম, ওসব পণ্ডিতী তত্ত্ব থাক। তারপর কি হল তাই বল।

পাচু বলল, খেয়ে ফেললাম আর কি তারপরে, রাত্রিতেও খাওয়া-দাওয়া সেটার পর।

তারপর ?

তারপর কিচ্ছু না মাণিকদা। চোখ নিস্পন্দ, শ্বাস ত্বরিৎ, হৃৎপিণ্ড উদ্বেল, জিহ্বা শুষ্ক এবং মুহূর্তে জীবনাবসান যা কিছু লিখেছে বইয়ে, সব ঝুটো প্রমাণ হয়ে গেল। বুঝলাম, আর যাতেই হক, ওতে মৃত্যু হয় না। আরো বুঝলাম জিনিসটা স্বাদ-গন্ধহীন নয়, একটু মিষ্টি-মিষ্টি স্বাদ আছে—আর কেমন একটা হাল্কা ধরনের গন্ধও আছে যেন!

এই পর্যন্ত বলেই পাচু পিটপিটে চোখ বার করে আমার দিকে তাকাল। বলল বুঝলেন তা আসল ব্যাপারটা মাণিকদা! ধাপ্পা দিইনি আমি, সত্যিই মরতে গিয়েছিলাম। হল না মৃত্যু, সে আমি কি করব ?

তারপর একটু দম নিয়ে বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বললো, এখন অবশ্য সে ফেজটা কেটে গেছে। ও ত একটা সাময়িক পাগলামি, ও আর কতক্ষণ থাকে ? আপনিই বলুন না মানিকদা!

বলা বাহুল্য, বিশ্বাস করলাম। কিন্তু শুনে শুম্ভিত হলাম। বললাম, সেই

ফায়েলটা কোথায় ? আমাকে দাও ত । নিশ্চয় কিছুটা তাতে এখনো আছে ।

কি করবেন মানিকদা ?

দাও না, কাজ আছে ।

পাঁচু বলল, বিশ্বাস করছেন না বুঝি ? মানিকদা, পাঁচু মিথ্যেবাদী নয় ।

উঠে দেরাজ খুলে পাঁচু বের করল একটি বেঁটে গোছের নীল রঙের শিশি । তার গায়ে ছাপানো লেবেল অাঁটা । ওষুধের নাম, ব্যবহারের হুঁসিয়ারী, নির্মাণকারী কোম্পানির ঠিকানা···অনেক কিছুই আছে তাতে, সবুজ-লাল রকমারি রঙে ছাপানো ।

শিশিটি পকেটে পুরে নেমে এলাম হুড়হুড় করে সিঁড়ি বেয়ে । বলা বাহুল্য, এখন আর রাগ নেই, তার স্থানে সীমাহীন বিস্ময় আমাকে একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছে ।

বিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত ডাঃ খালেদ আমার সহপাঠী । প্রথম বয়সে দুজনে একসঙ্গে গঙ্গাগোবিন্দ কলেজে প্রফেসারিও করেছি । এখন খালেদ করেন এক ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিতে গবেষকের কাজ, আমি করি সংবাদপত্রের সম্পাদকী, কিন্তু বন্ধুত্বটা আজো অব্যাহত আছে দু-জনের । তাঁর কাছে ছোট্ট একটা চিঠিতে পাঁচুর কাণ্ডকারখানা জানিয়ে শিশিটা পাঠিয়ে দিলাম পরীক্ষার জন্যে ।

দুদিন পরে খালেদ শিশি ফেরত পাঠালেন, সেই সঙ্গে এল চিঠিটা :

ভাই মানিক,

ভেতরের বস্তুটা সায়ানাইড নয়, নিতান্তই সুগার অব মিল্ক । কেউ যদি ক্যাপস্যুল খুলে, সায়ানাইড বের করে নিয়ে শিশিতে সুগার ভর্তি করত, তাহলে সেই সুগারেও প্রাণনাশ হতে পারত । আসলে এতে সায়ানাইড কোনদিন প্রবেশই করেনি । আজ তেলে শেয়ালকাঁটা, চিনিতে কাঁচের কুচি, ময়দায় সাবুনে পাথরের গুঁড়ো কুইনিনে চক, ইনস্যুলিনে কেরোসিন, ঘিয়ে চিনি । অর্থাৎ মানিক ভাই, স্বাধীন ভারতে আজ কিছু খেয়ে বাঁচাই শুধু অসম্ভব নয়, কিছু খেয়ে মরাও সমান অসম্ভব বুঝলে । ইতি,

তোমার খালেদ ।

হোলি আর্থ

কদিন থেকে সাইটিকার ব্যথাটা চাগাড় দিয়ে উঠেছে। ভারী কষ্ট পাচ্ছি উঠতে বসতে।

অন্যান্য বছর এই সময়টায় কলকাতার বাইরে পালাই। হয় সমুদ্রের ধারে নয় জঙ্গল মহলে গিয়ে মাসখানেক থাকলেই শরীরটা ঠিক হয়ে যায়।

এ বছর দেরিতে পরীক্ষা হয়েছে। তাই একরাশ খাতা ঘাড়ে চেপে আছে। তা ছাড়া একটি ছাত্র বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু তত্ত্ব নিয়ে ডক্টরেট করছেন, তাঁর থিসিস পেশ করার সময় আসন্ন। রোজই তাঁকে নোটটোট দিতে হচ্ছে।

কাজেই পিঠে গরম জলের বোতল ও বুকে বালিশ আঁকড়ে প্রাণের দায়েই এবার কলকাতায় পড়ে থাকতে হয়েছে।

সকালবেলা ঐ থিসিসটা নিয়েই বসেছি, ইতিমধ্যে ভাগনে প্রতাপের আবির্ভাব হল।

প্রতাপ তুখোড় ছেলে। অল্পদিন চার্টার্ড একাউন্টেন্সি করেই খাসা কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। বলিয়ে কইয়ে হিসাবেও তার জুড়ি কমই মেলে।

ঘরে ঢুকেই প্রতাপ বলল, কি ছোট মামা, সেই বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছ তো?

খাতা থেকে চোখ না তুলেই বললাম, হ্যা রে, কষ্ট কি একটু-আধটু? জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে।

আস্তেব্যস্তে প্রতাপ বলল, কেন মিছিমিছি ভুগছ? এক পুরিয়া হোলি আর্থ খেয়ে নাও, স্রেফ ম্যাজিকের মতো কাজ করবে।

সবিস্ময়ে বললাম, হোলি আর্থ আবার কি রে?

প্রতাপ যেন আকাশ থেকে পড়ল। চোখ বড় বড় করে সে বলল, কি কাণ্ড ছোট মামা! এতবড় জবর পণ্ডিত তুমি, ত্রিভুবনের এত খবর রাখ, আর হোলি আর্থের নাম শোননি?

অজ্ঞতা স্বীকার করতেই হল।

প্রতাপ বলল, আম্বালায় শেঠ রামটহল দাসজীর যে বাড়িতে প্রভু পুরুষোত্তম ঘাতকের ছুরিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন, তারই উঠোনের মাটি।

এবার আমার চোখ বড় করার পালা।

বললাম, পেতাপ, তুই না একটা সায়েন্সের ছাত্র! তোর বাবা না একটা নাম করা ডাক্তার ছিল! এসব ভূতুড়ে কথা কি বলছিস তুই?

প্রতাপ করুণার হাসি হেসে বলল, ছোট মামা, দিনরাত্রি বস্তুবাদ নিয়ে খচর মচর করতে করতে তুমি বড় বেশি বিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছ। যতই কেননা পণ্ডিত হও তুমি, তুমি তো একজন ভেতো বাঙালী। ইংরেজ ফরাসী জার্মান ইটালীয়ানরাও সবাই ঘাড় হেঁট করে কবুল করেছে এই মাটির কিস্মত।

—কি রকম?

—আমার কাছে টাইমস, লা মঁদ, ডয়েশল্যাণ্ড দাগ ব্লাফেত, দাপুপোলো ইতালিয়া নানা কাগজের কাটিং আছে। দেখাতে পারি তোমাকে।

—ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপারটা অদ্ভুত! প্রভুজী পুরুষোত্তম দেহরক্ষা করলেন যেদিন, ঠিক তার সাতদিন পরে রামটহল দাসজীকে তিনি স্বপ্নে বললেন, যে বাড়িতে আমার মৃত্যু হল, সেটা জাতির হাতে দান করে দাও। ওখানে তারা গ্রন্থাগার, অনাথাশ্রম, ধর্মমন্দির, যা ইচ্ছে করতে পারে।

—তারপরে?

তারপর আর কি? রামটহলজী সম্মত হলেন। তখন প্রভু বললেন, এই উঠোনের মাটি সাত দিন পর্যন্ত দৈবগুণসম্পন্ন থাকবে। এই সময়ের মধ্যে উঠিয়ে নিলে, লক্ষ বৎসর পর্যন্ত তা সর্বরোগহর ওষুধের কাজ করবে। সাতদিন পরে যে মাটি আবার সেই মাটি হবে! তখন বাড়িটা তুমি খয়রাতি করবে।

একদমে এতখানি কথা বলে প্রতাপ একটা ঢোঁক গিলে পাশের চেয়ারে চেপে বসল, মস্ত একটা বীরের মতো মুখ করে।

আমি বললাম, ঐ মাটিই বুঝি তোর হোলি অর্থ?

কথা কেড়ে নিয়ে প্রতাপ বলল, হ্যাঁ ছোট মামা। পুরো এক কোটি পুরিয়া এর চলে গেছে পৃথিবীর সমস্ত দেশে।

—কোন্ কোন্ দেশে?

—কার আর আলাদা করে নাম করব? সব দেশেই। কোন্ দেশের কোটা কত, তা তো প্রভুজী নিজে বলে দিয়েছেন।

—তা তোর এই পুরিয়ার দক্ষিণে কত?

—কি বল তার ঠিক নেই! দক্ষিণা টক্ষিণা নয়, হনুমানজীর শিকায় পঁচাত্তর পয়সা মাত্র!

আর সংযম রক্ষা করতে পারলাম না। হো-হো করে হেসে উঠলাম।

প্রতাপ বিরক্ত হয়ে বলল, হাসছ কেন? সবই বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায়

না ছোট মামা, দুনিয়ায় মিরাকল চিরদিন আছে···চিরদিন থাকবে।

আমি বললাম, সেজন্য হাসছি না রে। হাসছি অন্য কারণে। আম্বালায় রামটহল দাসের বাড়ি আমি দেখেছি। খুব বেশি হলে তার দাম চার পাঁচ লাখ টাকা। এই পুরিয়া বাবদ তারা ওঁদের পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। লাভ হল নগদ সত্তর লক্ষ টাকা, আবার জাতির কল্যাণে দানও করা হল বাড়িটা!

এবার চটে উঠল প্রতাপ। বলল, না, তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তুমি একেবারে নাস্তিক হয়ে গেছ। মানুষের কোন মহৎ কাজেই তোমার প্রত্যয় নেই!

আমি বললাম, চটিস নে বাবা, একটা পুরিয়া বরং তোর মামীকে এনে দে। তাঁর পায়ের হাজা ও গালের মেচেতাগুলো সেরে যায় যদি, তাহলে বিশেষ খুশী হবেন মহিলা।

প্রতাপ বলল, অত ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় নয় এটা। অসিতানন্দ কানুনগো, বিখ্যাত ল্যাণ্ড স্পেকুলেটর···ভদ্রলোক অম্লশূলে না খেয়ে খেয়ে নেংটি ইঁদুর হয়ে গিয়েছিলেন। মাত্র পরশু দিন আমার পাশে বসে, কি বলব ছোট মামা, পুরো এক প্লেট ফ্রায়েড রাইস এবং ইয়া বড় এক ক্যাপন রোস্ট সাঁটালেন! প্রেমাশীষ ঢোল এককালের নাম-করা বক্সার, ঠিক তোমার মত সাইটিকায় একেবারে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন·· এই শনিবারে তিনি আবার নামছেন রিং-এ নিগ্রো বক্সার ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে। আরো বলতে পারি দু-ডজন···

বাধা দিয়ে বললাম, আর বলতে হবে না। এবার আমাকে একটু কাজ করতে দে। বলেছি তো, যদি বিশ্বাস আর ভক্তি দেখাতে চাস তাহলে তোর মামীর কাছে যা।

এবার হে-হে করে হেসে উঠল প্রতাপ। বলল, ও আর তোমাকে বলে দিতে হবে না ছোট মামা। হোমফ্রন্ট আগেই দখল হয়ে গেছে। মামীমা তিন পুরিয়া যোগাড় করেছেন: একটা তোমার জন্যে, একটা তাঁর মাথা ধরার জন্যে, আর একটা ভবিষ্যতের জন্যে।

চোখ কপালে তুলে বললাম, প্রতাপ, তুই নিজেও জাহান্নামে গেলি, আর পাঁচজনকেও দিলি! জানিসই তো তোর মামীর ··

কিন্তু মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ঘরে এসে ঢুকলেন স্বয়ং গৃহিণী। তাঁর ডান হাতে একগ্লাস জল, বাঁ হাতে একটি কাগজের প্যাকেট। বললেন, তখন থেকে কি গ্যাজর-গ্যাজর করছ এত পেতাপের সঙ্গে?

আমতা আমতা করে বললাম, না এই একটা মাটির বিষয়ে কথা হচ্ছিল।

গিন্নী বললেন, দরজার ওপিঠ থেকে আমি সব শুনেছি। দেব-দ্বিজ, গুরু-পুরুত, ঠাকুর-দেবতা সব নিয়েই তোমার ঠাট্টা। বারোমাস বাতের ব্যথায় কোঁ-কোঁ করে কাতরাচ্ছ। তবু তো শিক্ষে হয় না!

অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, তুমি তো কিছুতেই ঠাট্টা কর না। তবে বারোমাস তুমিই বা মাথার যন্ত্রণায় এত ছটফট কর কেন?

প্রায় রোদনের স্বরে গিন্নী বললেন, সে আমার কপালের দোষ। কপাল না হলে এমন অলুক্ষুণে ঠাকুর আর এমন হাড়-জ্বালানে কাজের লোক জুটবে কেন? বকে বকেই মাথার দফা রফা! তারপর অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বললেন, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর কর, বয়স হয়েছে, এখন আর আজেবাজে কথা বল না অমন! নাও, টুক্ করে খেয়ে ফেল এটা।

বলেই জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন তিনি হাতের কাছে এবং পুরিয়াটি খুলতে শুরু করলেন।

পাঠক-পাঠিকা, বুঝলেন তো এবার, স্বনামধন্য যুক্তিবাদী অধ্যাপক রামগতি পাকড়াশী এম-এ, পি-আর এস, ডি-লিট মহোদয় এরপর কি করলেন? সোনা মুখ করে সেই হোলি অর্থে ভক্ষণ করলেন!

মকরন্দ মহিমা

মহর্ষি মকরন্দের নিরবচ্ছিন্ন সাধনাতেই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, এ বিষয়ে তাঁর শিষ্যদের তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

এবৎসর মহর্ষির সপ্তরতম জন্মোৎসব। আলমোড়া আশ্রমে এবার তাই মহা ধুমধাম হচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকা এবং এশিয়ার নানা দেশ ঝেঁটিয়ে নামজাদা মানুষরা আসছেন।

আসছেন বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ধর্মজ্ঞ ও সাহিত্যিকরা। এমন যে নাস্তিক রুশরা, তাদেরও একজন প্রতিনিধি আসছেন বলে কাগজে দেখেছি।

কৌতূহলী হয়ে একটা কিটব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দেশের এতবড় একজন সাধককে একবার চোখেও না যদি দেখে রাখি, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে।

ছোট্টবেলা থেকে শুনে আসছি মহর্ষি মকরন্দের গল্প।

রাজনীতি করতে করতে কি করে তাঁর মনে বৈরাগ্যোদয় হল সে কাহিনী বলতেন ক্ষেত্র জ্যাঠামশায়।

তাঁরই কাছে শুনতাম, মহর্ষি কিছু খান না, চান করেন না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর খালি ধ্যানমগ্ন থাকেন।

মাঝে মাঝে যখনই ধ্যান ভাঙে, তখনই তাঁর মুখ দিয়ে গ্রীক-ল্যাটিন মিশ্রিত কঠিন কঠিন ইংরেজিতে এমন সব তত্ত্বকথা অনর্গল বের হতে থাকে, যা যোগেশ্বরী ছাড়া কেউ ধরতে বা নোট করতে পারেন না।

এই যোগেশ্বরীর গল্পই কি কম শুনেছি?

শুনেছি তিনি জার্মান কন্যা। স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন ভারতবর্ষ দেখতে।

আলমোড়ায় এসেই দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল তাঁর। তিনি জানতে পারলেন, গত জন্মে তিনি ছিলেন ভারতীয়া এবং মহর্ষি মকরন্দই ছিলেন তাঁর প্রভু ও ভর্তা।

স্বামীকে তিনি বললেন, বিল, ডিয়ার, তুমি দেশে ফিরে যাও। আমি যে অমৃতের আহ্বান পেয়েছি, তারই সন্ধানে চললাম। আমাকে আর তুমি পাবে না।

তাঁর স্বামী ফ্রেয়ার ছিলেন ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যাপার-স্যাপার বুঝে তিনি সরে পড়লেন। তখন থেকে মিসেস ফ্রেয়ার হলেন যোগেশ্বরী এবং আশ্রমের মাতৃ-কর্তব্য চলে গেল তাঁর হাতে।

পিতা মকরন্দ ও মাতা যোগেশ্বরীর যুগল রূপের ফোটো একখানা অনেকের মতো আমাদের ঘরেও ঝোলানো আছে বহু দিন থেকে।

আলমোড়ার মতো জায়গায় নভেম্বরের রাত্রে বারান্দায় পড়ে থাকা কি ব্যাপার, তা নিশ্চয় কাউকে বোঝাতে হবে না। কিন্তু হাজার হাজার নরনারী অম্লান বদনে সেই দুঃসহ কষ্ট সইতে লাগলেন। কষ্ট ভিন্ন ত কেষ্ট মেলে না।

প্রায় অনাহারে ও সম্পূর্ণ অনিদ্রায় রাত্রিটা কাটিয়ে সকাল হতে না হতেই সকলের সঙ্গে এসে দাঁড়ালাম আশ্রমের প্রশস্ত উঠানে। তখনই সেখানে জমে গেছে হাজার হাজার লোকের ভিড়!

সেখান থেকে দোতলার লম্বা বারান্দাটা দেখা যায়। এই বারান্দাতেই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হবেন মহর্ষি মকরন্দ, যিনি শৌর্য ও সন্ন্যাসের মিলিত বিগ্রহরূপে গোটা ভারতের হৃদয়াকাশে জেগে আছেন প্রচণ্ড মার্তণ্ডের মতো!

মাইকে একটা প্রার্থনা ধ্বনিত হতে লাগল। আওয়াজে মনে হল ভাষাটা ল্যাটিন। তারপরই ইংরেজিতে একটা ঘোষণা প্রচারিত হল, যার মর্ম এই যে আপনারা কেউ কথা কইবেন না। ছবি নেবার চেষ্টা করবেন না। করতালি দেবেন না। ইচ্ছা করলে শুধু হাত জোড় করতে পারেন।

সমবেত কণ্ঠে একটা বৈদিক স্তোত্র শুরু হল, তারই সঙ্গে মাঝখানকার ঘরের নীল পর্দা সরিয়ে দেখা দিলেন স্বয়ং মহর্ষি মকরন্দ। সত্যিই যেন সূর্যোদয় হল মাটিতে।

মাথা ভরা তুষার শুভ্র ঘন চুলের রাশি। মুখে পর্যাপ্ত গোঁফদাড়ি। সারা দেহ থেকে ঠিকরে পড়ছে রৌদ্রোজ্জ্বল অভ্রের মতো আশ্চর্য একটি দ্যুতি!

পরণে কোঁচানো গরদের ধুতি। অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গের রং বিশুদ্ধ কাঁচা সোনার মতো। সেই সোনার ওপর এসে পড়েছে সকালের সোনালি আলো।

স্তোত্রগান থেমে গেল। একমুখ হাসি নিয়ে ডান হাতখানি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে জনতার দিকে প্রসারিত করে এসে দাঁড়ালেন মহর্ষি।

মুগ্ধ বন্দনার স্তবগুঞ্জন উঠল ভিড়ের ভেতর থেকে। কোন-কোন অত্যুৎসাহী সমস্ত নিষেধ লঙ্ঘন করেই ক্যামেরা তাক করলেন তাঁর দিকে। ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলতে লাগল একের পর এক।

যুক্তকরে হাজার হাজার নরনারীও চেঁচিয়ে উঠলেন, জয় মহর্ষি মকরন্দদেব!

কিন্তু চোখের নিমেষে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব এবং কেমন করে হল, তা বুঝতেও পারলাম না ভালো করে।

একমাথা বাবরি চুলওলা রোগা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক সবাইয়ের চোখকে ফাঁকি

দিয়ে কেমন করে জানি না দোতলার বারান্দায় এসে হাজির হলেন এবং দু-হাতে জাপ্টে ধরলেন মকরন্দকে।

বললেন, ও চালাকি চলবে না চাঁদ। তোমার সমস্ত গুমোর ফাঁক করে দোব আজ।

বলেই দিলেন তিনি দাড়ি ধরে এক টান। কৃত্রিম চুল দাড়ি খসে পড়ল।

জনতার দিকে মুখখানা ফিরিয়ে দিয়ে সেই বাবরিওয়ালা বললেন, মশাইরা, আপনারা কি চিনতে পারেন এঁকে? ইনি হলেন বিখ্যাত অ্যাক্টর গণেশ ভক্ত। আর আমি কে জানেন? আমিও আপনাদের প্রিয় প্রাণবল্লভ মাইতি।

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন উঠানের সমস্ত মানুষ ঘটনার এই আকস্মিক নাটকীয় পরিবর্তনে।

এবার তাঁরা ধর-ধর, মার-মার করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। একদল পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলেন। একদল একতলার বন্ধ ঘরগুলোতে দমাদ্দম লাথি লাগাতে শুরু করলেন।

সেই গণ্ডগোলের মধ্যেই গলা চড়িয়ে প্রাণবল্লভ মাইতি বললেন, আপনারা শুনে রাখুন মকরন্দ-ফকরন্দ কেউ এখানে নেই। প্রতি বছর এই তারিখে আমরা কেউ-না-কেউ এসে মেক-আপ করে বারান্দায় দাঁড়াই। এবারও আমার কাছেই প্রথম লোক গেছল এবং আমি পাঁচশো চেয়েছিলুম, তাইতেই গণশা ব্যাটাকে নিয়ে এসেছ…

একতলা দোতলায় তখন কুরুক্ষেত্র বেধে গেছে। হুড়মুড় করে চেয়ার টেবিল ভেঙে পড়ছে। ঝন-ঝন, খন খন করে চুরমার হয়ে যাচ্ছে আলমারি, বুককেস, আয়না।

যে যাকে পাচ্ছে বেদম কিল-চড় আর লাথি লাগাচ্ছে।

একদিকে উঠছে ক্রুদ্ধ গর্জন, আজ খুনই করে ফেলব সবকটাকে। পঁচিশ বছর ধরে লোককে ধাপ্পা মারা! অন্যদিকে আর্তনাদ উঠছে, আর মারবেন না স্যার, মরে যাব!

নিছক পেটের দায়ে চাকরি করে যাচ্ছি আমরা, আমাদের ছেড়ে দিন স্যার… করজোড়ে বলতে লাগলেন মেয়েরা!

ডেপুটি মকরন্দ নীলাম্বরবাবু প্রাণের ভয়ে একটা তক্তাপোষের তলায় লুকিয়েছিলেন। তাঁকে হিড় হিড় করে টেনে বের করল কয়েকটা ছোকরা।

প্রকাণ্ড এক ঘুষি পিঠে বসিয়ে একজন বলল, বল শিগ্গির, এ বদমাইসির মানেটা কি? বল, নইলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন নীলাম্বরবাবু, বলছি, বলছি। হাঁপানির রুগী আমি, এক্ষুনি মারা যাব। একটু দম নিতে দিন আগে।

খানিক ধাতস্থ হয়ে তিনি বললেন, আসল মকরন্দ যিনি, তিনি সেই সত্যপীর চটির ডাকাতিতেই মারা যান পুলিশের গুলিতে। আমরা তাঁর চেলারা দেহটা সরিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর এখানে পালিয়ে এসে এই আশ্রম করেছিলাম···বুঝতেই পারছেন, তা ভিন্ন আমাদের জীবিকার উপায় কি ছিল!

মকরন্দ মিথটা চালাল কে? একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল তিন-চারজন।

নীলাব্জবাবু বললেন, চালিয়েছিলাম আমরাই। একটা ঘর বন্ধ করে রেখে বলতাম, তিনি ধ্যানমগ্ন আছেন। কারো সঙ্গে দেখা করেন না। তারপর এটাকে ব্যবসায় টার্ন করাল যোগেশ্বরী। সে ঐ ঘরে ঢুকে বসে বসে লিখত, আর মকরন্দের বাণী বলে সেগুলো ছাপাত!

—অ্যাঁ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আর যাই হোক, লেখা-পড়া জানত মহিলা। কি রকম জবর বই লিখেছে সব!

জনতা চীৎকার করে উঠল, কৈ, কৈ সে? ধরে আন তাকে, নাক কান কাটব।

নীলাব্জবাবু বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললেন, তাকে আর কোথায় পাবেন? দু-স্যুটকেস ভর্তি টাকা-পয়সা ও মণি-মুক্তো নিয়ে সে গোলযোগ দেখেই চম্পট দিয়েছে গাড়ি হাঁকিয়ে। কাল সন্ধ্যে নাগাদ হয়ত ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছে যাবে!

কিটব্যাগ ঘাড়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। লাভের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পায়ে একটা চোট লেগেছিল, যে ব্যথাটা বয়ে আনতে হল আলমোড়ার স্মৃতি হিসাবে।

একা কাহিনী

[প্রায়-সত্য একটি ঘটনা]

হাড়গোড় ভাঙা পুরানো একা একখানা। চাকার অংশটা বাদ দিলে দেখতে অনেকটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো।

বাগানের মধ্যে ঢুকে দেখলাম ধনেশবাবু সাগ্রহে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, মাত্র পঁচিশ টাকায় কিনেছি নিলামে। কেমন হয়েছে বলো ত গগন?

বললাম, ভালোই হয়েছে। কিন্তু এই চরচরে একা আপনি কি করবেন স্যার?

দেখো না কি করি, বলেই বুঝি-বুঝি মুখ করে একটু একটু হাসতে লাগলেন ধনেশবাবু।

বললেন, কোম্পানির আমলে সাহেবরা সব পালকিতে যাওয়া-আসা করতেন। একবার পালকি বেহারারা দক্ষিণার রেট নিয়ে শহরে ধর্মঘট বাধায়। ল্যানডো বলে এক সাহেব তখন পালকির নীচে চারখানা চাকা লাগিয়ে, তাতে ঘোড়া জুতে পত্তন করলেন ঘোড়ার গাড়ির।

ভয়ে ভয়ে বললাম, পালকি গাড়ীর উৎপত্তি বুঝি এই থেকেই?

—হ্যাঁ, আর সেই জন্যেই তার আর এক নাম হল ল্যানডো গাড়ি।

— কিন্তু স্যার আপনার এ ত একা।

— হ্যাঁ, এ আমাদের নিজস্ব জিনিস। উত্তর ভারতে এর নাম টাঙা। কেষ্টনগরে আবার দেখবে গোরুর গাড়ির প্যাটানের একরকম গাড়ি আছে, তাতে ঘোড়া জোতে। তার নাম ঘোগের গাড়ি।

—ঘোগ? সুন্দরবনে ত ঘোগ বলে কাঁকড়ায় ফুটো করা আলের গর্তকে।

—তা বলে। কিন্তু কেষ্টনগরের ঘোগ হল একটা যৌগিক শব্দ, ঘোড়ার ঘো আর গোরুর গ…

—দুইয়ে মিলে ঘোগ?

—আরে হ্যাঁ। কিন্তু আমার এটা তা হবে না। আমি একে পুরোপুরি একাই বানাব।

—কেন স্যার?

—দেখো কাণ্ড! তুমি একটা শিক্ষিত ছেলে, ডক্টরেটের রিসার্চ করছ। গাড়ি লোকে করে কি জন্যে?

চুপ করে গেলাম। সাবেকী বাংলার রন্ধন প্রণালী নিয়ে গবেষণা করছি ধনেশবাবুর অধীনেই। তাঁকে চটিয়ে আমার লাভ নেই।

বোকা-বোকা মুখ করে বললাম, ভালোই হবে স্যার। তবে কিছু খরচ হবে আপনার।

একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতে লাগলেন ধনেশবাবু।

হাসতে হাসতেই বললেন, দেখো ত আমার কসরত। মিনিমাম খরচেই একে আমি খাড়া করে তুলছি।

দিদিমার অসুখের খবর পেয়ে দিন-সাতেকের জন্যে বহরমপুর গিয়েছিলাম।

ফিরে এসে দেখলাম গাড়িটায় ছই লাগানো হয়েছে। সে ছই কিসের জানেন? বাঁকারির ছতারির ওপর ত্রিপলের ঘেরাটোপ। লম্বা দুটো বাঁশের জোয়াল লাগানো হয়েছে, তাতে লোহার কড়া পরিয়ে। সব চেয়ে নূতনত্ব দেখলাম গোটা গাড়িতে লেপা হয়েছে সবুজ রং এবং চাকার শিকগুলোয় দেওয়া হয়েছে লাল রং।

বারান্দায় বসে ধনেশবাবু কি যেন করছিলেন। আমাকে দেখেই তড়বড় করে নেমে এলেন একটা বালতি হাতে নিয়ে।

বললেন, দেখছো কেমন খোলতাই হয়েছে গাড়িটা? মাত্র আড়াই টাকায় করিয়েছি।

মুখ চোখে প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললাম, খাসা হয়েছে স্যার।

তিনি বললেন, কিন্তু আসল জিনিসই এখনো দেখাইনি তোমাকে। এসো…

খিড়কিতে একটা হাজা-মজা পুকুর। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সন্তর্পণে তার পাড়ে এসে দেখলাম, দু-হাত উঁচু একটা টাট্টু ঘোড়া, সামনের দু-পায়ে ছাঁদ নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘাস খাচ্ছে।

অবাক হয়ে বললাম, এটা কোথায় পেলেন স্যার?

স্যার বললেন, সরিবার রাখালরাজ কবিরাজ দান করেছেন ওটি। আমাকে ভারী শ্রদ্ধা করেন ভদ্রলোক।

বললাম, কিন্তু স্যার, ওকি গাড়ি টানতে পারবে? শেষটা একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

হা-হা করে হেসে উঠলেন ধনেশবাবু। বললেন, পরীক্ষা হয়ে গেছে তার। ঠাকুরপুকুর থেকে সরবেহাট কম করেও আট মাইল। আমাকে, কার্তিক, ক্ষেত্তর আর বিলুকে নিয়ে গেল আবার ঘুরিয়ে আনল, মাত্র কালই এই ঘোড়া।

হাতের বালতিতে ছিল পোয়া দেড়েক ভিজে ছোলা। সেটা মুখের কাছে ধরলেন ঘোড়াটার। গদ গদ গলায় বললেন তারপর, খারে মোহন, খা।

আমি বললাম, ওর নাম কি মোহন?

তিনি বললেন, আমি দিয়েছি। কি জানো ইউনিভার্সিটি থেকে রিটায়ার করে যখন ঠাকুরপুকুরে বাড়ি করি, তখন একটাই ভাবনা হয়েছিল, আনাগোনার কি হবে। সেটা এবার দূর করল মোহন। লক্ষ্মী ঘোড়া আমার···

বলেই পিঠে থাবা মারতে লাগলেন তিনি মোহনের।

আমতা আমতা করে বললাম, ওর স্যার জন্ম সরষেয় এবং এদিকে ডায়মণ্ডহার্বার, ওদিকে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত মাত্র আনাগোনা করেছে ও। খাস কলকাতার রাস্তায় কি করবে তার ত ঠিক নেই।

উল্লসিত হয়ে বললেন ধনেশবাবু, তার পরীক্ষাও হবে এই শনিবারে। একটি বন্ধুকে চায়ে নিমন্ত্রণ করেছি।

—তাঁর বাড়ি কোথায়?

—এই ত আলিপুরে।

দিন দশেক পরে এসে দেখি বাগানের ভেতর গাড়িখানা নেই। একটেরে টিন দিয়ে ঘোড়ার জন্যে যে আস্তাবল বানানো হয়েছিল, তাও ফাঁকা।

বারান্দায় বসে ক্ষেত্তর একরাশ গাছপালা হামানদিস্তায় ছেঁচছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, স্যার নেই?

কিছু না বলে সে শুধু আঙুল দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখিয়ে দিল।

ঘরে তক্তপোষে শুয়ে আছেন ধনেশবাবু। সর্বাঙ্গে, মাথায়, বুকে, হাতে পায়ে তাঁর ব্যাণ্ডেজ। একা একা কাতরাচ্ছেন।

আমাকে দেখে করুণ কণ্ঠে বললেন, এসো গগন।

ব্যস্ত হয়ে বললাম, কি হয়েছে স্যার?

প্রায় কান্নাভেজা গলায় বললেন ধনেশবাবু, ঐ ঘোড়া হারামজাদা···

—ঘোড়ায় কি এইরকম করে কামড়েছে?

মেঘভাঙা রোদ্দুরের মতো মৃদু একটু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে।

বললেন, কামড়াবে কেন? গাড়ি শুদ্ধ তুলে আছাড় মেরেছে।

বললাম, সে কি স্যার?

—আরে হ্যাঁ। বলেছিলাম না যে গত শনিবারে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলাম এক বন্ধুকে। তিনি কে জানো ?

নিজেই বললেন, এককালের বিখ্যাত পুষ্পলতা সেন। আমাদের যুবা বয়সে কি গ্ল্যামারই ছিল তাঁর ! দ্বিজেন্দ্রলাল, জগদীশ বোস, সি. আর. দাস প্রভৃতির মহলে চলাফেরা করতেন। আমরা ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারতাম না কোনদিন।

একটু দম নিয়ে বললেন, কিন্তু সে হল চল্লিশ বছর আগের কথা। এখন একেবারেই বদলে গেছেন মহিলা। দেখা হল মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনে ··

—চায়ের নিমন্ত্রণটা কি করলেন তখনই ?

—হ্যাঁ। বললেন, বাতে নড়তে পারি না। যাবার সময় যাব নারী সমিতির গাড়িতে। ফেরার সময় কিন্তু গাড়ির ব্যবস্থা করবেন আপনি।

—আচ্ছা !

—সেই ফেরবার পথেই ঘটল বিপদ। দুজনে পাশাপাশি বসেছি গদীতে। কোচবাক্সে বসেছে কার্তিক। গোধূলি বেলা। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। টুকটুক করে চলেছে গাড়ি। হঠাৎ মাঝেরহাট পুলের কাছে এসেই···

—কি হল ? ভেঙে পড়ল ?

—আরে, না, না। পিই-ই-ই করে বেজে উঠল হুইসিল···

—কিসের ?

—কালিঘাট-ফলতা লাইনের সেই খোকা রেলের। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ঘোড়া দিল গাড়ি নিয়ে এক লাফ।

—তারপর ?

চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেন পুষ্পলতা রাস্তা থেকে হাত তিনেক নীচু পগারের মধ্যে, আর আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তাঁর দেহের ওপর। কার্তিকটা পড়ল হাঁটু মুড়ে মা-দুর্গার সামনে অসুরের মতো হয়ে !

একটা ঢোক গিলে বললেন ধনেশবাবু, কি লজ্জা বলো ত !

—তা গাড়িটা কি করলেন স্যার ?

—গাড়িটা পরশুদিন বেচে দিয়েছি দুশো পঁচিশ টাকায়।

—আর ঘোড়াটা ?

—ঘোড়াটাও বেচেছি পঁচাত্তর টাকায়।

—তাহলে মবলকে তিনশো টাকা লাভ হয়েছে আপনার। অবশ্য প্রচণ্ড চোটও খেতে হয়েছে সেই সঙ্গে।

হঠাৎ মুখ-চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ধনেশবাবুর আশ্চর্য কি-এক দ্যুতিতে।

তিনি বললেন, ও-লাভও কিছু না, ও-চোটও নগণ্য। সব জিনিসের পিছনেই আছে একটা হেতুবাদ, বুঝলে গগন।

দু-চোখ বুঁজে তারপর বললেন, এভাবে না হলে জীবনে ঐ সুযোগটুক কি ঘটত কখনো? হয়ত এর জন্যেই এতদিন ছিলাম। সেদিক থেকে ঘোড়াটা ভালোও করেছে কিছু···তাই না?

বুঝলাম একাত্তর বছরের অকৃতদার ধনেশবাবু আঘাতের মধ্যেই পরমার্থ খুঁজে পেয়েছেন বেঁচে থাকার।

মোসাতুভো

নগদ পঞ্চাশটি টাকা তুলে দিলাম ডাক্তার পাবড়াশীর হাতে। তারপর দেওয়ালের বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভালো করে একবার দেখা দরকার কেমন মানাল চশমাটা। না, হয়েছে চমৎকার। তবে টাকাটা একটু বেশি লাগল।

ডাক্তার পাবড়াশী পিছন থেকে বলে উঠলেন, ও আর দেখতে হবে না। খাঁটি ক্রিস্টাল গ্লাস, আর সেলের ফ্রেম। বেকসুর দশ বছর চলে যাবে আপনার।

নমস্কার করে বেরিয়ে আসব, এমন সময় ডাক্তার বললেন, বসুন আর একটা কথা বলার আছে।

ছাতাটি কোণায় রেখে তাঁর অবশিষ্ট উপদেশটি শোনার জন্যে আবার চেয়ারে চেপে বসলাম।

ডাক্তার পাবড়াশী বললেন, যে রকম জোর এস্টিগমেটিজম হয়েছিল আপনার, তাতে আর কিছুদিন দেরী হয়ে গেলে মহা বিপদ হত। এমনকি, ঈশ্বর না করুন, চোখের দৃষ্টিই খোয়া যেতে পারত।

পঞ্চাশটা টাকার জন্যে মনটা তখনো খুঁত খুঁত করছিল। ডাক্তারের এই পিলে চমকানো ব্যাখ্যান শুনে মনে হল, চশমা নিয়ে তাহলে ত ভালোই করেছি। দুটো চোখের কাছে পঞ্চাশ টাকা।

এক টুকরো শ্যাময় লেদার খাপে ভরে সেটা দিলেন আমার হাতে ডাক্তার পাবড়াশী। বললেন কাঁচ দুটো পরিষ্কার করে মুছে নেবেন চোখে দেবার আগে। আর মনে রাখবেন, সিলিণ্ড্রিক্যাল গ্লাস, একসিস বেঁকে না যায় যেন কোনরকমে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম, তারপর নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার ঈষৎ হেসে বললেন, এমন ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বলুন ত? আসল কথাটাই যে হয়নি এখনো।

কি ওঁর আসল কথাটা, কে জানে। একটু আনমনা হয়ে আবার বসে পড়লাম।

ডাক্তার পাবড়াশী বললেন, চোখের গোলমালটা মিটল। এবার দাঁতগুলো একবার দেখান। ঐ যে মাথার যন্ত্রণা আর ঘুম না হওয়ার কথা বলছিলেন, ওতে আমার ধারণা, আপনার দাঁতে বেশ গড়বড় আছে।

—কৈ তেমন ত কিছু বুঝি না। মাঝে মাঝে মাড়ি ফোলা কি দাঁত কনকন করা অবশ্য হয়। কিন্তু সে আর কার না হয়?

—জিনিসটাকে অত লঘু করে দেখবেন না। মাইগ্রেন হেডেক বড় সাংঘাতিক

জিনিস, আর ওটা হয়ই দাঁতের গোলমাল থেকে।

—আগে ত তা বলেননি। তাহলে চশমা না নিয়ে দাঁতই দেখতাম।

হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার। বললেন, কথাটা বুঝছেন না কেন? দাঁত থেকে রোগটা চোখে এসে সেটল করার পর চোখটা হয়েছে একনম্বর এফেক্টেড পার্ট আর মাথাটা হয়েছে দু-নম্বর···এখন আপনাকে ফাইট দিতে হবে প্রত্যেকটার সঙ্গে আলাদা আলাদা করে। বুঝেছেন।

মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, এই একরাশ খরচ হল। আবার যদি দাঁতের জন্যে খরচ করতে হয়···

ডাক্তার কণ্ঠে অসীম দরদ ঢেলে বললেন, কি করবেন বলুন? ব্যাধি মানেই শত্রু। শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে ত আর বাস করা যায় না। তাকে তাড়াতেই হবে শরীর থেকে, আর সেই তাড়ানোর উপায়ই হল চিকিৎসা। কিছু খরচ ত হবেই সেজন্যে।

একটা ঢোক গিলে বললেন, যাতে খুব কম খরচে হয় আপনার, তার ব্যবস্থা করছি আমি। গুলু ওস্তাগর লেনে চলে যান, অরোরা ডেন্টাল ক্লিনিক, ডাক্তার পি. ডি. হাজরা।

বলেই টেলিফোন তুলে নিলেন তিনি।

অগত্যা ঠিকানাটা টুকে নিয়ে রওনা হতে হল আমাকে।

ডাক্তার হাজরা দু-পাটি দাঁত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখে পরিয়ে তাঁকে বললেন, আয়নায় দেখুন, কেমন চমৎকার ফিট করেছে।

ভদ্রলোক বললেন, ডান দিককার মাড়ির এইখানটায় কিন্তু লাগছে।

ডাক্তার বললেন, ও কিছু নয়। দু-এক দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। হাজার হলেও একটা বাইরের জিনিস ত।

একই ঘরের মাঝখানে কাঠের পার্টিশান দিয়ে অর্ধেকটায় করা হয়েছে চেম্বার। বাকী অর্ধেকটায় রোগীদের বসার জায়গা।

পর্দার ওপিঠে ডাক্তার তাঁর পেশেন্টের সঙ্গে কথা কইছেন, এপিঠে আমি, বসে বসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি, আর পাতলা পর্দার ভেতর দিয়ে দুজনকে দেখছি।

ভদ্রলোক রোমালে থুথু ফেলতে ফেলতে আর মুখে অবোধ্য আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে এলেন। পিছু পিছু এলেন ডাক্তার হাজরা।

আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। কিছু মনে করবেন না। এঁকে ছেড়ে দিয়েই আপনাকে অ্যাটেণ্ড করব।

তারপর ভদ্রলোকটিকে বললেন, বসুন, পল্লী গাম আর পায়োরিয়ার জন্যেই এতদিন পেটের গণ্ডগোলে ভুগেছেন। এই সমস্ত বিষ শরীরে বসেছে ত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আরো দেরী করেননি।

—কিন্তু এ দাঁতে কি খেতে পারব?

—খুব পারবেন, খুব পারবেন। রীতিমতো মাংসের হাড় চিবুতে পারবেন। শুধু তাই নয়, দিব্যি হজমও হবে দেখবেন।

ভদ্রলোক বললেন, সবশুদ্ধ কত দিতে হবে আপনাকে?

ডাক্তার বললেন, আমাদের রেট পৌনে তিনশো। আচ্ছা, আপনি আড়াই শো দিন।

—বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে ডাক্তারবাবু।

—আরে না না। এর কমে আপনি কোথাও পাবেন না। অবিশ্যি চীনে মিস্ত্রিদের কাছে পেতে পারেন। কিন্তু তারা ত ডাক্তার নয়, ডাকাত। কত গণ্ডা লোককে মেরে ফেলল এ পর্যন্ত।

ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না। মানিব্যাগ বের করে বিষণ্ন মুখে তা থেকে গুণে দশ টাকা, পাঁচ টাকা ও এক টাকার নোট বের করতে লাগলেন।

ডাক্তার হাজরা বললেন, আজ হয়ত মনে হচ্ছে আপনার অনেক বেশি খরচ হয়ে গেল। কাল বুঝবেন, সম্পূর্ণ নবজন্মলাভ হয়েছে আপনার। দেখুন খাওয়াই হল জীবনের সার, আর সেই খাওয়ার যন্ত্র হল দাঁত। পুরো একজোড়া নূতন দাঁত পেলেন, একি কম কথা হল?

ভদ্রলোক টাকার গোছাটা ডাক্তার হাজরার হাতে এগিয়ে দিলেন। তারপর থুথু ফেলতে ফেলতে আর মুখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন।

ডাক্তার হাজরা বললেন, হ্যাঁ বলতো ভুলে গেছি। দাঁতটা রাত্রে খুলে জলে ডুবিয়ে রাখবেন। একটা কৌটোর মধ্যে রাখলেই ভালো হয়, নইলে ইঁদুরে নিয়ে যেতে পারে।

ভদ্রলোক সম্মতি জানিয়ে রওনা দেবেন, ইতিমধ্যে ডাক্তার বললেন আর দেখুন, চোখটা একবার টেস্ট করিয়ে নিন।

—কেন? চোখে ত কোন গোল নেই আমার।

—আছে কি নেই আপনি বুঝবেন কি করে? ফরটি পেরিয়ে গেছে, যে রকম চোখ বেঁকিয়ে তাকাচ্ছেন, তাতে আমার ত ধারণা আপনার ভিশানে দস্তুরমতো গোলমাল আছে।

—কৈ না ত। চোখে আমি বেশ দেখছি। বললেন বটে, কিন্তু ভদ্রলোকের গলায়

আওয়াজটা যেন একটু ভাঙা-ভাঙা মনে হল।

মিনিট দুই চুপ করে থেকে ভদ্রলোক ব্যাকুল হয়ে বললেন, অনেক খরচ হয়ে গেল। আর আমি পারব না স্যার।

হেসে ফেললেন ডাক্তার হাজরা। বললেন, বাঁচতে হলে পারতেই হবে এবং বাঁচাটাই ত মানুষের এম। তা ঘাবড়াবেন না, খুব কমে টেস্ট করা এবং স্পেক দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। আমার বন্ধু ডাক্তার এস. এন. পাবড়াশী, মো ফ্লাউয়ার অপ্টিসিয়ান, নেবুবাগান লেন।

টেলিফোন উঠিয়ে নিলেন তিনি।

অর্থাৎ যেখান থেকে আমি এসেছি, ঠিক সেখানে রওনা করে দিলেন তিনি অভিভূত ভদ্রলোককে।

বুঝলাম ব্যাপারটা। দু-মুড়োয় দাঁড়িয়েছেন দুই দোস্ত র‍্যাকেট হাতে নিয়ে। মাঝখানে রয়েছি বেকুব জনসাধারণ আমরা, আর ক্রমাগত ঘা খেয়ে এক হাত থেকে অন্য হাতে চলাফেরা করছি টেনিস বলের মতো। দিচ্ছি তার জন্যে জবর আক্কেল সেলামি।

কি করব এখন? পালাব? না, তার সুযোগই হল না আর।

ডাক্তার হাজরা পাকড়াও করে ফেললেন আমাকে। বললেন, আসুন বড্ড দেরী করিয়ে দিলাম আপনার।

শহীদ স্তম্ভ

এই মাত্র ফিরেছি।

সকালে উঠেই জীপ নিয়ে দৌড়তে হয়েছিল বারুইপুর। সেখানে রাজ্যপাল কৃষি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। বক্তৃতা দিলেন আমাদের সহযোগী সম্পাদক।

আমাকে যেতে হয়েছিল প্রদর্শনীর খবর আর ছবি সংগ্রহ করতে।

বুঝতেই পারলেন বোধ হয় যে আমি সংবাদপত্রের রিপোর্টার। অর্থাৎ-সেই হতভাগ্য জীব যার পায়ের সংখ্যা মাত্র দুখানা না হওয়াই উচিত ছিল।

যাই হক মাথায় এক থাবল তেল ঘষে আর ঘটি দুই জল ঢেলে সবে ভাতের থালাটা সামনে টেনে নিয়েছি আর পিঠের কাছে ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল।

মুখে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে গৃহিণী বললেন কে আবার?

ভয়ে ভয়ে বললাম, আর কে? নিউজ এডিটর। তাঁর হুকুম বিকাল পাঁচটার মধ্যমগ্রাম যেতে হবে মিটিং কভার করতে। দেশনায়ক গণেশ আড্ডির সভাপতিত্বে সেখানে শহীদবাগের ভিত্তিস্থাপন হবে।

—শহীদবাগ আবার কি?

—বুঝলে না? দেশের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের নামে একটা বাগান বসানো হবে, সেখানে একটা স্তম্ভ টম্ভ স্থাপন হবে আর কি!

ব্যাজার গলায় গিন্নী বললেন এই ছাইয়ের চাকরি ছেড়ে আবার প্রফেসারীতে ফিরে যাও ত। দিন নেই রাত্রি নেই খালি দৌড় আর দৌড়। একটা সিনেমা দেখা নেই একটা নেমন্তন্নে যাওয়া নেই……এ কি ভদ্দর লোকের চাকরি?

আমতা আমতা করে বললাম বিরক্ত হলে কি চলে? আমাদের কাজ ত নিছক চাকরি নয়, এ যে দেশসেবা।

—পোড়া কপাল সেবার! মুখ বিকৃত করে বললেন গিন্নী। তারপর একটা ঢোক গিলে বললেন, তোমাদের ওপরওলারা বক্তিমে করে দেশসেবা করছেন, তোমরা তার কাহিনী কেত্তন করে আর লম্বা লম্বা ছবি ছেপে দেশসেবা করছ। এত সেবায় দেশ টিকঁলে হয়।

দেখলাম কথা বাঁকা দিকে মোড় ফিরছে। আর ঝঞ্ঝাট বাড়ানো সুবুদ্ধি নয় বুঝে বললাম তা অবশ্য ঠিক।

তারপর স্রোতটা অন্যদিকে ফেরানোর জন্যে বললাম তা তুমিও থালাটা নিয়ে বসে যাও না। এদিকে বেলা ত প্রায় একটা বাজে।

—থাক আর দরদ দেখতে হবে না, বলেই একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে গিন্নী রান্নাঘরে ঢুকলেন মাছ-তরকারি আনতে।

খাওয়া সেরে শরীরটা ইজি-চেয়ারে এলিয়ে দিলাম। অল্প একটু গা গড়িয়ে নিয়েই আবার ত বেরতে হবে—

কদিন হল একটা গোয়েন্দা নভেল ধরেছি শেষই করতে পারছি না। গল্পটা এমন এক জট-পাকানো রহস্যের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে যাতে শেষ-নেশ না পৌছানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কিন্তু পড়ব কখন।

ঠিক করলাম এই ফাঁকে পাতাগুলো ধাঁ-ধাঁ করে উল্টে যাই। তাতে বিশ্রামও হবে ঘুমটাকেও এড়ানো সহজ হবে।

সামনের মোড়ায় পা দুটো তুলে দিয়ে বইখানা খুললাম।

পেশাদ'র বদমায়েস পিয়েত্রো কিভাবে এক সুন্দরী কিশোরীকে টোপ হিসাবে এগিয়ে দিয়ে একের পর এক যুবককে তার আপেল বাগানে ভুলিয়ে আনে তারপর তাদের অচেতন করে গা থেকে সমস্ত রক্ত চুঁইয়ে নেয় এবং তাদের মৃতদেহগুলি আপেল গাছের আশেপাশে পুঁতে ফেলে তার রোমাঞ্চকর কাহিনী।

এই খুনী পিয়েত্রোকে আর তার বাহন তন্বী ভোমারাকে চতুর গোয়েন্দা ফ্রচার শেষ পর্যন্ত ধরলেন ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ অনুসরণ করে।

জমাটি গল্পের অতলে তলিয়ে গেলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই।

কোথায় মধ্যমগ্রাম কোথায় শহীদবাগ, কোথায় বা গণেশ আড্ডির বক্তৃতা···সব তাল-গোল পাকিয়ে ছোট্ট একটা বুদ্বুদের মতো চোখের সামনে দিয়ে দুলতে দুলতে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

আমি যখন হাজির হলাম সভা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

আহ্বায়ক শরবিন্দু হাজরা তখন মূল প্রস্তাবের বয়ানটা পড়া শেষ করে, প্রস্তাবিত স্তম্ভের ফলকে যে-যে শহীদের নাম খোদিত হবে সেই তালিকা পড়ার অনুমতি চাইছেন।

প্রস্তাবটা এই রকম : জননী জন্মভূমির বন্ধন মুক্তির সংগ্রামে যে সমস্ত বীর সন্তান অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁহাদের সকলের উদ্দেশে এই সভা শ্রদ্ধা

নিবেদন করিতেছে। তাঁহাদের নামে উৎসর্গিত এই উদ্যানের মধ্যস্থানে যে স্তম্ভ স্থাপিত হইবে, তাহাতে স্বাধীন ভারতের নর নারী আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য রূপে তাঁহাদের নাম উৎকীর্ণ করিতেছি।

চতুর্দিক থেকে তুমুল করতালি প্রস্তাবকে সম্বর্ধিত করল।

উৎসাহিত হয়ে হাজরা মশায় নামের তালিকা পড়া সুরু করলেন: নিত্যানন্দ হোড় হরিহর তলাপাত্র করালীকান্ত কর্মকার বিপিনবিহারী সাঁপুই সোনামুখ দেবনাথ…

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এক ক্ষীণকায় ভদ্রলোক। গোটা চেহারাটা তাঁর তীক্ষ্ণ একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো।

তিনি বললেন এ সব নাম চলবে না, এঁদের কেউ চেনেন না। এঁরা কারা? কি করেছেন এঁরা? এদের নাম ঘটা করে ফলকে তোলার মানেটা কি?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন আর এক ভদ্রলোক। সপ্তমে গলা চড়িয়ে তিনি বললেন আপনি যাদের নাম শোনেন নি তাঁরা দুনিয়ায় ছিলেন না, এ কেমনধারা যুক্তি! আপনি কুয়োপাটকিনের নাম শোনেন নি বলে তিনি কোন দিন ছিলেন না… এই মেনে নিতে হবে নাকি আমাদের?

তাঁর কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে জোর গলায় বললেন হাজরা মশায় এরা সবাই তারকেশ্বর ডাকাতিতে পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারান। হাওড়া হুগলী চব্বিশ পরগণার বীর সন্তান এরা।

আর কোথায় যাবে? বিকট চীৎকার করে ডায়াসের ওপর লাফিয়ে পড়লে এক স্থূলদেহ প্রৌঢ়। গালের এক পাশে তাঁর এক ট্যাবলা পান। হাতে একটা রেশনের থলি। তিনি বললেন হাওড়া হুগলী চব্বিশ পরগণা …. এইগুলিন তোমাগো বিপ্লবের আকড়া হইছে, চোট্টোগ্রাম ঢাহা বরিশাল এগোর নাম শুনছো কখনো? বিপ্লবী দ্যাখছো কখনো? ঘটীগো স্বভাবের এই হইল মস্ত দোষ।

তাঁর হাতে একটা হেঁচকা টান দিয়ে ছোকরা গোছের এক ভদ্রলোক বললেন একি বলছিছ চাঁদ। মেদিনীপুরের কাছে লাগবেক কোন শালা? ডজনে ডজনে বিপ্লবী…

— কিরে হালা তুই আমারে হালা কইস।

—আলবৎ বলবেক, বলবেক নি কেনে।

—শুধু চট্টগ্রাম বরিশাল আর মেদিনীপুর শুধু। আর কোথাও বিপ্লবী হয় নি, না। কত গণ্ডা সোনার চাঁদ ছেলে যে ফাঁসিতে জান দিল বর্ধমান বীরভূম আর মুর্শিদাবাদে তার হিসাবটা কে করবে? বাঙালদের দোষই ঐ সব তাতে নিজের কোলে ঝোল টানে।

— বাঙাল কইসে মাইরা সারথান্ দাত খুইল্যা নিমু।

বাজখাঁই গলায় এক তরুণ বলে উঠলেন থামো না বাওয়া। অত গণ্ডগোলে কাজ কি? পুলিশের হাতে মরা নিয়ে কথা, যে মরেছে সেই শহীদ। আমার পিসতুতো দাদা চোলাই মদের বিজনেস করতে গিয়ে গুলী খেয়ে প্রাণ হারাল সেই বা কম কি? আর একজন বললেন, আমার কাকা পুলিসের গাড়ীতে চাপা পড়ে প্রাণ হারাল, সেও তাহলে কম শহীদটা কি?

ওদিকে তখন মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও হাওড়া, হুগলীর দলের মধ্যে, ঠেলা-ঠেলি গুঁতোগুঁতি শুরু হয়ে গেছে।

সভাপতি আড্ডি মশায় গলায় গাঁদাফুলের মোটা একটা মালা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

মাইকে মুখ রেখে তিনি কি যেন বলতে গেলেন। কিন্তু হট্টগোলের আতিশয্যে তা কারো কানে পৌঁছলো না।

দেখলাম দমাদম ইঁট পড়া শুরু হল।

বাগানের রেলিং একটার পর একটা উপড়ে নিয়ে যে যাকে পেল, তাকে বেপরোয়া ঠেঙ্গাতে লাগল। কিল-চড় ও চীৎকারে চতুর্দিক ধরল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চেহারা।

পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে নিঃশব্দে সরে এলাম নিরাপদ দূরত্ব থেকে দু-একখানা ছবি নোব বলে।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘটনাস্থলে ফিরে এসে দেখি, ডায়েসে তখনও গাঁদা ফুলের মালা গলায় আড্ডি মশায় বসে আছেন। আর তাঁর সামনে সমগ্র সভামণ্ডপে ছড়ানো রয়েছে ইট-পাটকেল, বোতল-ভাঙ্গা, চেয়ার টেবিলের ভগ্নাবশেষ এবং তার মধ্যে ইতস্তত রক্তাক্ত মৃতদেহ গোটা কয়েক।

হতভম্ব গ্রামবাসী, দরিদ্র রেফুজী এবং চলতি পথের সাধারণ মানুষ চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন অনেক। উদ্যোক্তাদের কেউ নেই।

সহসা যেন মূর্ছা ভঙ্গে জেগে উঠলেন, আড্ডি মশায়। দাঁড়িয়ে মাইকে মুখ দিয়ে জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন, শহীদ তালিকা প্রস্তুত নিয়ে যা হয়ে গেল, তারপর আর পুরানো শহীদদের উল্লেখে দরকার নেই। ঘটনা আমাদের এখানেই এক ডজন নূতন শহীদ তৈরি করে দিয়েছে। আসুন এঁদের নামই আমরা ফলকে উৎকীর্ণ করে জাতীয় কর্তব্য করি।

সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল 'জয় হিন্দ্‌'!

চমকে উঠে দেখি ইজিচেয়ারেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হাতে রয়েছে সেই গোয়েন্দা ফ্লেচারের কাহিনীটা।

রম্য রচনা

ভালো না লাগা

এক-একটা সময় আসে, যখন নিতান্ত অকারণেই সব জিনিস খারাপ লাগতে থাকে। ঠিক খারাপ লাগাও নয়, যেমন একটা ভালো-না-লাগা। রোজকার অভ্যস্ত কার্যসূচীর মাঝখানে পড়ে যায় লম্বা একটা ছেদ। মন যেতে চায় অপরিচয়ের দিকে, কিন্তু লক্ষ্য ঠিক থাকে না, যাবার উৎসাহও থাকে রীতিমতো মিইয়ে। হঠাৎ যেন আশ-পাশের জগৎ থেকে নিজেকে আলাদা মনে হয়। মনে হয়, নিত্যকার জীবনের সঙ্গে বন্ধনের মূলটা কেমন যেন আলগা হয়ে গেছে। যারা অত্যন্ত কাছের মানুষ, তাদের কাছ থেকে যেন অনেক দূরে চলে এসেছি। পরিচিত পৃথিবীর প্রাত্যহিক হট্টগোল কানে এসে লাগে যেন সুদূর সমুদ্রের কল্লোল-ধ্বনির মতো।

কোথায় চলেছি, কি ভাবছি, কাকে চাইছি, জিজ্ঞাসা করলে কোন কথারই উত্তর দিতে পারি না হয়ত। হয়ত ভেবেচিন্তে যে-উত্তর দিই, আসল অবস্থার সঙ্গে তার সত্যিকার কোন যোগ নেই। আসল অবস্থাটা কি রকম, তাই যে ষোল-আনা বুঝে উঠতে পারি না। কেমন একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব, একটা আবছা অজানার নেশা, যার আরম্ভ নেই, শুধু আছে একটা অস্পষ্ট অবিচ্ছিন্ন পরিব্যাপ্তি। বলা যেতে পারে, এ হচ্ছে অবকাশের আক্রমণ, যা চৈতন্যকে করে অভিভূত, মস্তিষ্ককে করে ক্রিয়াহীন, অথচ যা অদৃষ্ট, অস্বচ্ছ, হয়ত অসত্যও। কিন্তু জিনিসটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এমন মানুষ একজনও কল্পনা করতে পারি না, যিনি এই অবস্থার মধ্যে না পড়েছেন এবং হামেশাই না পড়ছেন। কিন্তু আশ্চর্য, বুঝিয়ে বলতে বললে সকলেই মুখ-চাওয়া-চায়ি করবেন, সদুত্তর দিতে পারবেন না কেউ। জরুরি চিঠি পড়ে রয়েছে তিন-চারখানা, দু-একখানার সঙ্গে আছে বৈষয়িক লাভালাভের সম্বন্ধ। উত্তর না দিলেই নয়, কিন্তু উত্তর দেওয়া হচ্ছে না। অর্ধ সমাপ্ত লেখাটার জন্যে সম্পাদক বন্ধুর সাগ্রহ তাগাদা আছে। বার বার কলম কামড়েও বক্তব্যগুলো গুছিয়ে আনা যাচ্ছে না, সব যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ঘড়িটা মেরামত হতে গেছে একটি দোকানে। নিয়ে আসবার সময় কবে পার হয়ে গেছে এবং নিয়ে না আসার দরুণ অসুবিধাও হচ্ছে প্রচুর, কিন্তু কে আনে? এমনিতর অবস্থায় সময়-সময় পড়েন নি, এমন লোককে আমার অস্বাভাবিক মনে হয়।

কার্য মাত্রেরই কারণ থাকে, কিন্তু মজার কথা, মনের এই মাতলামির কোন কারণ

খুঁজে পাই না, আর তা পাই না বলেই অবস্থাটা উপভোগ করি। অজস্র ঝামেলার মধ্যে রয়েছি, কিন্তু গায়ে লাগছে না তার বিন্দুমাত্র আঁচ। চারিদিক থেকে এগিয়ে আসছে শত শত দাবী-দাওয়ার দক্ষিণ হস্ত, কারুকে কিছু না দিয়েই নিশ্চিন্ত আরামে আছি। কিন্তু আরামে কি? হয়ত আরামেই, কারণ প্রচলিত সুখ-দুঃখের হিসাব-বোধই যেখানে নেই, সেখানে নিরাকার শূন্যতা, নির্বিশেষে পূর্ণতা, দুই-ই ত রয়েছে গলাগলি করে। তাদের কোলাকুলি ঠেলাঠেলিতে মনের পর্দায় মুহুর্মুহু চকমকিয়ে উঠছে রাশি রাশি অসংলগ্ন ছবির টুকরো, যা স্বাভাবিক অবস্থায় হয় না। এই যে অনভ্যস্তের চমক, এ কি অনারামের?

কিন্তু বিপদ আছে। মনকে তার খেয়াল-খুসী অনুযায়ী বেশীক্ষণ চলতে দেবার সুযোগ কোথায়? আর তা সহ্য বা করবে কে? তাই অবাধ্য ইস্পাতের মতো অনিচ্ছুক মনের ওপর কাজের হাতুড়ি ঠুকতে হয়। চাপাচাপি দিয়ে কোন রকমে রুটিনের ছকে এনে ফেলতেই হয় তাকে, আর সেখানেই হয় সর্বনাশ! বাইরের সঙ্গে ভেতরের অর্থাৎ মনের বিচ্ছেদটা যে কত গভীর, তখনই টের পাই তা। পদে পদে হয় ছন্দ-ভঙ্গ, আর তার ফলে ঘটে অনর্থ, তলিয়ে দেখতে গেলে যার আগাগোড়াই অনাবশ্যক এবং অসম্ভব রকম অহেতুক। ট্রামের সহযাত্রীটি গায়ের ওপর লেপটে বসলে বিরক্ত লাগে, অথচ জানি, রোজই এমন বসে। চলতে চলতে টুকরো প্রশ্ন নিয়ে কেউ পথে আগলে দাঁড়ালে তাকে খিঁচিয়ে উঠি। দুই বন্ধুতে হৈ-হৈ করে আসছে, কথা কইছে, পরস্পর গায়ে ঢলে পড়ছে, দেখলে মাথা তেতে ওঠে, মনে হয় দু-ঘা বসিয়ে দিই। অথচ এ-সব জিনিস রোজই ঘটে। শরৎকালের মেঘের মতো নরম ছায়া ফেলে এরা মনের ওপর দিয়ে আলতো পায়ে ভেসে চলে যায়, কখনো দাগ কাটে, কখনো কাটে না। অজ্ঞাতসারে মন এগুলো থেকে খুসীই আহরণ করে। কিন্তু যে বিশেষ অবস্থার কথা বলছি, তাতে এরা হয়ে ওঠে বিষম। সেই কারণেই সহ্য করা অসম্ভব।

বাইরের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না এ অবস্থায়। সিনেমায়, খেলার মাঠে, কর্মস্থানে, পথে-ঘাটে সব জায়গায় বাধে ঠুকোঠুকি। কোথাও কোথাও হয়ে যায় একপ্রস্থ মেঘ-গর্জন এবং বিদ্যুৎস্ফুরণও। অথচ আগাগোড়াই তার অবাঞ্ছিত ও অকারণ! যেহেতু মনের সহজ সহনশীলতা থাকে না, মন হয়ে থাকে কেন্দ্রচ্যুত, বিপর্যস্ত, বেয়াড়া পদে পদে এত অনর্থ ঘটে তাই। বার বার বুঝতে পারি, অশোভন হচ্ছে, অসঙ্গত হচ্ছে, সেরে নেবার চেষ্টাও করি, কিন্তু হয় না। কোথা দিয়ে কখন ফ্যাসাদ বেধে ওঠে এবং নিজের অজ্ঞাতেই তাতে জড়িয়ে পড়ি। যা-তা নিয়ে দাপাদাপি করি। হঠাৎ হট্টগোলের মাঝখানে যখন আবিষ্কার করি নিজেকে, তখন দেখি, যা

করা উচিত ছিল, তার এক ফোঁটাও করিনি এবং তার ফলে এমন জায়গায় যা দিয়েছি, যেখানে ঘা দিতে কখনই চাইনি।

মেজাজের এই অবস্থাটার সঙ্গে শরীরের কোন যোগ আছে মনে করে যাই ডাক্তারের কাছে। নাড়ি টিপে, বুক দেখে, পেট বাজিয়ে এবং রকমারি প্রশ্নের খোঁচায় বিব্রত করেও কোন হদিশ পান না তিনি। পরামর্শ দেন দাঁত এবং চোখ পরীক্ষা করাতে, নয়ত আন্দাজ করেন যকৃতের কোনরকম বিপাক এবং ওষুধও বাৎলে দেন একটা-দুটো। কিন্তু অবস্থা একই থাকে, ওষুধ ধরে না। ধরবে কি, অসুখ কোথায়? শরীর ছেড়ে মনের দিকে তাকাই। যাকে অশান্তি বলে, দুঃখ বলে, আঘাত, অপমান, লাঞ্ছনা বলে, তেমন কোন জোরালো জিনিস নজরে পড়ে না। যেমন চলছিল সব তেমনি চলছে। সুতরাং কোন চাপা অসন্তোষ এই সমস্ত অসঙ্গতির মধ্যে দিয়ে ফুটে বের হবার চেষ্টা করছে তা নয়। তবে কারণটা অজ্ঞাত। হয়ত এ-ই মনের স্বধর্ম। হয়ত নিত্যকার আবেষ্টনীতে আবদ্ধ থেকে থেকে মন যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন চেতনার ওপর একটা ঘোমটা টেনে দিয়ে সে আড়ালে সরে দাঁড়ায় বোঝা হালকা করবার এবং নূতন সঞ্চয় আহরণ করবার জন্যে। এ না হলে অতি-বহনের উৎপাতে মন হয়ত ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যেত!

তবে এটা বুঝতে পারি, এ অবস্থার ওপর কারো হাত নেই। এবদম না! চেষ্টা করে একে আনা যায় না, আবার মনে করলেই একে তাড়ানোও যায় না। হঠাৎ ছুটে-আসা দমকা হাওয়ার মতো, হঠাৎ উৎসারিত ভূমিকম্পের মতো, কোন এক ফাঁকে এ এসে হাজির হয় এবং তারপরই সুরু হয় এর দৌরাত্ম্য! কোথা দিয়ে কখন আসে, কেমন করে আসে, কি এর চেহারা, কিছুই টের পাইনে, তাই অবুঝ বিহ্বলতায় শুধু আঁকু-পাঁকু করি। যন্ত্রের মতো চলি এর নির্দেশে। যেই চেষ্টা করি একটু হাত এড়িয়ে যেতে, অমনি লাগামে পড়ে টান, পিঠে পড়ে চাবুক। সব উল্টে-পাল্টে ভেঙে ভেস্তে একাকার হয়ে যায়। এই জন্যেই বোধহয় বলে, মনের ওপর হাত নেই।

এই জন্যেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের রুটিন বেঁধে বেঁচে থাকা আমার কাছে একটা অসম্ভাব্য ব্যাপার মনে হয়। মনে হয়, ভদ্রলোক যা লিখেছেন হয় তা সত্যি নয়, নয় তাঁর প্রকৃতিতে সেই সহজ নমনীয়তা ছিল না, যা মানুষ মাত্রেরই থাকে। নইলে কোন দিন, কোন মুহূর্তে, কোন অতর্কিত ক্ষণে, এই ভালো-না-লাগার মোহ তাঁকে পেয়ে বসত এবং তাঁর সমস্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনা হঠাৎ ভণ্ডুল করে দিত। তখন কোথায় থাকত তাঁর সেই আধঘণ্টা প্রার্থনা, দেড়ঘণ্টা বই-পড়া, আর আড়াইঘণ্টা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলাপ-আপ্যায়ন? অলস ঔদাস্যে আপনাকে নিয়ে হয় ঘরের কোণে

বসে থাকতেন বুঁদ হয়ে, নয়ত বাইরে বেরিয়ে আমারই মতন পদে পদে নাকানি-চুবানি খেতেন। কারো সঙ্গে কিছুর সঙ্গেই মানিয়ে নিতে পারতেন না!

যখন বাইরে বেরতে হয় না, তখন এই অবস্থাকে সানন্দে স্বাগত জানাই আমি। একঘেয়ে বর্ণহীন প্রাত্যহিকতার গণ্ডী দিয়ে ঘেরা শহুরে জীবন, এর মাঝখানে কোথাও কোন ছেদ নেই, আরোহ-অবরোহ নেই। এর ভেতর কোথা দিয়ে হঠাৎ এসে পড়ে দুর্নিরীক্ষ্য অবকাশের আমন্ত্রণ। অগাধ অবকাশের অজস্র কাজে না-লাগা বৈচিত্র্য মনের আনাচে কানাচে কিলবিল করে বেড়ায়। উড়িয়ে নিয়ে যায় আমাকে ব্যক্তিসীমার বাইরে। ডুবিয়ে দেয়, তলিয়ে দেয়, ভুলে যাওয়ার বিহ্বল কুয়াসা দিয়ে ঘিরে ফেলে। ভালো না লাগার এই নেশা তাই ভালো লাগে আমার। ভালো মন্দের পুরানো নিরিখ যায় পাল্টে, নূতন করে তাই ভালোবাসার প্রেরণা পাই আমি এ-থেকে।

আলস্য দর্শন

আমি চিরদিন আলস্য-বিলাসী। দিন-রাত যাঁরা কঠিন শ্রম করেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় যাঁদের ঘড়ির কাঁটা দিয়ে বাঁধা, তেমন লোকদের আমি কোনদিন সইতে পারি না। রাস্তায় দেখা হলে, কুশল প্রশ্ন করতে করতেই তাঁরা হুস করে এসে পড়া একটা ট্রাম বা বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে পা-দানে উঠে পড়েন, তারপরই চলি ভাই, একটু কাজ আছে—বলে সরে যান। প্রাণ ভরে আড্ডা দেবার জন্যে ছুতো করে চায়ের নিমন্ত্রণ জানালে, ঐদিন পারব না, একটু জরুরি ব্যাপারে বজবজ বা যাদবপুর যেতে হবে বলেই পাশ কাটিয়ে যান তাঁরা।

কোন উৎসব-আমোদে তাঁদের পাওয়া যায় না, আপদ-বিপদে ত নয়-ই। তাঁরা দিন-রাত্রি ডুবে থাকেন শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে এবং অনুসন্ধানে দেখেছি, সে কাজও আর কিছু নয়, টাকা করা, গাড়ী-বাড়ী করা এই সব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা বা সমাজের সেবা বা এমনি যে সব কাজকে মানব সমাজে সত্যিকার কাজ বলে, তার জন্যে তাঁদের কোন মাথাব্যথা নেই। এ-সব ব্যাপারে সময়ক্ষেপ করাকে তাঁরা বাজে সময় নষ্ট বলে মনে করেন। তাঁদের মতে অর্থের সন্ধান এবং সঞ্চয়ই হল আসল কাজ। যাঁরা তা-ই করেন, তাঁরাই তাদের মতে প্রকৃত কাজের লোক। সাংসারিক হিসাবে এ-সব লোকই হয়ত সত্যিকার গণনীয় লোক, কেননা তাঁদের চলতি অর্থে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, টাকা-পয়সা, সবই আছে এবং তা আছে বলে, সবাই তাঁদের মান-খাতির করেন।

তবু ভেবে দেখুন ত কি সাংঘাতিক মানুষ তাঁরা! তাঁদের কাছে সৌন্দর্যের কোন দাম নেই। সাহিত্য, সঙ্গীত, এ সবের কোন আবেদন নেই। জীবনে বিশ্রাম, বিরতি, সংসর্গ, কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের কোন কদর নেই। কখন সকাল হয়, পূর্বদিকের আকাশ অজস্র সোনায় ভরে যায়, ঘরের বাইরে উড়ন্ত পাখীরা উড়তে থাকে কিচির মিচির করে, তা তাঁরা জানতেও পান না! দিন মানেই তাঁদের কাছে পরিশ্রমের সময় এবং পরিশ্রম মানেই কড়ি কুড়ানো। তার বাইরে আর যা কিছু আছে, তা-ই তাঁদের কাছে নিরর্থক।

এই শ্রেণীর লোককেই দেখেছি ছেলের বিয়েতে পাত্রীর রূপ গুণ ও বিদ্যা বুদ্ধির চেয়ে তার পিতার পুঁজি সম্বন্ধে বেশী মনোযোগী হতে। খাওয়ার টেবিলে দেখেছি, এটা ওটা নানা জিনিস সম্বন্ধে প্রগাঢ় ঔদাসীন্য দেখাতে এবং যাহোক একটা কিছু দিয়ে তাড়া-তাড়ি উদরপূর্তি করতে! অর্থাৎ শোভা, সুষমা, মাধুর্য, এ সবের চেয়ে তাঁর কাছে বড়

হল উপযোগিতা। তারি মাপকাঠিতে তাঁরা সব-কিছুর বিচার করেন এবং সাংসারিক প্রয়োজনের গণ্ডীর বাইরে পড়ে যা, তাকেই বাতিল করেন নিষ্প্রয়োজন বলে। তাই দেখেছি, তাঁদের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে ঢ্যাঁড়স ও টম্যাটোর গাছ যত গৌরবে মাথা তোলে, গোলাপ ও বেলফুলের গাছের সে মর্যাদা নেই। থাকবে কি? ফুলের ত কোন দ্রব্যমূল্য নেই, সেই কারণেই সাংসারিকতার দিক থেকে কোন উপযোগিতা নেই।

আমি এই শ্রেণীর লোকদের শুধু দেখতে পারি না তাই নয়, এঁদের দু-চক্ষের বালাই মনে করি। মনের আকাশ তাঁদের প্রয়োজনের মেঘ দিয়ে ঠাসা। তাঁরা মেপে হাসেন, মেপে কথা বলেন। স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, কর্তব্য, সবই তাঁদের মাপাজোপা। কোথাও কোন অপচয় বা অপব্যয় নেই। চিঠিখানি এলে, তার খামখানি তাঁরা সযত্নে জমিয়ে রাখেন, প্যাকেটটি খুলে তার দড়িটি গোল করে রেখে দেন কোন দিন কাজে লাগবে বলে। সিনেমার টিকেট, দোকানের ক্যাশমেমো, গয়লার এবং মুদীর ফর্দ, রাজ্যের জিনিস তাঁরা ফাইলে গেঁথে রাখেন। কে জানে কখন কাজে লাগবে! অর্থাৎ সামনে-পিছনে, উপরে-নীচে, সব দিকে তাঁদের চোখ। তাঁরা এক নম্বরের হিসাবী লোক।

হয়ত বলবেন, দোষের কি তাতে? বেহিসাবী বাউণ্ডুলে বিহ্বল প্রকৃতির হওয়া এবং পদে পদে অপচয় ও অপব্যয় করার মধ্যে কোন বুদ্ধিরও পরিচয় নেই, কোন মহত্ত্বও প্রকাশিত হয় না! হয়ত তাই। তবু আমি মনে করি, বিশৃঙ্খলা, অপচয় ও অনিয়মানুবর্তিতাই প্রকৃতিসিদ্ধ এবং যে-মানুষ যতটা প্রকৃতির অনুগামী, সে-মানুষ ততটা স্বাভাবিক।

কেন বলছি। যত মুকুল হয় গাছে, আম তার হাজার ভাগেরও এক ভাগ হয় না। যত প্রাণের উপাদান উৎসারিত হয় প্রাণী দেহ থেকে, তার লক্ষাংশের একাংশও জীবরূপে জন্মায় না। এত বেশী ছড়াছড়ির মেলা চলে বলেই ত প্রকৃতির রাজ্যে ফুল-ফল, কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্তু ও মানুষের প্রবাহ এমন অব্যাহত আছে। ঠিক মাপা মাপা পরিমাণ ধার্য করা থাকত যদি সব-কিছুর তাহলে অনেক বিভাগই হয়ত বিলুপ্ত হয়ে যেত জীবন-সংগ্রামের ধাক্কায়। ঠিক এইভাবেই যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী জল, হাওয়া, আলো, গাছ-পালা, মাটি আছে পৃথিবীতে। ঠিক মাপা-জোপা হলে, কি বিপদ হয় ভাবুন ত! যখনি দুনিয়ার কোন অঞ্চলে জলে বা শস্যে টান পড়ে, তখনি কি দুর্বিপাক ঘটে, এ ত দেখছেনই সবাই বছরের পর বছর।

এইভাবেই চব্বিশটি ঘণ্টায় পরিব্যাপ্ত একটি দিনে দেওয়া রয়েছে অজস্র সময়।

তার মধ্যে ঘুম ও খাওয়া-দাওয়ায় সাত-আট ঘণ্টাও যদি ব্যয় করেন, তবু থাকে পনেরো-ষোল ঘণ্টা। সেই সময়টা কি শুধু জমি কেনা, কারবার ফাঁদা, মামলা করা, মেয়ের বিয়ে দেওয়া ও ছেলের চাকরি বাগানোতেই নিঃশেষ করবেন এবং তা করবেন বলে, হাসবেন না, গল্প করবেন না, নিমন্ত্রণ খাবেন না, সিনেমা দেখবেন না, তাস খেলবেন না, আড্ডা দেবেন না। চোখ বক্র ও কপাল কুঞ্চিত করে বসে বসে দিনরাত্রি শুধু ভাববেন, অথবা ধনের ধান্দায় সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরবেন? সেই কাজের যাঁরা কাজী, তাঁদের শ্রদ্ধা করবেন এবং যাঁরা হাসি-খুশী নিয়ে, আমোদ-প্রমোদ ও হৈ-হুল্লোড় নিয়ে মেতে আছেন, তাঁদের ধিক্কার দেবেন? বলবেন দেশকে তাঁরা রসাতলে দিচ্ছেন, জাতিকে তাঁরা অলস ও শ্রমবিমুখ হতে সাহায্য করছেন? তাহলে কিন্তু মহাশয়, আপনার সঙ্গে নির্ঘাত কলহ বাধবে আমার!

কেন জানেন? কল-কারখানা, কাজ-কারবার, অফিস-আদালতের যে দুনিয়া, যেখানে বন বন করে চাকা ঘুরছে, ঝন ঝন করে বাজছে টাকা, মানুষ সেখানে সমাজ-যন্ত্রের এক-একটি নাট-বল্টুতে পরিণত হয়েছেন। সেখানে জাতির বিত্ত উৎপন্ন হয় ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত ঐশ্বর্য উৎপন্ন হয় না। প্রকৃত ঐশ্বর্য জন্মায় নিভৃতে। নিঃশব্দ আলস্যের উদার আকাশেই ফোটে কবিতার তারা, সেখানেই জন্মায় শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মননশীলতা। যন্ত্রের আওয়াজ ও যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতা এ-রাজ্যে অচল। এ-সরস্বতীর কমল বন, এখানে সাংসারিক প্রয়োজনের মত্ত হস্তীকে ঢুকতে দিলেই সব তছনছ হয়ে যাবে। এখানকার স্নিগ্ধ শান্ত পেলব অলসতার আবহাওয়ায় দিনগুলি ফুটছে একে একে শতদলের মতো। সূর্যাস্তের অজস্র আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রাত্রিগুলি আসছে অপরূপ অপরাজিতার মতো। তাড়াহুড়ো নেই, চাহিদার চীৎকার নেই।

আমি এই মুলুকের মানুষ। কাজেই কাজের মুলুক ও কেজো মানুষদের সঙ্গে আমার আদৌ বনে না। আমার দিন যায় অবাধ আলো-হাওয়ায় আপন আবেগে গড়িয়ে গড়িয়ে। আমি পড়ি, লিখি, ভাবি, গল্প করি। আবার এক-এক সময় সব বন্ধ করে দিয়ে বেড়াই ঘুরে ঘুরে সাহাগঞ্জে, সরস্বনায়, গৌরীপুরে, গড়িয়ায়, মধ্যম-গ্রামে। যেখানে কেউ চেনে না, কোন কাজ নেই, হয়ত ভাঙা শিবমন্দিরের চাতালে, নয়ত হাজা-মজা পুরানো দীঘির ঘাটলায়, নয়ত জন-মনুষ্যহীন পথপার্শ্বের আমবাগানে, কিংবা বেত ও কালকাসিন্দা ঘেরা শীর্ণ ঝিলের কিনারায় বসে বসে সময় কাটাই। অথবা বাড়ীতে আসর জাঁকিয়ে বসে আড্ডা দিই চেনা-অচেনা, নানা জনের সঙ্গে। কাজের কথা, দামের কথা, দরকারের কথা, সব হারিয়ে ফুরিয়ে যায় বাজে কথার বৃহৎ ও বিচিত্র জনতায়।

কোন কোন শুভানুধ্যায়ী এজন্যে অবশ্য প্রভৃত গঞ্জনা দেন আমাকে। তাঁরা বলেন, দর্শনশাস্ত্র বা সাহিত্যতত্ত্ব বা ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকের চেয়ে ভালো বই নাকি লিখতে পারতাম আমি। গল্প ও কবিতা লেখার দিকে অধিকতর মন দিলে, ঢের বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতাম নাকি। অভিনয় করলে নাকি যথেষ্ট টাকা এবং নামও করতে পারতাম। রাজনীতি করলেও, অনেক পেশাদারের চেয়ে অনেক বেশী চেলা ও দল বল জোটাতে পারতাম। কিন্তু অসীম আলস্য ও অফুরন্ত গল্পবাজীর ফলেই নাকি কিছু হল না আমার। সব কিছুরই টুকরো টুকরো ভগ্নাংশ মাথা জাগিয়ে রইল, সবগুলির সমবায়ে পূর্ণ সফলতা দেখা দিল না কোন বিষয়ে!

হয়ত দিল না, কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? জীবনটা ত একটা কল নয় যে, অবিরাম উৎপাদন করে, তাকে মুনাফা কামাতে হবে। সে একটা ফুল, সে আপন আবেগে ফুটছে, যেটুকু শোভা ও সুরভি আপনা থেকে আসছে বা এসেছে তাতে, তা-ই তার দান। কাড়াকাড়ি করে তার বেশী জোগাড় করতে আমি চাইও না, পারবও না। তাতে কাজের লোকদের তালিকা থেকে আমার নাম যদি কাটা যায় ত যাক। অকাজের বৃহৎ দুনিয়ায় যাঁরা দিকপাল, আমি গণনীয় হয়ে আছি তাঁদের সঙ্গেই। জানবেন, সেখানেও মহাপ্রাণ লোক নেহাৎ কম নেই!

প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, হাতের কাজে তিনি যতটা ফুটেছেন, মানুষটা তিনি ছিলেন তার চেয়ে ঢের বড। পৃথিবীতে অনেক মানুষ সম্বন্ধেই এ-কথা খাটে। অনেকেরই সমগ্র ত দূরস্থান, আংশিক পরিচয়ও ফোটে না তাঁদের কাজে। তাই বলে কি জীবন তাঁদের বৃথা? কখনো না! তাঁদের বুঝতে হবে, তাঁদের স্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে, তাঁদের স্বধর্মের মাপকাঠি ধরে। কাজেই চলতি অর্থে যাকে আলস্য বলে, তার দেখা পেলেই, কারুকে না-কাজের করে দেবেন না। পক্ষান্তরে কেউ উদয়াস্ত খাটছেন দেখেই, তাঁকে ষোল-আনা প্রশংসার শিরোপা দিয়ে সম্মানিত করবেন না।

দৃশ্যত অ-কাজের মধ্যেও কি কাজ হচ্ছে এবং কাজের মধ্যেও কত অ-কাজ পদে পদে ঘটছে, সেটা যাচিয়ে দেখবেন। আমার মতে সত্যিকার যা কাজ, তার গতি ধীর। সেখানে ছুটোছুটি নেই, নগদ প্রাপ্তির উগ্র উন্মাদনা নেই, অন্যের নিন্দা-প্রশংসার মুখাপেক্ষিতা নেই। তা সর্বদৃষ্টির আড়ালে নিঃশব্দ তপস্যায়, নির্মল দিবালোকের মত ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। এত শান্ত, এমন অচঞ্চল পদক্ষেপে আসে বলেই, তাকে আলস্য বলে মনে হয়। আসলে তা প্রাণ-ধর্মেরই সহজ প্রকাশ। তাকে কুঁড়েমি বলা মূঢ়তা! স্বার্থমগ্ন তথাকথিত কর্মিষ্ঠ মানুষরা তার মূল্য বুঝবেন কেমন করে?

নর-নারীর বন্ধুত্ব

স্ত্রী-পুরুষে বান্ধবতা হওয়া আমাদের দেশে ঘটনা হিসাবে এখনো অভাবনীয়। একটি পূর্ণবয়স্ক ছেলের সঙ্গে একটি পূর্ণবয়স্কা মেয়ের ঘনিষ্ঠতা ত দূরের কথা, চলনসই রকম মেলা-মেশা বা আদান-প্রদানের পিছনেও সমাজের কোন সমর্থন নেই। যে-সমস্ত পরিবারে রক্ষণশীলতা আজো আভিজাত্যের লক্ষণ বলে গণ্য, তাঁরা ত এই অসমর্থন সম্বন্ধে একেবারেই নিকুণ্ঠ। মেয়েরা বারোয়-তেরোয় পা দিলেই তাঁরা বাইরের পুরুষমানুষের লোলুপ দৃষ্টি সম্বন্ধে তাদের উঠতে বসতে সজাগ করে দেন। বাইরের পুরুষদেরও ভালো করে সমঝিয়ে দেন, বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কতখানি মাত্রা বাঁচিয়ে চলতে হবে। যে সমস্ত পরিবারে কতকটা পর্যন্ত চলনে আধুনিকতার পলস্তরা লেগেছে, তাঁরা অবশ্য বাইরে বড়-একটা ধরা দেন না। তাঁদের মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে, গান-বাজনা ও খানাপিনা নিয়ে নিঃসম্পর্ক পুরুষদের সঙ্গে একটু-আধটু মেশেও; কিন্তু নজর করলেই দেখা যাবে যে তাঁরাও এ বিষয়ে মনে-মনে খুব বেশী সহজ হয়ে উঠতে পারেন নি।

সকলেরই বক্তব্য এই যে, প্রকৃতি স্ত্রী ও পুরুষকে এমন ভাবে তৈরি করেছে যে তারা একে অন্যকে কামনা করবেই। এ-অবস্থায় যথাবয়সে তাদের হাতে যদি মেলা-মেশা ও লেন-দেনের অবাধ অধিকার ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ইচ্ছায় হক, অনিচ্ছায় হক, তারা অন্যায় করবেই। কাজেই সামাজিক স্থিতি এবং শালীনতার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পরস্পরের ভেতর যথাসম্ভব দেওয়াল তুলে রাখাই দরকার। এই দেওয়াল কিছুটা পর্যন্ত শিথিল করা যেতে পারে, একমাত্র বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষদের ক্ষেত্রে। কতকটা বলছি এই জন্যে যে, স্বামী-স্ত্রীতে প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতাও এদেশে বর্বরতা ছাড়া কিছু নয়।

কি রক্ষণশীল আর কি প্রগতিশীল, সকলেরই স্ত্রী-পুরুষের সংস্রব সম্বন্ধে মনোভাব যেখানে এই, সেখানে বন্ধুত্বের আর অবকাশ কোথায়? সর্বত্রই সন্দেহ, অবিশ্বাস, আর আশঙ্কা রেখেছে দুর্লঙ্ঘ্য চীনের প্রাচীরের মতো দুই সম্প্রদায়কে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করে। যেখানে খোলাখুলি এই প্রাচীরটা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে তবু সাবধান হওয়ার উপায় আছে। কিন্তু যেখানে আপাতদৃষ্টিতে এটা অদৃশ্য, সেখানে না বুঝেই একে অন্যের দিকে খানিকটা এগিয়ে যায়, তারপর প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে যখন, তখন টের পায় জিনিসটা আছে!

নিজের জীবনে এমন ঘটনা আমার হামেশাই ঘটেছে। এক-একটি সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সূত্র ধরে এক-একবার ভাব জমে উঠেছে, তারপরই কোথা থেকে নিজের অলক্ষ্যে মাথায় এসে পড়েছে প্রচণ্ড আঘাত। দু-জনে দু-দিকে ছিটকে পড়েছি।

অবাক হয়ে ভেবেছি, ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, সেই সনাতন সংস্কারের অচল প্রাচীর, যা জরাজীর্ণ হয়েও আজও আঘাত হানার শক্তি হারায়নি!

উচ্চ-শিক্ষার মই লাগিয়ে এই প্রাচীর অতিক্রমের চেষ্টা হচ্ছে আজ-কাল একটু-আধটু। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একত্রে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, ক্লাব-লাইব্রেরীতে, সভা-সমিতিতে যোগ দিচ্ছে, ট্রামে বাসে যাচ্ছে আসছে। সনাতনীরা এতে শিউরে ওঠেন, গেল-গেল শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করে ফেলেন বটে, কিন্তু আমরা পুরুষেরা জানি বাইরে থেকে ছেলে-মেয়ের এই পারস্পরিক সান্নিধ্যটা যতই চমকপ্রদ হক, ভেতরটা এর একদম ফাঁকা। পারিবারিক সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় সমর্থন নেই বলেই, জিনিসটা হয় একটা অপরাধের মতো, নয় একটা বাহাদুরীর মতো চেহারা নিয়ে থাকে। সহজ, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক বলে মনে হয় না কারো কাছে। যাদের নিয়ে কথা, বোধহয় তাদের কাছেও না!

সহ-অধ্যয়ন প্রচলিত আছে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে কিছুকাল পড়িয়েছিলাম। দেখেছি, সেখানে ছেলে-মেয়েরা যথাসম্ভব তফাৎ বাঁচিয়ে দু-দিকে দু-দল হয়ে বসত, আর সেই দু-পাশের শূন্য গণ্ডীটি আগলে বসতেন অধ্যাপক মহাশয়, দু-দলের সংস্কার ও সহবৎ সম্বন্ধে দায়িত্বশীল প্রহরীর মতো। দৃশ্যটা দেখলেই আমার কল্পনায় ভেসে উঠত আমারি প্রথম বয়সের সেই সব সহ-সম্মেলনের আসরগুলি, যাতে বাড়ীর বয়স্থা মেয়ের এবং বে-বাড়ীর বয়স্থ ছেলের গল্প-গুজবের ভেতর প্রক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত থাকতেন পিসিমা-মাসিমা প্রভৃতিরা। অথবা প্রতিনিধিরূপে একটা বাচ্ছা ছেলে বা মেয়েকে মোতায়েন রাখতেন। কি এই কলেজে, আর কি এই সব আসরে, ছেলেরা আর মেয়েরা কেউ কারো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে কি? সর্বদা একটা খবর্দার-খবর্দার ভাব। এর ভেতর আর যাই হক, প্রীতি জন্মাতে পারে না এবং তা যেখানে পারে না, বন্ধুত্ব সেখানে অভাব্য।

এই খবরদারী ভাব ঘরে-বাইরে এমনি প্রবল যে, পিসিমা-জ্যাঠামশায় এণ্ড কোম্পানীর দৃষ্টির আড়ালে এসেও ছেলে-মেয়েরা একে অন্যের দিকে সহজ ও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকাতে পারে না। ট্রামে-বাসেই তার জলন্ত প্রমাণ পাই প্রতিদিন। এক-গাড়ী লোকের সতর্ক চোখের সামনেও একটি অপরিচিত যুবক একটি অপরিচিতা তরুণীর পাশে বসে যেতে পারে না। অথচ ঐ তরুণী হয়ত একটি এম-এ ক্লাশের ছাত্রী, নয়ত কোন কলেজের অধ্যাপিকা। যুবকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কোন পককেশ বৃদ্ধেরও সে সুযোগ নেই। আজকের দিনে যখন গাড়ীতে দাঁড়িয়ে গাদাগাদি করে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই, তখন মেয়েরা গাড়ীতে উঠেই সর্বাগ্রে জানালা-সিট নারক

রক্ষা-কবচটি সন্ধান করেন এবং সেটা যদি ইতিপূর্বে গোঁফ-দাড়ির দ্বারা অধিকৃত হয়ে থাকে, তাহলে তখনি তা খালি করিয়ে তার উপর চেপে বসেন, কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সংকোচ বোধ না করে।

কিন্তু কেন? এক-ক্লাস ছেলে-মেয়ের বা এক-গাড়ী যাত্রীর ভেতর একটা পূর্ণবয়স্ক ছেলে আর একটা পূর্ণবয়স্ক মেয়ে কেন একে অন্যের কাছে সহজ হতে, স্বচ্ছন্দ হতে পারে না? পারে না সেই সনাতনী সংস্কারের উৎপাতে, যা ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের শেখায় ছেলেদের সম্বন্ধে দিবা-রাত্রি সজাগ থাকতে। পাছে কোন অতর্কিত সুযোগে হঠাৎ তারা একটা কিছু করে বসে! আর ছেলেদের শেখায় মেয়েদের সম্বন্ধে যথাসম্ভব সীমানা বাঁচিয়ে চলতে, যেহেতু তার ব্যতিক্রম মাত্রেই দণ্ডের সম্ভাবনা রয়েছে। জন্ম থেকেই এই বনিয়াদী দাওয়াইতে ধাত বেঁধে দেওয়া হয় বলেই, অন্তঃপুরের বাইরে এসেও তারা জেনে না-জেনে তারি দাসত্ব করে চলে। সমস্ত সময়টা যায় শুধু গা-বাঁচাতেই, ঘনিষ্ঠ আর হবে কি করে তারা? তাই অন্তঃপুরের এই অদৃশ্য প্রেতের বোঝা পিঠে নিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে পথে-বেরুনো কোন তরুণীকে যখন দেখি, তখনি বুঝি ইনি কে! তরুণী বান্ধবীর মহিমায় মুগ্ধহৃদয় কোন তরুণের সঙ্গে যখনি আলাপ করি, তখনি চিনি ইনি কোন মৃত্তিকার ফসল! ভেতরে ভেতরে জাগ্রত রয়েছে প্রচ্ছন্ন একটা অপরাধ বোধ, যা কিছুতেই সুস্থ হতে দেয় না নর-নারীকে, পরস্পরের মধ্যে এক ফোঁটা সান্নিধ্যের সুযোগ হলেও! আমি ত মনে করি, এর চেয়ে বড় অস্বাস্থ্য আর কিছুই হতে পারে না সমাজের।

এ কথা অবশ্য বলছি না আমি আর কেউই বলবেন না, যে প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীকে বান্ধবতার ছদ্মবেশে অবাধ বথামির অধিকার দিতে হবে। তাতে বন্ধুত্বের অপমৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর প্রীতি বা পরিচিতি যে জৈব পথে অভিব্যক্ত হবেই, এ-কথা মনে করার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে? বরং আমার ত মনে হয়, আশৈশব ছেলে-মেয়েদের পরস্পর সম্বন্ধে অসংখ্য বিধি-নিষেধের দ্বারা সতর্ক করে দেওয়ার ফলেই, তারা পরস্পর সম্বন্ধে প্রয়োজনাতিরিক্ত সচেতন হয়ে পড়ে। আর সেই সচেতনতার উত্তাপ স্বল্পমাত্র সুযোগেই বিষম বিস্ফোরণ ঘটায়। এমনকি, সোজাসুজি ভাবে যেখানে সুযোগ নেই, সেখানেও মনের উদ্ধত কৌতূহল সুযোগ সৃষ্টি করে নেয় জোর করে। সমাজ যদি পরস্পরের মধ্যে সহজ সম্পর্কের আদান-প্রদান স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করে, তাহলে এই সুযোগান্বেষিতা বা নগদ মূল্য আদায়ের মনোভাব থাকবে না, থাকতেই পারে না। বলা বাহুল্য তখনো একটি আঠারো বছরের মেয়েকে একটি বাইশ বছরের ছেলের ভালোই লাগবে, যেমন আজও লাগে। কিন্তু সেদিন এই ভালো

আগাকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে দরকার হবে স্থূল জৈববৃত্তির চেয়ে সূক্ষ্মতর জিনিসের এবং সেটা দু-পক্ষেরই।

আর যদি কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমই হয়, সে-ও আমি ভালো মনে করি, এই তথাকথিত বিশুদ্ধি রক্ষার নামে মানসিক অপচয়ের চেয়ে, যেহেতু তা সত্তার গভীরে কোন অস্বাস্থ্যকর আবর্ত রচনা করতে পারবে না। জগৎ ও জীবনের দিকে খোলা চোখে তাকানোর, সত্যকে সমগ্র করে উপলব্ধি করার সহায়ক হবে সেই সাময়িক স্খলন-পতন। একটা বন্ধুত্ব তাতে নিষ্ফল হলেও, পরেরটা সফল হবে, সুন্দর হবে, সম্পূর্ণ হবে। অস্তিত্বের খিড়কি দোরে বাস্তবকে গোপনে স্বীকার করে, সদর দোরে আদর্শের জাল বিছিয়ে রাখা যে ধরনের মনুষ্যত্ব, তা থেকে দেশকে মুক্তি দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, সময় বদলেছে এবং সেই বদলের ফলে সমাজের কাঠামো গেছে নড়ে। আজ অষ্টমবর্ষে গৌরীদানও হয় না, পঞ্চদশ বর্ষে পুরুষের বাপত্ব প্রাপ্তিও হয় না। দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই অবিবাহিত থাকতে হয় এবং নানা কার্য-কারণ সূত্রে বারবার এক পক্ষকে অপর পক্ষের সংস্পর্শে আসতে হয়। এ অবস্থায় উভয়ের মাঝখানে একটা অর্থহীন সংস্কারের প্রাচীর খাড়া করে রেখে লাভ কি? স্ত্রী এবং পুরুষ যে একে অন্যের পরিপূরক এবং জীবনের প্রত্যেকটি ধাপেই যে একের সান্নিধ্য, সাহচর্য, প্রীতি ও সহযোগিতা অন্যের সম্পূর্ণতার জন্যে চাই, বিনা তর্কেই মেনে নিতে হবে সে কথা। ব্যতিক্রমরূপে নয়, স্বাভাবিকরূপেই নিতে হবে এই পরিবর্তনকে। বৃদ্ধেরা যদি না-ই পারেন ততখানি রমনীয়তা আশ্রয় করতে, তরুণ-তরুণীদেরই অগ্রণী হতে হবে। তাঁদেরই বোঝাতে হবে সকলকে যে নর-নারীর সম্পর্ক শুধু বিবাহ বা অপত্য-বিধানেই সীমাবদ্ধ নয়, তার বাইরেও আছে তার প্রকাণ্ড একটি সার্থকতার দিক, যে-সার্থকতা মনুষ্য-জীবনের পরমার্থ স্বরূপ।

নিজের একটা কথা বলেই শেষ করব আমার বক্তব্য। আকৈশোর আমি কামনা করেছি সমবয়সী মেয়েদের সংস্পর্শ ও প্রীতি। পেয়েছিও অনেকবারই। কিন্তু প্রত্যেকবারই ভেঙে গেছে বন্ধুত্ব। নিজেদের কোন অন্যায় আচরণে বা অবিবেচনায় নয়, অন্যের অকরুণ হস্তক্ষেপে। অগৌরব এবং অবমাননাও লাভ হয়েছে কম নয়। নির্মোহ বিচার-বুদ্ধি নিয়ে আজ বলতে পারি, এঁদের যে-কোন একজনের বন্ধুত্ব যদি স্থায়ী হত আমার ভাগ্যে, তাহলে তা-ই হত এ জীবনে আমার সব চেয়ে বড় পাথেয়। হয়ত হত তাঁরও। জানি না আমার বান্ধবীরা আজ কে কোথায়। যেখানেই থাকুন, তাঁদের উদ্দেশ্যে জানাই আমার অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভিবাদন। অনেক দিয়ে গেছেন তাঁরা জেনে এবং না-জেনে।

প্রেম বনাম আত্মহত্যা

সকালবেলা শুনলাম, পাড়ার একটি যুবক ভোররাত্রে আত্মহত্যা করেছে। ছেলেটি ছিল গ্র্যাজুয়েট, আর কিঞ্চিৎ সাহিত্য-বাতিকগ্রস্ত। সকালের দিকে আমার কাছে আসত এক-এক দিন। ব্যবহারে ও কথাবার্তায় সলজ্জ সম্ভ্রমশীলতা এবং নানা বিষয়-সম্বন্ধে প্রশ্নশীল জিজ্ঞাসুর ভাব যা তাতে দেখেছি, তা ভালো-না লাগবার মতো নয়। হঠাৎ যখন আজ শুনলাম সে আর নেই তখন অবাক বিস্ময়ে তাই বারবার মনে হতে লাগল, এমন মিষ্টি ছেলেটির অন্তরে কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল সেই আত্মদ্রোহের আগুন, যা আজ ভয়াবহ বিস্ফোরণে উৎসারিত হয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলল?

ভাবছি আর আধ ডজন খবরের কাগজ ও স্তূপীকৃত প্রুফের অরণ্যে বিভ্রান্ত পথিকের মতো পথের নিশানা খুঁজছি। ইতিমধ্যে গৃহিণী এসে দাঁড়ালেন। হাতে চা, কোলে খোকন এবং চোখে-মুখে অদ্ভুত একটি আবিষ্কৃতির ঔজ্জ্বল্য। নিঃশব্দে দৃষ্টি উপভোগ করলাম একবার, তারপর গৃহ-পালিত ভদ্রলোকটির মতো আবার কাজে মন দিলাম। কিন্তু মনটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে! ঐ যে আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্তপ্ত বাষ্পে বোঝাই একটি তরুণ গলির মোড়ে বিদীর্ণ-প্রান দেহপিণ্ড নিয়ে পড়ে রয়েছে, আর দলে দলে কৌতুক-বিলাসী নর-নারী এসে জড়ো হয়েছে চার পাশে, মুখে লোক দেখানো সহানুভূতি এবং মনে মনে যুগ-ধর্মের প্রভাব ও আধুনিকদের অধঃপতন সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করতে সেখানেই বারবার নিষ্ফল বেদনায় ঘোরাফেরা করছে। কারণ আমি সেই দলে নই, যারা আত্মহত্যাকে একটা উন্মত্ততা বা স্নায়বিক দৌর্বল্য ভাবপ্রবণতার আতিশয্য বলে মুহূর্তে খতম করে দেন এবং যারা এ কাজ করে, তাদের সাংসারিক দায়িত্ব বহনের অযোগ্য এবং জীবন-সংগ্রাম থেকে পলায়নপর বলে উপেক্ষা মিশ্রিত করুণায় অশ্রুতে অভিষিক্ত করে থাকেন!

গৃহিণী বললেন, জানালা দিয়ে সামনের বাড়ির বউয়ের সঙ্গে তাঁর যা কথা হয়েছে, তাতে এইটুকু প্রকাশ যে আত্মঘাতী ছেলেটি অনেক দিন থেকে বেকার ছিল এবং সেই জন্যে বাড়ীতে তার সমাদর ছিল না। তার ওপর ও নাকি একটি মেয়েকে ভালোবাসত। সে একে অন্য জাত, তাতে ধনীর কন্যা, তাই শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে তার বিয়ে হল না। পরশু দিন তার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে। ঘরে বাইরে এই ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ছেলেটি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

বিবরণটি নিঃশব্দে শুনে গেলাম। কিন্তু এতেই গৃহিণী মুক্তি দিলেন না, সব শেষে তিনি একটি মন্তব্য করলেন। বললেন, যাই বলো বাপু, এ-সব বড় বিচ্ছিরি হয়েছে

আজ-কাল। এমন ভালো ওয়া কেনই বা বাসে, যাতে শেষ পর্যন্ত বিয়ে-থাওয়া হয় না, আর বিয়ে যদি না হয় ত এমন করে তার জন্যে মরেই বা কেন? দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ভালোবাসা করে বিবাহ হয়নি, বিবাহ করে ভালোবাসা হয়েছে। সুতরাং তাঁর কাছে এই স্বাধীন প্রেমের মূল্য এবং তার ব্যর্থতায় দুঃখ কল্পনার বিষয়। আমি কিন্তু বুঝতে পারি, এর ভেতর অসঙ্গতি কিছু নেই। যথাবয়সে পুরুষের জন্যে মেয়ের এবং মেয়ের জন্যে পুরুষের আকর্ষণ জন্মায়, সেটা প্রকৃতির ব্যবস্থা। কিন্তু পণের দায়ে মেয়েকে এবং বেকার দশার দরুণ ছেলেকে বাধ্যতামূলক কৌমার্য পালন করতে হয় দীর্ঘদিন। অথচ সমাজের ধরন গেছে এমন বদলে, যাতে ছেলেরা এবং মেয়েরা কলেজে, সভায়-সমিতিতে, ক্লাবে, লাইব্রেরীতে পরস্পর মেলামেশা করবার সুবিধা পায় সর্বদাই। এর ফল না ফলে যাবে কোথায়?

হাতে যাদের অর্থ নেই, সমাজে যাদের মর্যাদা নেই, রাষ্ট্রে যাদের নেই কর্তৃত্ব, ব্যক্তিগত প্রেমের ব্যাপারে পর্যন্ত ব্যর্থমনোরথ হলে তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ই। তখন নিজের অজ্ঞাতসারেই তাদের মনে জাগে সেই বিদ্রোহ, যা অন্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হতে পারে না বলে শেষ পর্যন্ত প্রতিহত হয়ে এসে লাগে নিজের গায়ে। আত্মহত্যা সেই অন্তর্নিহিত বিদ্রোহের বহির্মুখী প্রকাশ, তাই কোনদিন আমি একে সামান্য মনে করি না।

কিন্তু গৃহিণীকে এত কথা বোঝানোর অবকাশ নেই। পত্নীব্রত স্বামীর সংসারে যথাবয়সে সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়ে তিনি বর্ণাশ্রমের গদী অধিকার করেছেন, যার বাইরে দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা। স্বীকার করব, আমার দিক থেকে সেটা লাভেরই হয়েছে। কিন্তু এ-কথা কটু হলেও না বলে উপায় নেই যে, প্রেম বলে যে বিশেষ একটা বস্তু পৃথিবীতে আছে, বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের জীবনে তার স্বাদ কিছুটা পানসে। বিবাহিত সম্বন্ধের ভেতর পারস্পরিক নির্ভরতা আছে, আশ্বাস আছে, বিশ্বাস আছে, সেবা, প্রীতি, ক্ষমা আছে ঠিকই, কিন্তু সবই কেমন যেন মিয়ানো!

যে উত্তপ্ত আত্মবিস্মৃত উচ্ছৃঙ্খলতা আঠারো বছরের মেয়ের আর বাইশ বছরের ছেলের বুকে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করে, যার মুখে শিক্ষা-দীক্ষা আচার-অনুষ্ঠান লাভ-ক্ষতি, এমনকি জীবন পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়, বিবাহ তার মুখে পরিয়ে দেয় শক্ত একটা বিধি-ব্যবস্থার লাগাম। তার বন্ধন মেনে চললে বৈষয়িক দিক থেকে লাভ আছে হয়ত, কিন্তু সমস্ত বিষয়ের অতীত যে মানুষের মন, তা ওতে ক্লিষ্ট হয়। বলা যেতে পারে, তার আর উদ্বৃত্ত এমন সঞ্চয় থাকে না, যা নিয়ে পৃথিবীকে, তার বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-দারিদ্র্যকে রঙীন করে দেখা যায়। চোখ-কান বুজে এই বয়সটা সন্ন্যাসের, পলিটিক্সের, নয়ত সাহিত্য-সেবার নেশায় কোন রকমে পার করে দিতে পারলে, হয়ত একক জীবন

অনেকটা অভ্যাস হয়ে আসে, ভেতরের ঝড়ও আসে জুড়িয়ে। আর বিয়ে হয়ে গেলে ত কথাই নেই। কিন্তু এ-সব নেশা যাদের নেই, বিয়েও হয়নি, অথচ পরস্পরে মেলা-মেশার সুযোগ আছে, তাদের অবস্থাটা বিচার্য।

তারা কি করবে? প্রকৃতির অঙ্কুশ তাড়নায় তারা ছুটবে উন্মত্ত হয়ে একে অন্যের দিকে। অথচ শেষ পর্যন্ত ধাক্কা খাবে সমাজের সুরক্ষিত প্রাচীরে, নয়ত পড়বে অর্থ-কৃচ্ছ্রতার অন্ধকার গহ্বরে। তখন তারা এ পৃথিবীকে যে চোখে দেখবে, তা বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণের চোখ নয়, তা লক্ষ্যভ্রষ্ট তরুণের চোখ। এ-বয়সের উত্তাল সমুদ্র পার হয়ে এসেছি, এ-পারে দাঁড়িয়ে আজ আর ও-পারে তাকাতে পারি না। কিন্তু ও-বয়সের স্মৃতি এখনো মন থেকে মুছে যায় নি। বুঝতে পারি, অন্যকেই হক আর নিজেকেই হক, ও-বয়সের অবস্থা-বিপর্যয়ে হত্যা করাটা খুব কঠিন কাজ নয়। যারা তা করে, তাদের জন্যে তাই আমার মমতার অন্ত নেই।

আমি মনে করি, নিজের ওপর মানুষের যে মমতা, তাকে অতিক্রম করে যাবার শক্তি থেকেই আসে আত্মহত্যার প্রেরণা। সে শক্তি কম দুর্লভ নয়। সামান্য একটু হোঁচট খেলে আহত স্থানটিতে বারবার হাত বুলাতে হয়। অল্প একটু ছেঁকা লাগলে, থেকে থেকে মনে পড়ে সেই জায়গাটা। এত বড় অনতিক্রমণীয় দাসত্বকে এক মুহূর্তে ছাড়িয়ে ওঠে যারা, তারা যে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও খুব বড় একটা মানসিক শক্তি অর্জন করে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

এ-শক্তি স্নায়বিক বিকৃতির ফল, কি আকস্মিক উন্মাদনার প্রভাব, সে-বিচার বিজ্ঞ লোকের জন্যে। সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় সহকারে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা অধিকতর লাভজনক কিনা, সে কথাও তাঁদেরই বিচার্য। যে বয়সের যেটা সত্যি, সে বয়সের পরে তার দাম কানা-কড়িও না হতে পারে। কিন্তু বয়স যদি সত্যি হয় ত তার যে-কোন পর্বই সত্যি। তাই বলছি, আঠারো বা বাইশ বছুরী সত্যকে পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ বছুরী সত্য দিয়ে দাবিয়ে দিতে গেলে চলবে কেন? যে-বয়সে প্রেম মেয়ের বিয়ে এবং ছেলের চাকরিতে এসে সীমাবদ্ধ হয়, সে-বয়সে এক জোড়া ছেলে-মেয়ে কেন যে একে অন্যকে না পেলে জলে ডোবে, তার মানে বোঝা যায় না। কিন্তু যারা ডোবে, তারা নিজেদেরকে কম ভালোবাসত না এবং যখন ডুবেছে, তখনও সেই আত্মপ্রীতির ব্যর্থতাই তাদের নিয়ে গেছে আত্মবোধের বাইরে। এই জন্যেই বলছিলাম, আত্মহত্যা যারা করে, তারা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মানুষ নয়, ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ তারা।

এই ছেলেটির কথা ভাবছি। এই রকম কত তরুণই ত পৃথিবীতে নিত্য-নিয়ত

আত্মহত্যা করছে। কাহিনী সেই একই : একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে। এদের জন্যে পৃথিবী জুড়ে চলছে অনুতাপ, দুঃখ, দয়া, আর উপদেশের পালা। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা কাটিয়ে, সমস্ত সংস্কার ও বিষয়-বুদ্ধি দূরে সরিয়ে রেখে, যখন এদের কথা ভাবি, তখন মনের সামনে ভেসে ওঠে কতকগুলি অশরীরী আত্মা, যারা জীবনের মূল্য দিয়ে অতি সামান্য জিনিসকেও করে গেছে বরণীয়। যে-মেয়েকে হয়ত আপনি হাতে-পায়ে ধরলেও গ্রহণ করতেন না, তারি জন্যে কেউ প্রাণ দিয়েছে। যে-অপমান আমি গায়ে মাখতাম না, তারি প্রতিবাদে কেউ আত্মনাশ করেছে। সুতরাং মূল্যটা কার, জিনিসের, না যে দেয় তার? জানি না, কিন্তু যে দেয় তাকে আমি তুচ্ছ বলে ভাবতে পারি না কোনদিন।

চিঠি পাওয়া ও দেওয়া

চিঠি দিয়ে ঠিক সময়ে তার উত্তর পাওয়া এদেশে একটা স্মরণীয় ঘটনা। সকলেই চিঠি পাওয়া পছন্দ করেন, না পেলে অনুযোগ করেন। কিন্তু জবাব দেবার বেলা গড়িমসি করেন প্রায় সবাই। আজ নয় কাল করতে করতে অনেক সময় বিশেষ জরুরি চিঠির কথাও মন থেকে মুছে যায় এবং তার জবাবই দেওয়া হয় না আর। অন্যের কথা কি বলব, আমি নিজেও এ বিষয়ে কম অপরাধী নই।

মনে আছে, একবার এক আত্মীয়া বি-টি পরীক্ষা-সংক্রান্ত কয়েকটা আইন-কানুন জানবার জন্যে চিঠি দিয়েছিলেন। খোঁজ-খবর নেওয়ার কাজ সেরে যখন তাঁকে উত্তর দিলাম, তখন পরীক্ষা প্রায় শুরু হবার মুখে। একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আমার উত্তর না পেলে. কোন প্রকাশক একটি কাজের ভার অন্যকে দিয়ে দেবেন বলে জানান। সে তারিখের ঠিক দেড় মাস পরে তাঁকে উত্তর দিই।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আত্মীয়াটিও পরীক্ষা দিয়েছেন, বন্ধুটির কাজের ভারও শেষ পর্যন্ত আমার হাতেই এসেছে, অন্যত্র চলে যায়নি। এর থেকে এই কথাই বুঝতে হবে যে, চিঠি-পত্রের আদান-প্রদানটা আমরা কেউ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না। কিন্তু মজা এই যে, ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের নালিশের অন্ত নেই। মফঃস্বল থেকে কোন আত্মীয় হয়ত লিখলেন, কলকাতায় শুনছি গরম জামা এবার খুব সস্তা। কি রকম দাম এবং একটা পাঠাতে কত খরচ পড়বে লিখো তো। এই অতি জরুরি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হল না। বলা বাহুল্য ইচ্ছে করে নয়, একান্তই আলস্যের দায়ে। যথা-কালে সেই আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা এবং এ নিয়ে তাঁর অফুরন্ত ক্ষোভ! একটু-আধটু খোঁচাও দেন এই বলে ইদানীং বড়লোক হয়ে গেছি, আত্মীয়-বন্ধুকে আর পাত্তা দিই না! কিন্তু সেই আত্মীয়কে যদি মনে করিয়ে দিই যে, আমিও একটা জমির ব্যাপারে চিঠি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কোন উত্তর পাইনি, তাহলে নিশ্চয় তিনি অপ্রতিভ হয়ে পড়বেন। সেই জন্যেই তা আর করি না। কিন্তু তিনি সেটা বুঝতে পারেন না এবং না পেরে চটেন, আমি বুঝতে পারি বলেই তা নিয়ে মনে মনে একটা আমোদ পাই।

অবশ্য এটা ঠিক যে, আমার যা জরুরি, আপনার কাছে তার মূল্য এক নয়। কাজেই আমি যদি আশা করি যে, আপনি আমার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র মাথায় গামছা বেঁধে ছুটতে শুরু করে দেবেন, তাহলে আমাকে হতাশ হতেই হবে। আপনার নিজেরও জরুরি কাজ থাকতে পারে, আপদ-বিপদ, পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে, আমার প্রয়োজনের সময় সে সব কথা আর ভাবাই হয় না। তাই লিখি, আশা করি পত্রপাঠ

মাত্র এ-বিষয়ে একটা বিহিত করবেন, যা পড়ে আপনার হয়ত গা জলে ওঠে, নয়ত যা পড়ার সময় হয় না কিংবা যা পড়ে এবং যথেষ্ট সদিচ্ছা নিয়েও শেষ পর্যন্ত আপনি বেমালুম ভুলে যান। এর কোনটাই অন্যায় বা অস্বাভাবিক নয়। তাই এর কোনটা নিয়েই আমি কিছু মনে করি না।

যখন আমি আপনাকে কোন কাজের বরাত দিয়ে চিঠি দিই, তখন আমার মনটা আমি আরোপ করি আপনার ওপর এবং ধরে নিই যে, আমি নিজে হলে যা করতাম আপনি আমার হয়ে ঠিক তা-ই করবেন। এটা অন্ধ আত্মাদর ছাড়া আর কিছুই না। কারণ, আমার নিজস্ব মূল্য আমার কাছে যাই হক, আপনার কাছে—সে আমি যদি আপনার অতি ঘনিষ্ঠ জনও হই—তা ততখানি হবে কেমন করে? আমার নিজের সুবিধা-অসুবিধার জন্যে আমার যে চাড়, তার মূলে রয়েছে আমার যে ভিতরকার তাগিদ, আপনার মধ্যে সেটাই বা আসবে কোথা থেকে? তাই নিজের দায়ে আমি আপনার মনে দায় সৃষ্টির জন্যে যখন উঠে-পড়ে লাগি, তখন আপনার মন হয়ত থাকে বিষয়ান্তরে লিপ্ত এবং সেই কারণেই আমার আবেদন আপনার মনে ওপর পর্দা দিয়ে ভেসে চলে যায়, তাতে কোন আঁচড় কাটতে পারে না। এজন্যেই আমরা 'পত্রপাঠ' মাত্র কারো কিছু করে উঠতে পারি না।

আর এই সঙ্গে যে সুদূর-বিসর্পী একটা আলস্যেরও যোগ আছে, তা বলাই বাহুল্য। ঠিক আলস্য নয়, কেমন যেন সব জিনিসের ওপর দিয়ে আলগোছে পা ফেলে চলার ভাব! কাজ-কর্ম, আত্মীয়-বন্ধু, চিঠি-পত্র, অনেক কিছুর জনতার ভেতর দিয়ে চলেছি, অথচ ভেতরে ভেতরে জাগিয়ে রেখেছি মনের একটা আড়াল, সংসারের সংযোগের ধারাটা হয়ে রয়েছে আলগা, এত আলগা যে কিছুতেই যেন আমার কিছু যায় আসে না—এই সুশীতল অতলস্পর্শ আলস্যেরও কিছু হাত আছে বৈকি চিঠি-পত্র না লেখার পিছনে।

কিন্তু তাই বলে আমি চিঠি দিতে ভালোবাসি না, বা দিই না ভাবলে ভুল হবে। বরং আমি বড় বেশীই চিঠি দিই। বাড়ীর সকলেরই, বিশেষত স্ত্রীর অপ্রসন্নতা থেকে বুঝতে পারি, আমার এই চিঠি লেখার অভ্যাসটা অন্যান্য অনেক বদ অভ্যাসের মতো তাঁদের দৃষ্টিতে যথেষ্ট সহনীয় নয়! তাঁদের এ কথা বোঝাতে পারলে সুখী হতাম যে, চিঠি লেখা জিনিসটা আমার একটা বিলাসিতা। ওটা কারো সঙ্গে আত্মীয়তা পাতানো বা কোন সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধন, বা এমনি ধারা কোন কাজের কাজ নয়। ওতে আমার মন তার দড়ি আলগা করে, আশ-পাশের দুনিয়ায় এলোমেলো পায়ে চলা-ফেরা করবার সুবিধা পায়।

কিন্তু আমি কি ধরনের চিঠি লিখি ? অত্যন্ত জরুরী বৈষয়িক ব্যাপারেও আমার টনক নড়ে না, আর তাতে পরের ত বটেই, নিজেরও প্রচুর কার্যহানি হয়, এ-কথা ত আগেই বলেছি। আমি লিখি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, এমনকি বিষয়-নিরপেক্ষ চিঠি, যা কবিতাও হয়, বক্তৃতাও হয়, অনেক সময় ছোটগল্পও হয়ে যেতে পারে। এক-এক সময় মনের মধ্যে এক-একটা ভাবের তরঙ্গ চলতে থাকে। তাকে কেন্দ্র করে অনেক কথাই অন্তরে কল্লোলিত হয়ে ওঠে, অথচ তাতে ঠিক সেই শ্রেণীর পারম্পর্য বা শৃঙ্খলা থাকে না, যাতে ভাবী কালকে বা বাইরের জনসাধারণকে ডেকে সেই সমস্ত উড়ন্ত ভাবনা ও চলন্ত অনুভূতির বার্তা শোনানো যেতে পারে। সেই চলতে চলতে রং-বদলানো, গড়তে গড়তে ভেঙে-যাওয়া, কতক স্পষ্ট, কতক আবছা এবং বৈষয়িক দিক থেকে বেশ খানিকটা অসংলগ্ন চিন্তাপুঞ্জ কোন পরিচিত মানুষকে ডেকে শোনানোর জন্যেই আমি লিখি চিঠি।

কাজেই আমার চিঠিতে বিষয় এবং ব্যক্তি দুটোই উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে নিজের মন, তাকে নিয়ে খেলা করবার জন্যেই আমি চিঠি লিখি। সে-চিঠি যার উদ্দেশে পাঠাই, তার সঙ্গে তার যোগ থাকে সামান্যই। সে হয়ত তা পেতেও চায় না এবং যখন জবাব দেয়, তখন ষোল-আনা বাইরের আজে-বাজে কথা দিয়েই পাতা ভরায়। তবু !

এই সমস্ত চিঠির বক্তব্য হাতের কাছে কাউকে ডেকেও বলতে পারি হয়ত, কিন্তু তা কোনদিন বলি না। সামনা-সামনি যাকে পাই, তাকে সরাসরি পাই বলেই, তার ও আমার মধ্যে কল্পনার কোন অবকাশ থাকে না। অনুমানের বিস্তৃত আকাশে তাকে বৃহৎ করে মনের মতো করে গড়ে নিতে পারি না। সে অনেকটা মুঠোর ভেতর ধরা পড়ে যায়, তাই তাকে নিয়ে কাজ চলে, কবিতা চলে না। যে আছে দূরে, দৃষ্টি-সীমার বাইরে, ধরা-ছোঁয়ার এলাকা পেরিয়ে, অথচ যে দুর্লভও নয়, দুর্গমেও নেই, এমন মানুষদের নিয়েই ত স্বপ্ন ! সেই স্বপ্নই মনকে নাচায়, অনুভূতিকে দেয় ভাষা। আমি চিঠি লিখি এই স্বপ্নের আকর্ষণে। আমার চিঠি কোনদিন উদ্দিষ্ট শ্রোতাকে সামনে নিয়ে গড়ে ওঠে না। কিন্তু স্বপ্ন আমারই, শ্রোতা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তার বাইরে থাকে, তাই জবাবটাও আসে বাইরে থেকে। কিন্তু জবাবের ব্যগ্রতাতেই চিঠি লিখি না, কাজেই সে-জন্যে ঔৎসুক্যও থাকে না আমার।

অবশ্য চিঠি পেতে কি আমি ভালোবাসি না, অথবা তা পাবার জন্যে কি আমার কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নেই ? অবশ্যই আছে। কিন্তু যার চিঠি আমি পেতে চাই, তাকে চিঠি দিয়ে আমি উত্তরের জন্যে প্রতীক্ষা করতে পারি না। অপ্রত্যাশিত চমকের মতো

কোনদিন শীতের মিষ্টি সন্ধ্যায়, নয়ত গ্রীষ্মের ঝাঁঝালো দুপুরে একখানা চিঠি—দশ লাইন, বিশ লাইন, যাই হক এবং যে কথাটা শুনতে চাই, সেই কথাটা ছাড়া আর সব কথাই—পাবার জন্যে আমারও লোভ আছে এবং দাদন দিয়ে এই মুনাফাটুকু আদায় করে একে কারবারে রূপান্তরিত করতে আমি চাইনে।

কিন্তু এ-রকম চিঠি আসে কৈ? বাড়ি ফিরে রোজই লেটার-বক্স হাতড়াই। কত রকম বিরক্তিকর বাণ্ডিল পাই তাতে: লেখার জন্য সম্পাদকের অনুরোধ, প্রতিশ্রুত সময়ে টাকা দেবার অপারগতা জানিয়ে প্রকাশকের নোট, প্রুফ-সিট, প্যামফ্লেট, ক্যাটালগ, দু-চারখানা আত্মীয়ের চিঠি, তাতে কন্যার বিবাহে আর্থিক সহায়তার প্রার্থনা, এক বোতল পাঁচন পাঠানোর নির্দেশ, পৌষমাস উপলক্ষে কালী-দর্শনের জন্যে কালিকাক্ষেত্রে আসবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন, এমনি অনেক কিছু।

কিন্তু যে-চিঠি পেলে প্রাণ ভরে যায়, পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আপন ঐশ্বর্যে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে যা উন্নীত হয় অনির্বচনীয়তার স্তরে, নিরুত্তর প্রসন্নতায় যা চিন্তাকে করে ভাবলোকে উধাও, তেমন চিঠি আসে কালে-ভদ্রে, আর তা আসে বলেই তার মূল্য এত! তার কল্পনা এত উচ্চ! সাংসারিক প্রয়োজনের পথ ধরে প্রত্যহই রাশি রাশি চিঠি আসে, সেগুলো সবই বৃথা জঞ্জাল। প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবার পর ঘরের আনাচে-কানাচে তারা মৃতদিনের কঙ্কালের মতো অনাবশ্যক জনতা সৃষ্টি করে পড়ে থাকে। চা বানানোর জন্যে তাই সেগুলোর যখন সদ্‌গতি হয় তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। মনে হয়, অনেক অপটুতা, অক্ষমতা ও অসাধুতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পুড়ে শেষ হল। কিন্তু যে-চিঠি সত্যিই আমার প্রিয়, তা কি আমি জমা করে রাখি? না তার সুরভি সঞ্চিত থাকে স্মৃতিতে, চিঠিটা ভেসে চলে যায় কালের প্রবাহে।

বই হারানো

বই কেনা ও বই পড়ার নিয়মিত অভ্যাস যাঁদের আছে, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে বই হারানো বলেও একটা ব্যাপার আছে, যার হাত থেকে কারো অব্যাহতি নেই। কোথা দিয়ে কখন যে কোন্ বইটা হারায় এবং একবার হারালে আর সেটা পূর্ব মালিকের হাতে কেন যে ফিরে আসে না, এ আমার কাছে চিরদিন একটা রহস্য। এ থেকে আমার ধারণা হয়েছে এই যে, বই জিনিসটা আসলে সচল। ওর ধর্মই হচ্ছে এক হাত থেকে আর এক হাতে, তা থেকে আবার আর এক হাতে খালি উড়ে-উড়ে বেড়ানো। যত সাবধান হয়েই থাকুন এবং যেমন খুশী মনোযোগ দিয়েই আগলে রাখুন, একদিন দেখবেন, সমস্ত অবরোধ ভেঙেই কোথা দিয়ে দু-চারখানি বই ভেগেছে এবং তা আজও গেছে, কালও গেছে। গোটা পৃথিবীটা হাতড়ালেও আর তাদের পাত্তা পাবেন না।

হঠাৎ কোনোদিন অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই একটা বইয়ের স্মৃতি মনকে পেয়ে বসে। মনে হয় সেটা তখনি না পেলে নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ঠিক সেই বইটিই আর পাওয়া যায় না। আলমারি, ড্রয়ার, টেবিল, চৌকির তলা, সুটকেশ, কাগজের স্তূপ সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গা তোলপাড় করে ফেলি। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের ধমকাই, গৃহিণীকে বকুনি দিই, বইয়ের মূল্য বা মর্যাদা যারা বোঝে না, কোন্ বইটা কখন দরকার হতে পারে সে ধারণাই নেই যাদের, যারা মনে করে ছাতা, হারিকেন বা ষ্টোভের মতো সংসার জীবনে বইয়ের একটা অপরিহার্যতা নেই, তাদের উদ্দেশে কটূক্তি করি এবং অন্যের বই বলে বা না-বলে যারা নিয়ে যায় এবং তা ফেরত দিয়ে যেতে যাদের হয় উৎসাহ থাকে না, নয় ইচ্ছে থাকে না, তারা যে আসলে বই পড়ে না, এ কথাও যথেষ্ট তর্জন-গর্জন সহকারেই বোঝাতে চেষ্টা করি।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটা স্থির হয়ে যায়। পড়বার স্পৃহাটাও হয়ে আসে স্তিমিত এবং হারানো বইটাকে বাতিলের দলে ফেলে দিয়েই নিশ্চিন্ত হই। বলা বাহুল্য এরপর সে বইটি পাওয়া গেলেও আর লাভ নেই, কারণ পড়ার যে নেশাটা জমেছিল ভেতর থেকে এখন বাইরে থেকে তাকে খুঁচিয়ে তুলতে হয় এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি, মন তাতে নারাজ! সে-মেজাজটাই থাকে না আর। তবে সৌভাগ্য এই যে পাওয়া খুব কমই যায় এবং নিজে থেকেও হারানো বইগুলোর জায়গা খুব কমই পূরণ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ যা যায়, তা চিরদিনের জন্যেই যায়।

পূরণ হবে কি করে? কোন বইটা দিয়েছিলেন কোন সাহিত্যিক বন্ধু, তাঁর স্বহস্ত-লিখিত প্রীতির স্মারকচিহ্ন স্বরূপ। কোনটা এসেছিল সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয়

দপ্তর থেকে সমালোচনা করে দেবার জন্যে। কোনটা চলতি পথের একান্তে স্তূপীকৃত বাজে বইয়ের আবর্জনা হাটকে অল্প মূল্যে সংগৃহীত হয়েছিল। কোনটা বা পাওয়া গিয়েছিল কোন গুণমুগ্ধ ব্যক্তির সাদর উপহার স্বরূপ। এছাড়া, নগদ মূল্যে কেনা, কিস্তিতে কেনা এবং ডাক খরচা দিয়ে বাইরে থেকে আনানো বইও জমা হয়েছিল নেহাৎ কম নয়। এর কতক পড়া, কতক আধ-পড়া কতক বা কোনো অনিশ্চিত ছুটির অপেক্ষায় অপঠিত মমতায় রক্ষিত। কিন্তু হায় রে মানুষের আহরণী বুদ্ধি, এই সতর্ক পুঁজি ভেঙেই লোকে বই সরায় এবং কেমন করে সরায়, তা টেরও পাই না!

আপনারা হয়ত এতক্ষণে বুঝেছেন যে বই কাউকে ধার দিই না। অন্তত নীতি আমার তাই। আমাদের দেশে অধিকার ভেদ বলে কোনো কথা নেই। বই দেখলেই দেশশুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষের হাত সুড়সুড়িয়ে উঠে। দুঃখের বিষয় পড়বার ক্ষমতা তাঁদের নেই, নেই মানে পড়ে রস পাবার, অথচ নিয়ে যাবার লোভটি আছে। কাজেই মলাট ছিঁড়ে, নস্যি বা পানের ছোপ লাগিয়ে, কোন জায়গায় বিউটিফুল, নয়ত রাবিশ নয়ত—লেখক, এমনি কোন অমূল্য মন্তব্য খোদাই করেই তাঁরা পাঠকের কর্তব্য সেরে থাকেন। তারপর ক্রমাগত তাগাদা চালাতে পারলে, হয়ত সেই খণ্ড-বিখণ্ডিত বই ফিরে আসবে, আর ভুলে গেলেন ত আপদ চুকেই গেল! হ্যাঁ, নিজের চাড়ে যিনিই নিয়ে যান বই, ফেরত আনার চাড় কিন্তু আপনার। তা-ও তাগাদা দিলেই ঘরের বই ঘরে ফিরবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। কারণ আপনার কাছ থেকে বই নিয়ে গিয়ে তাঁরা আবার তা অন্যত্র লগ্নি করে বসে থাকেন। উদার নির্লজ্জতার সঙ্গেই তাঁরা জানাবেন যে, উক্ত ভদ্রলোক বা সম্ভবস্থলে ভদ্রমহিলা আবার তা অন্য একজনকে পড়তে দিয়েছেন। এইভাবে কোথাকার বই কোথায় গিয়ে পৌঁছয়, টেরই পাওয়া যায় না।

এই জন্যেই আমি কাউকে বই ধার দিই না! নিতান্ত অসভ্যের মতোই জানাতে বাধ্য হই যে, প্রার্থিত বইগুলো উপস্থিত আমার দরকার। একটা প্রবন্ধ লিখছি, নয়ত সমালোচনা লিখব। কিন্তু তাতেও সব সময় ফল হয় না। কেউ অমায়িক আত্মীয়তায় বলেন, আরে সে হবে খন, লিখছেন ত হরদমই! দু-দিন পরেই লিখবেন, দুটি দিন মাত্র, এর মধ্যেই আমি পড়ে শেষ করে ফেলব! ব্যাস, এইখানেই শেষ। এরপর আমাকে নিতে হবে তাঁর পিছু এবং তিনি তখন শেলীর spirit of intellectual, beauty rarely rare.y cometh! কেউ বা বলবেন, আচ্ছা সামনের শনিবার আসছি। এর মধ্যেই সেরে রাখবেন কিন্তু। যেন আইনত আমি বাধ্য ঐ সময়ের ভেতর আমার কাজ সেরে তাঁর গ্রহণের জন্যে বইগুলি মোতায়েন রাখতে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তিনি ঠিকই আসবেন এবং বইগুলির কথাও ভুলবেন না। মজার কথা এই যে, একখানা বই হলেই

চলবে না, একসঙ্গে একগাদা না হলে এঁদের পেট ভরে না, আর ফেরত নীতি দেবার এঁদের সকলেরই এক। অর্থাৎ এঁদের হাত থেকে বই বাঁচানো রীতিমতো বেহায়া হয়েও আমার পক্ষে সাধ্যাতীত !

কিন্তু তবু এঁরা চেয়ে নেন, এঁদের কাছে তাই কাছে তাই আমি কৃতজ্ঞ। অনেকে আছেন, দয়া করে যাঁরা জানাবারও দরকার বোধ করেন না। তাঁরা আসেন মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে, অর্থাৎ আত্মীয়তার ছুতোয় নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত বড়-মানুষীর কাহিনী কীর্তন করতে এবং যাবার সময় বহুমূল্য উপস্থিতি দানের বিনিময়ে হঠাৎ থাবা মেরে খানকতক বই উঠিয়ে নিয়ে যান র‍্যাক অথবা টেবিল থেকে। যেন উঠোন থেকে এক মুঠো নটের শাক ছিঁড়ে নিলেন, যার জন্য কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই ! কোনটা পড়তে পড়তে রেখে গেছি, কোনটার সমালোচনা লিখব। কোনটা এনেছি কাউকে উপহার দেব বলে। কোনটা লেখকের অনুরোধে নূতন সংস্করণের জন্যে সংশোধন করছি। ফিরে এসে দেখি নেই, বেবাক উধাও হয়েছে।

মেয়েদের ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞাসাবাদ করলে, পরম ঔদাস্যে বলবেন তাঁরা, তাতে আর হয়েছে কি ? গেলই বা দু-খানা বই নিয়ে। খেয়ে ত আর ফেলবে না ! যদি বোঝাতে চাই যে, বই খাবে না, খাবে আমার মাথা, তাহলে তারা বলবেন, কে জানে বাপু, বইয়ের খবর রাখতে পারি না অত। টাকা নয়, ধন-দৌলত নয় যে আগলে রাখব। সত্যিই ত, বই স্টোভ নয় যে জল গরমে লাগবে, ছাতা নয় যে রোদে-বৃষ্টিতে মাথা বাঁচাবে। সুতরাং আমারই হার ! মুখ কালো করে ভাবি, শিশি-বোতলগুলোকে হরে বাকি বইগুলোও বিদায় করে দেব। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই আবার জমে ওঠে বই। নসীব ঠাকুরাণীকে ধন্যবাদ যে, একহাতে বই দান ও আর একহাতে হরণ করে তিনি বরাবরই আমার ভাড়াটে বাড়ীর ভারসাম্য রক্ষা করে থাকেন। নইলে কি বিপদই ঘটত !

অবসর সময়ে মাঝে মাঝে ভাবি আচ্ছা হারানো বইগুলো যায় কোথায় ? একদিন যাদের পড়েছি অগাধ আনন্দ নিয়ে, কারো খোলা পৃষ্ঠার ওপর মাথা রেখে হেসেছি কেঁদেছি পাগলের মতো, হয়ত করেছি কোন মতামত নিয়ে কঠোর সমালোচনা, নয়ত লিখেছি কোথাও কোন নোট, ভবিষ্যতে ব্যবহার করব বলে এবং তা আর করা হয়ে ওঠেনি—সেই সমস্ত কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস ও দর্শন-বিজ্ঞানের নূতন-পুরানো স্বদেশী-বিদেশী বইগুলো যায় কোথায় ? বেশ বুঝতে পারি, আমার হাত থেকে যাঁর যাঁর হাতে পড়েছিল, সেখানে তারা স্থির হয়ে নেই। উড়ো পাখীর মতো তারা শুধু উড়ে বেড়াচ্ছে। এক শাখা থেকে আর এক শাখায় বসা, সে তাদের মুহূর্তের খেয়াল, আসলে তারা অসীম শূন্যে বিহারী নভশ্চর জীব। আকাশে

আকাশেই তাদের চলাফেরা! বৃথা মমতায় আমরা তাদের ওপর খাটাতে যাই মালিকানা, আর আমাদের সেই অহমিকা চূর্ণ করেই একদিন তারা পালায় এবং কোথায় পালায়, তা আর জানা-ই যায় না।

অবশ্য হারানো বই দু-একটার সাক্ষাৎ আর কখনো পাইনি এমন নয়। পথের পুরানো দোকানে একদিন দেখলাম বিয়র্নসনের নাট্য-গ্রন্থাবলী। মলাট ওলটাতেই চোখে পড়ল একটি নাম, যা শিরিস কাগজ দিয়ে ওঠানোর চেষ্টা করেও বেয়াড়াভাবে বেঁচে রয়েছে। বলুন ত কে সেই হতভাগ্য? সে এই আমি। দ্বিতীয় বারের জন্যে কিনে আনলাম কিন্তু আবার পালাল এবং এবার বেপাত্তা পলায়ন। আর একটি বন্ধু এলেন, খানকতক মোটা মোটা পোকা ধরা পুরানো বই বেচতে। বললেন, অভাবে পড়েছি, বইগুলো রেখে আর কি করব? নিজেই থাকার ঠাঁই পাই না! কিন্তু একদিন শখ করে কিনেছিলাম, আপনি গুণী লোক, আপনার হাতে পড়লে তবুও মনটা খুশী থাকবে। জানব অপাত্রে পড়েনি।···তার ভেতর থেকে বেরল আমারই পরলোকগত বন্ধু···র নাম লেখা দু-খানা গ্রীক কবিতার অনুবাদ সঙ্কলন, যা এক সময় তাঁর কাছ থেকে এনে পড়েছিলাম।

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এ দুটো বই ওঁর হাতে পড়ল কি করে? অনেকক্ষণ ধরে উলটে-পালটে দেখলাম। কয়েকটা কবিতা দু-জনে একসঙ্গে পড়েছিলাম, সেগুলোর কোণায় কোণায় এখনো রয়েছে আমাদের হাতের লেখা নোট! কোথায় সেই বন্ধু, যিনি বাঁচলে আর কিছু না হন, অন্তত আমার চেয়ে বড় সাহিত্যিক হতেন! কিন্তু আশ্চর্য এই দুটি বই কিছুদিন পরেই আবার উধাও হল। এক তরুণ কবি নিয়ে গেলেন অনুবাদ করতে। হয়ত নেপথ্যে অনুবাদ তাঁর সম্পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু পুঁথি দুটো আর মালিকের হাতে ফিরে আসেনি।

কবিতার ফেরিওয়ালা

চাই ঘুগনি, আলুর দম, কিংবা সীতাভোগ, মিহিদানা···আওয়াজের সঙ্গেই আমাদের চিরদিনের পরিচয়।

হঠাৎ যদি এই আওয়াজের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাস্তায় একজন বা কয়েকজনকে হাঁকতে শোনেন, চাই কবিতা, ভালো ভালো কবিতা, আধুনিক কবিতা, তাহলে অবাক হবেন কি?

কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই। সত্যি সত্যিই এ আওয়াজ শোনা গেছে প্রথমে প্যারিসে, তারপর কলকাতায়। ব্যস্ত হবেন না, বলছি।

নবীন ফরাসী কবিরা বই ছাপানোর ঝামেলায় না গিয়ে আপাতত তাঁদের কাঁচা কবিতাই জনসাধারণকে বিক্রী করবেন ঠিক করেন। রাস্তার ধারে ধারে স্টল বসিয়ে তাই নিজ নিজ পাণ্ডুলিপি তাঁরা মনোহারী পণ্যের মতো করে সাজিয়ে রাখেন।

খরিদ্দার আকর্ষণের জন্যে কেউ হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিতে নিজের একটা করে ছবি সেঁটে দেন। কেউ বা গলা ছেড়ে নিজের লেখা গান গাইতে বা কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করেন।

কিন্তু এত উদ্যোগের পরও ফলটা কি হল? ফল নগণ্য। দু-চারটি অটোগ্রাফ-লিপ্সু স্কুল কলেজের ছেলেমেয়ে ছাড়া কেউ এই কবিতার খরিদ্দার হলেন না। যদিও তামাসা দেখার জন্যে যথেষ্ট ভীড় জমে গেল চারদিকে!

হয়ত এই খবরে উৎসাহিত হয়েই আমাদের নবীন কবিরা কলকাতায় করলেন 'আরো কবিতা পড়ুন' আন্দোলন।

অধুনা সাধনোচিত ধামে প্রস্থিত সেনেট হলের পৈঠায় দাঁড়িয়ে তাঁদের সেই কবিতা আবৃত্তির বিবরণ কাগজে দেখেছি। কবিতা লিখলেও, নবীন নই বলে এই পথ-প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্যে ডাক পাইনি।

যাই হক, ব্যবসা হিসাবে এখানেও বিশেষ সাফল্য অর্জিত হয়নি, যদিও লোক জড়ো হয়েছে এখানেও অনেক এবং কেউ বলেছেন, কবিতা ফবিতা ছেড়ে গামছা বেচো না বাবা। কেউ বা বলেছেন, ইস, লিখিয়ে পড়িয়ে মানুষদের আজ কি হাল হয়েছে!

অর্থাৎ কবিতা জিনিসটা যে বেঙ্গল চাটনি বা সাবান, তরল আলতার মতো ফেরি হতে পারে, এ কি প্যারিসিয়ান আর কি কলকাতিয়ান, কেউই স্বীকার করতে রাজী নন। বিয়ে থাওয়ায় উপহারের জন্যে ছাপানো কবিতার বই দু-একখানা কিনলেও কিনতে

পারেন তাঁরা। কিন্তু কাঁচা কবিতা…ও একমাত্র কিনতে প্রস্তুত তাঁরা, যদি তা হয় কোন তিন-চারশো বছরের পুরানো কবির হস্তাক্ষর।

তার মানে, ছাতা জুতো স্টোভ মোজা গেঞ্জি দুধ চিনি বা আলু পটলের মতো কবিতার একটা অপরিহার্যতা নেই প্রাত্যহিক জীবনে এবং তা নেই বলেই, জিনিসটাকে তাঁরা একটা মর্যাদার বড় পিঁড়িতে বসিয়ে রাখেন। তাই কবিতা পণ্য হয়েছে দেখলেই তাঁদের ক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে!

কাঁচের বাক্সে বন্দী করে বাজারে ফুল বিক্রী করা দেখে ভের্লেন বর্তমান সভ্যতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। বলেছেন, প্রেমকে গানকে পণ্য করেছে যারা, তারাই এনেছে ফুলকেও শৌখীন বিপণিতে! দাঁড়িপাল্লা হাতে বসে আছে সভ্যতার দোকানী সেইসব বর্বররা, কোন্‌টা থেকে কি মুনাফা হয় তা দেখার জন্যে।

তিনি যদি দেখতেন, তাঁর বংশধররা আজ কবিতাও ফেরি করছেন, নিশ্চয় আর্তনাদ করে উঠতেন দুঃখে। তিনি ত বটেই, ভ্যালেরি, বোদলেয়র এবং মিস্ত্রালও নিশ্চয় সভ্যতার সমাপ্তি ঘণ্টা শুনতে পেতেন আয়োজনটির মধ্যে।

কিন্তু কেন? আমরা ত চোখের ওপর দেখছি, গান ও অভিনয় পণ্য হয়েছে, হয়েছে ছবিও এবং ও-সবের অনুশীলন থেকে চুটিয়ে টাকা কামানো আজ আর কারো অশোভন বলে মনে হচ্ছে না। শুধু কবিতার বেলাতেই পর্দানশিনতা কেন? কেন তাকে অসূর্যম্পশ্যা পুরনারী হয়ে থাকতে এবং অহেতুক শালীনতা রক্ষা করতে হবে?

বোধহয় সতীত্ব সম্বন্ধে আমাদের যা সংস্কার, কবিতা সম্বন্ধেও তাই, কেন না কবিতা ও বনিতাকে প্রাচীনেরা একই সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন। কাজেই তাকে চৌরাস্তায় বা বাজারে দাঁড়িয়ে খরিদ্দার জোটাতে দেখলে আমাদের রুচি পীড়িত হয়!

কিন্তু তাই কি? কবিতাকে কি আমরা কোনদিন খুব উচ্চ মূল্যে গ্রহণ করেছি? দান্তে, শেক্সপীয়ার, মলেয়ার কে কবে কাব্যের দর এবং কদর পুরোপুরি লাভ করে গেছেন? মুকুন্দরাম, চণ্ডীদাস এবং রামপ্রসাদদেরই বা আমরা ক-পয়সা দিয়ে সম্বর্ধিত করেছি? বলবেন সম্মান দিয়েছি। খুব বেশী দিয়েছি কি তা-ও?

কবিদের ত ঘর-সংসার সেকালেও ছিল, আজো আছে এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাও কবি বলে তাঁদের রেয়াৎ করত না। আজো করে না। কাজেই কবিতাকে পণ্য করে তোলার প্রয়োজন ছিলও, আছেও। চারণরা, ক্রবাদুররা এই জন্যেই তাঁদের রচনা গেয়ে বেড়াতেন নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে আর মানী কবিরা হতেন রাজসভার কবি, পোয়েট লরিয়েট।

মনে করুন ত, গ্যয়টে যদি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে না হতেন এবং ভেইমারে মন্ত্রীর

আসন দখল করে বসার সুযোগ যদি না পেতেন, কিংবা রবীন্দ্রনাথ যদি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র না হতেন, তাহলে নিছক কলম আশ্রয় করে বাঁচার তাগিদেই তাঁদেরও চলতি বাজারের পণ্য জোগাতে হত কিনা!

এ সত্ত্বেও নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে পর্যন্ত সমস্ত বইয়ের স্বত্বাধিকারকে বেচে দিতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে এবং তা অতি সামান্য দামে? কাজেই কবিতার সঙ্গে আনি-দুয়ানি-সিকির সম্বন্ধটা বেখাপ্পা ঠেকলেও, ওটা আছে। ও নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই।

আগেকার দিনে কবিরা ওটা স্বীকার করতেন না মুখে। বলতেন কাব্যের সাধনা করে চাহি না অর্থ চাহি না মান। যদিও ও-দুটো ছাড়া তৃতীয় কোন কাম্যই হতে পারে না কবির কবিতা চর্চা থেকে। আজকের কবিরা সহজ হয়েছেন, তাঁরা তাই চক্ষুলজ্জা খুইয়ে সোজা রাস্তায় এসে পসরা সাজিয়ে বসেছেন। হাঁকছেন, কবিতা, ভালো ভালো কবিতা!

কিন্তু কৈ? ক্রেতা কোথায় কবিতার? ফ্রান্সেও যা, বাংলাতেও তা। বোধহয় গোটা দুনিয়াতেই তা। কবিতাকে লোকে দূর থেকে শ্রদ্ধা করতে পারে, কিংবা করতে পারে ব্যঙ্গবিদ্রূপ। কিন্তু পয়সা খরচ করে কিনতে পারে না। বিশ্বমানবের এই কাব্য-বৈমুখী প্রকৃতির বিরুদ্ধেই ত অভিযান কবিদের। তাঁরা বললেন, কবিতা পড়ুন এবং তার জন্যে কিছু পয়সা খরচ করুন।

বেশ কথা, আমি কবিদেরই পক্ষে। কিন্তু বয়সে বড়ো হিসাবে পরামর্শ দিই। কবিতার সঙ্গেই একটা করে তার গদ্য ব্যাখ্যাও দিয়ে দেন যেন কবিরা, কারণ অনেক সময় সংকেতের আতিশয্যে বক্তব্য বোঝা যায় না কিছুই। করোনারি থ্রম্বসিসের এই ব্যাপকতার দিনে বুঝতে-না-পারা-জনিত মনস্তাপের পোষকতা করা ঠিক না!

হৃদয়ের মৃত্যু ?

আজ আমরা যে যুগে বাস করছি, তা হল বুদ্ধি প্রাধান্যের যুগ। বুদ্ধির অস্ত্রেই মানুষ আজ প্রকৃতির ওপর জয়ী হয়েছে এবং গতি ও উৎপাদনের রাজ্যে যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তেমনি মানুষের শক্তির সীমাকে অসীমের দিকে প্রসারিত করতে পেরেছে।

এমন দিন হয়ত দূরবর্তী নয়, যখন মানুষ গ্রহান্তরে নিজের জয়চিহ্ন স্থাপন করে আসবে, যখন বিজ্ঞানীর বীক্ষণাগারে জড় থেকে প্রাণ সৃষ্টি করবে, যখন জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু সম্পূর্ণ জয় করে মানুষকে অভাব ও অনটনমুক্ত দীর্ঘ এবং নিশ্চিন্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

অর্থাৎ বুদ্ধিই মানুষের বিজ্ঞান বোধিতে মূর্ত হয়েছে এবং তা-ই তাকে প্রভূত ক্ষমতার অধীশ্বর করেছে, এবং আরো বেশী ক্ষমতার স্বর্ণময় প্রতিশ্রুতি মেলে ধরেছে তার সামনে। অনিবার্যভাবেই মানুষ বুদ্ধিবাদকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে। তাকেই করে তুলছে পার্থিব অস্তিত্বের পরমার্থ স্বরূপ।

এ ভালো হয়েছে কি হয়নি তা নিয়ে তর্ক তোলা নিরর্থক। ইতিহাসের অনিবার্যতা এই পরিণতি ডেকে এনেছে এবং একে আমরা স্বাগত করি অথবা না করি এ আপন স্বাধিকারেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হবে। বরং যারা এই বাস্তব সত্যের দিকে পিছন ফিরে থাকবে, তারাই ফাঁকে পড়বে।

তবে বুদ্ধিবাদের এই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে, তার একটা হিসাব-নিকাশ হতে পারে। প্রধান এবং প্রথম পরিবর্তন হয়েছে, হৃদয় নামক পদার্থটির। আজ তার আর কোনও সম্মানজনক স্বীকৃতি নেই। কোন কোন সময় মনে হয়, বুঝি তার মৃত্যুই হয়েছে।

মানুষ আজ মানুষের কাছ থেকে ক্রমশই দূরে গিয়ে পড়ছে। প্রীতি, প্রত্যয় ও নির্ভরতা নয়, উপযোগিতাতেই আজ মানুষের মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে। উপযোগিতা মানে উৎপাদন ও আহরণের ভিত্তিকে কে কতটা পোক্ত করতে পারে, তার বিচার। কে কতটা নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠায় কাজ করতে পারে, তার হিসাব।

অর্থাৎ পুরানো সমাজবোধ ও ব্যক্তিসম্পর্কের মূল্যমান বদলাচ্ছে। আর কেউ ব্যক্তিগত মহত্ত্বে বা দান-ধ্যান জাতীয় সৎকর্মে আস্থা রাখেন না। স্কুল বসানো, পাঠাগার বসানো, পুষ্করিণী খোঁড়া, রাস্তা বানানো, অনাথ আশ্রম ও চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা—এ সব এখন রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। ব্যক্তির কর্তব্য এজন্যে ট্যাক্স দেওয়ায় এবং

প্রয়োজন হলে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া।

শিক্ষা, চিকিৎসা, যানবাহন, বার্তা বিনিময়, বিজ্ঞানানুশীলন, শিল্পচর্চা, সাহিত্য লালন সব কিছুতেই আমরা প্রত্যাশা করি ব্যক্তির বদলে প্রতিষ্ঠানের পোষকতা এবং সে সব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্বে সরকারের স্থিতি। আর জাল, ভেজাল, চুরি, জুয়াচুরি, সব-রকম অনাচার-কদাচারের প্রতিকার যে একমাত্র দায়িত্বশীল সরকারের হাতে সব কিছুর ভার তুলে দেওয়ায়, এও আমরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করি।

হয়তো আমাদের এই প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ে ভুল নেই। হয়ত এ ই শ্রেয় পথ। তবু এই নব রূপান্তরের আড়ালে আর একটা জিনিষ যা অবশ্যম্ভাবী, সেটাও ভুল করলে চলবে না। মানুষ এই বিবর্তনের ফলে বৃহৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের নাট-বল্টু মাত্র হয়ে পড়বে না কি ?

এর মধ্যেই পৃথিবীতে সর্বগ্রাসী বা সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রচেতনার দিকে মানুষ একান্ত ভাবে ঝুঁকে পড়ছে এবং বিজ্ঞানকে চাইছে করে তুলতে তার সেই পরিকল্পিত রাষ্ট্রযন্ত্রের একমাত্র চালকশক্তি, কারণ তা ভিন্ন অসাম্য, অন্নকষ্ট ও দারিদ্র্য দূর হবে না এবং তা না হলে, স্থিতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ সমাজজীবনও গড়ে উঠবে না।

কাজেই এসে পড়ছে কল কারখানা, যানবাহন, সব কিছুর পাইকারি ব্যবস্থাপনা এবং হাজার হাজার মানুষ নিছক উৎপাদক ও চালকের মার্কা নিয়ে তাতে এসে যুক্ত হচ্ছে, আর অনিবার্যভাবেই মুছে যাচ্ছে তাদের ব্যক্তি পরিচয়, তারা হয়ে উঠছে এক একটা তাল পাকানো ব্যক্তির সংহতি।

এই পটভূমিতে শক্তিসঞ্চারের জন্যে আমরা যে শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশী যুগোচিত মনে করছি, তাতে ফলিত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কারিগরী বিদ্যার স্থানই সবাগ্রগণ্য। যা সর্বাধিক পণ্য উৎপাদন ও লভ্যাহরণের সহায়ক, তা-ই বড় বিদ্যা, যেমন করে হক এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে আমাদের মনে।

ফলে সুকুমার কলার অনুশীলন পিছু হঠতে সুরু করেছে, কেননা তার বাজার দর অল্প এবং বিত্ত বা শক্তি কোনটা আয়ত্ত করতেই তা যথেষ্ট সহায়ক হয় না। সমাজের কর্তৃত্ব ধনপতিদের করতলগতই থাক, আর রাষ্ট্রই সব কর্তৃত্বের অধীশ্বর হক, ব্যক্তিজীবনের মূল্যায়ন আজকের দুনিয়ায় সর্বত্র এক, যদিও অসমানতা আছে ধন বণ্টনে এবং তার দরুন আছে উপরতলা নীচুতলায় স্তরভেদও।

এই স্তরভেদ নিশ্চয় অভিপ্রেত নয়, সাম্যাশ্রিত নূতন বিন্যাসের মধ্যে এর রূপান্তরও নিশ্চয় কাম্য। কিন্তু সে-সাম্যেও মানুষ যদি নির্বিশেষে নম্বর মাত্র হয়ে দাঁড়ায় তাহলে যে কল্পিত ধনতান্ত্রিক সমাজে বণিক শাসকদের সর্বগ্রাসী থাবায় নিষ্পিষ্ট হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষ, তার সঙ্গে ওর পার্থক্য কি হবে ?

আসলে তর্ক বাধে অন্ত ব্যাপার নিয়ে। পুরানো ছকের সমাজে উৎপাদনের ক্ষেত্রটা একান্তভাবেই ধনপতিদের করায়ত্ত, তার মূল প্রেরণা মুনাফা। সেইজন্যেই তা উপরের স্তরে কিছু আর্থিক সুবিচার করলেও, নীচের স্তরে নির্মম হাতে মানুষকে নিংড়ে তার হাত থেকে শ্রম আদায় করে। সেইজন্যেই তার বিরুদ্ধে উঠেছে অসন্তুষ্ট মানুষের চিৎকার। তাকে ভেঙে মুষ্টিমেয় থেকে সমষ্টির মধ্যে বিদ্ধ ব্যাপ্ত করা হক, বলছেন দুনিয়ার ক্ষুব্ধ মানুষরা।

বলা দরকার যে তাতে আপত্তি নেই কারো। একমাত্র কায়েমি স্বার্থে অধিষ্ঠিত ধূর্ত ধনপতিরাই জিনিষটাকে ভয়ের চোখে দেখছেন এবং সেই ভয়ই অভিব্যক্ত হচ্ছে তাঁদের শান্তি, গণতন্ত্র ও বিশ্বমৈত্রীর নাম উচ্চারিত রাশি রাশি অন্তঃসারহীন বুলির মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ নূতন সমাজ ব্যবস্থাপনার দ্বারা আর্থিক সুবিচার আনতে হবে পৃথিবীতে। না আনলে মঙ্গল নেই।

কিন্তু তারপরও প্রশ্ন আছে এবং সেই প্রশ্নই তুলেছি আমি এই আলোচনার গোড়াতে। সমষ্টি মানুষের একটা গড়-পড়ত' মঙ্গলের পরিকল্পনা করা হয় যদি, যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, বসবাস ও আত্মবিনোদনের সর্বনিম্ন একটা ছক-বাঁধা ব্যবস্থাপনা সম্ভবপর হয় সকলের জন্যে, তা হলেই কি প্রতিটি মানুষ তৃপ্তি, আনন্দ ও চরিতার্থতায় উন্নীত হবেন?

না। তার কারণ মানুষের মন আছে, তা রুচি-অরুচির অধীন। তা স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত এবং একের রুচি ও স্বপ্ন অন্যের থেকে এতই তফাৎ যে একটা প্রাণহীন সর্বজনীন ব্যবস্থার কাঠামো ব্যক্তিমানুষের প্রত্যেককে সমভাবে স্পর্শ বা প্রভাবিত করতে পারবে না।

এখনো অবশ্য সেদিন আসেনি। সবেমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার বাজার দর বেড়েছে এবং পাইকারি বাণিজ্য ও তার পরিপূরক পাইকারি উৎপাদন ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। এখনি মানুষ যেভাবে মানুষের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে, তার প্রীতি, প্রেম, বিশ্বাস ও আন্তরিকতায় যেভাবে চিড় ধরছে, তাতে ভবিষ্যতে অবস্থা কি দাঁড়াবে, তা ত বোঝাই যাচ্ছে।

কাজেই সবই চাই, উৎপাদন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানীকরণ, সমাজের সমস্ত শক্তি ও সম্পদের রাষ্ট্রীয়করণ, কোনটাই বাদ দিলে চলবে না। কিন্তু সেই সঙ্গেই চাই মনুষ্যত্বের পুনর্বসতি, যা ভিন্ন কোন কিছুরই কোন মানে হবে না। সেই পুনর্বসতির উপায় কি? কি, তাই ভাবছি। মুনাফাভিত্তিক ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান, বাধ্যতামূলক সর্বজনীন শিক্ষা আর কলা ও বিজ্ঞান, উভয়বিধ শিক্ষায় জীবিকার্থী মানুষের প্রাপ্য দক্ষিণার সমীকরণ? ঠিক জানি না, তবে পণ্ডিতরা কেউ কেউ অবশ্য বলছেন তাই।

হাওড়া ব্রিজের মাথায়

হাওড়া ব্রিজের মাথা থেকে পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরা এক যুবককে কাল দমকল বাহিনীর লোকরা অনেক কসরত কৌশল করে নামিয়ে এনেছেন। অত উঁচুতে সে কেমন করে উঠেছিল, উঠেছিলই বা কি জন্যে তা জানা যায়নি। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর সে শুধু বলেছে, একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিলাম।

আপনারা হয়ত যুবকটিকে পাগল বলবেন। আমি কিন্তু তা বলতে পারছি নে। আমি তার মধ্যে দেখছি দুটো মহৎ গুণ পৌরুষ আর নির্লিপ্ততা। অতখানি উঁচুতে ওঠার ইচ্ছা থাকলেও সাধ্যে কুলাত না আমার। আর হাওড়া ব্রিজের মতো জনতা ও যানবাহন মুখর হাটের ভেতর সকলের দর্শনীয় হয়ে ওঠার মতো সাহসও হত না আমার। অর্থাৎ দেহে মনে দু-দিকেই সে আমার চেয়ে বেশী বলীয়ান।

আসলে উপরে উঠতে চাই আমরা সবাই। কিন্তু সে জন্যে নিশ্চিত ও নির্ভর যোগ্য সুযোগের সিঁড়ির দরকার আমাদের। কেউ আমরা আপন আবিষ্করণী বুদ্ধি খাটিয়ে আরোহণের গুপ্ত দ্বার খুঁজে বের করতে পারি না। আর যদি বা কখনো দরজার সন্ধান পাই ত বন্ধ দরজার চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়েই মানে মানে সরে পড়ি সেখান থেকে। যারা এই দুষ্করের পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে, দুর্ধর্ষ হলে তাদের আমরা বলি প্রতিভা, তা না হলেই বলি পাগল।

কিন্তু পাগল আর প্রতিভার মধ্যে তফাৎ কতটুকু? এই যে উচ্চারোহী যুবক, একে আমি যদি বলি প্রতিভা, কি বলবেন আপনি তার বিরুদ্ধে? এই কলকারখানা, যানবাহন ও জনতার কলকোলাহলে উদ্‌ভ্রান্ত কলকাতা শহরে প্রাণ আমাদের সকলেরই হাঁপাই হাঁপাই করছে। সবাই খুঁজছি আমরা একটু নিরিবিলি, যেখানে বসে নিরুদ্বেগ শান্তিতে জীবনের মিছিল দেখব অথচ তার মধ্যে হারিয়ে যাব না। আছে কি তেমন সুযোগ কোথাও? সেই সুযোগ বের করেছে এ এবং অপার দুঃসাহসে সে আপন অভিপ্রেতের কাছে গিয়েও পৌঁছেছে, কেন একে প্রতিভা বলবেন না?

শুধু এই নয়, আরো একটু তলিয়ে দেখুন। একই সমতল ভূমিতে আমরা পরস্পরের সামনা-সামনি রয়েছি বলেই না জীবন এত দুঃখময়! লোভ, হিংসা, কাপট্য ও কুটিলতা আমাদের মধ্যে ফেনায়িত হচ্ছে শুধু কাছাকাছি থাকার বিপাকেই। যদি এসব থেকে, অর্থাৎ কিনা একে অন্যের সংস্রব থেকে উর্ধ্বে উঠে যেতে পারতাম, তাহলে দেবতা হয়ে যেতাম আমরা প্রত্যেকেই। এইজন্যেই গুণীরা বলেছেন, চেতনাকে বস্তু-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনুভূতির উচ্চ ভূমিতে আবদ্ধ করো। সেটাই হল

তূরীয়াবস্থা এবং তারি নাম মুক্তি।

এই মুক্তির তত্ত্ব নিয়ে আমরা শুধু আলোচনাই করি। কিন্তু তাকে জীবনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার সাধনা কোথায় আমাদের? জেনে না জেনে আমরা বন্ধনকেই স্বাগত করছি সদা সর্বদা। সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে নির্মুক্ত বৈরাগ্যে দূর আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্যে চাই যে বলিষ্ঠ আত্মবোধ, তা দেখতে পাচ্ছি এই যুবকটির মধ্যে। তাই আমার কাছে ও একটা মুক্ত পুরুষ। এইরকম লোকই পারে লজ্জা ভয় বিসর্জন দিয়ে উলঙ্গ হতে, প্রাণের মমতা পরিহার করে দুর্গমে ঝাঁপাতে।

আমাদের মতো ভদ্রলোকদের সাধ্য নেই তা করার। তাই আমরা ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশির ধাক্কায় দম ফেটে মরলেও এই আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে থাকব চিরকাল—নিরিবিলির স্বাদ ও সন্ধান কোনদিন পাব না। আপন অনুভূতির অতলে ডুব দিয়ে অমর হতেও পারব না। কারণ অমরতার তপস্যা সার্থক হয় নির্জনে—দৃষ্টি যেখানে অবারিত, মন যেখানে নির্বন্ধন, সেখানেই ত জন্ম নেয় কবিতা, রূপ পরিগ্রহ করে দর্শন। হাটের মধ্যে এলে হারিয়ে যায় ব্যক্তিমানুষ, সমষ্টির মিলিত শ্রমে সেখানে গড়ে উঠতে পারে মহা মহা প্রয়োজনের ইমারত, কিন্তু মনের খোরাক তৈরি হয় না। সেজন্যে মানুষকে দিতে হবে নিজের মনটা একান্ত করে নিজের হাতে পাওয়ার মতো সুযোগ। এ যুগের শিক্ষা-দীক্ষাই তার বিরোধী তাই এ যুগে দাপাদাপি, মাতামাতি ও কাড়াকাড়ির অন্ত নেই, কিন্তু বেশ করে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, তার ষোল আনাই অর্থহীন, মূল্যহীন।

এমন দিনে কি করে মুক্তিকে খুঁজে নিতে হবে, সকলের মধ্যে থেকেই কি করে সকলের নাগালের বাইরে চলে যেতে এবং প্রসন্ন শূন্যতায় ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, তার জোরালো একটা দৃষ্টান্ত পেলাম ঐ যুবকটির কাছে। তবে শিক্ষাটা পেলাম বড় দেরীতে এখন কি আর পেরে উঠব ঊর্ধ্বারোহণের এই কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করতে? বহু দূর ব্যাপ্ত প্রয়োজনের মেদ-মাংসে ভারী হয়ে গেছে যে শরীর। তাছাড়া কোন মতে উঠতেই যদি পারি ভবনদী পারাপারের সেতুর মাথায়, সাংসারিক স্বার্থের দমকল বাহিনী রয়েছে হেঁচড়ে নামিয়ে আনার জন্যে! মুক্তি তাই আর পাওয়া হল না জীবনে।

কিন্তু বিশ্বাস করুন, তবু আমি আশা ছাড়িনি। আমি জেনে রেখেছি কোন-না-কোন দিন দেখা হবেই আমার এই আরোহণ বিশারদ যুবকের সঙ্গে এবং তার কাছে মহৎ বিদ্যাটি শিখে নেবই আমি যেমন করে পারি। তারপর দেখবেন আর সমতল নয়, সর্বজনের মধ্যে নয়, সকলের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমি। এ যুগের

ওপরওয়ালারা সবাই যেমন আছেন। প্রকৃত পক্ষে ওঠার নামই হল জীবন এবং যে ওঠে, তাকেই আমরা বলি মানুষ যে পড়ে যায়, ঝরে যায়, বহুর অরণ্যে হারিয়ে যায়, সে মৃত। সে আদর্শ আমার নয়, তাই আমি কাল থেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই যুবককে, যাকে বিজ্ঞের হাসি হেসে আপনারা বাতিল করে দিয়েছেন পাগল বলে :

I have hopes, I fear no fall,

Cowards are they that climb not at all !

হরসুন্দরের অন্তিম ইচ্ছা

সকালের ডাকে আসা চিঠিপত্রের মধ্যে খামবন্দী একখানা চিঠি দেখলাম। অবিকল আমার ঠিকানাযুক্ত, কিন্তু প্রাপকের নাম হৃষীকেশ বারিক। আশেপাশে সামনে পিছনে খোঁজ করে দেখলাম, ঐ নামের কোন ভদ্রলোক এপাড়াতে নেই। অগত্যা চিঠিখানা খুলতে হল, যদি প্রেরকের নাম-ঠিকানা পাই। কিন্তু কলকাতা, ২রা সেপ্টেম্বর, '৭৫, ছাড়া আর আছে মাত্র নীচে ইতি আশীর্বাদক হরসুন্দর হাজরা নামে লেখকের স্বাক্ষর।

ভদ্রলোকের হাতের লেখাটি ঝরঝরে সুন্দর, কোথাও কাটাকুটি নেই। ভাষাটিও প্রাঞ্জল। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অন্যের চিঠিটা পড়ে ফেললাম এবং পড়ে অবাক হলাম, হরসুন্দর হাজরা নামধেয় ঐ অজানা ভদ্রলোকটির চিন্তার ঋজুতা এবং আপন প্রত্যয়কে জীবনের প্রাত্যহিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে আন্তরিক আকুলতা দেখে! এমনটা সচরাচর দেখা যায় না, তাই চিঠিখানার গণনীয় অংশগুলি এখানে তুলে দিচ্ছি:

প্রিয় ঋষি,

আজ পঁয়ষট্টি ছাড়িয়ে ছেষট্টিতে পা দিলাম। শ্বাস কাশ অতিসার বুড়ো বয়সের রোগ য', তার কোনটাই আমার নেই। হার্ট ভাল আছে, মাথাও দিব্যি কাজ করছে। খেতে ঘুমুতে ও খাটাখুটি করতে কোন কষ্ট হয় না। তবু এপার থেকে অনেক দূরে এবং ওপারের কাছাকাছি এসেছি ত, তাই কখন নৌকা আসবে তার ঠিক আছে কি? সেই জন্যেই জীবনের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটুকু বলে রাখি।

কঠিন রোগে আক্রান্ত হই যদি, অ্যালোপেথিক ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিও। পয়সায় না কুলালে হাসপাতালে দিও। কদাচ কবিরাজ বা হোমিওপ্যাথ ডেক না। বৈদ্যের ছেলে বোকা হলে কবিরাজ হয়, আর কোন কিছু করা যার শক্তিতে কুলায় না, বাংলা বই থেকে দু-দশটা ওষুধের নাম জোগাড় করে নিয়ে সে সেজে বসে হোমিওপ্যাথ। ওরা যমের অনুচর ছাড়া কিছু নয়। হ্যাঁ, টোটকা, তাবিজ, কবচ, ঠাকুরের চরণামৃত ইত্যাদিও আসতে দেবে না আমার ত্রিসীমানায়।

ওসব সম্পূর্ণ ভুয়ো। সারলে অ্যালোপ্যাথিকে সারবে, না সারলে মৃত্যু হবে। ছেষট্টি বছরে মরলে কিচ্ছু যাবে আসবে না কারো। তাছাড়া দু-বছর বেশী বাঁচা বা না বাঁচার দ্বারা এমন কিছু আর করে যেতে পারব না, যাতে মানুষের মহা উপকার হবে বা আমি ইতিহাসে অমর হব। যা হবার তা হয়েছে, যা হয়নি তা হয়নি। অবশ্য মজার কথা যে হয়নি কিছুই। শতকরা নিরানব্বুই জন সাধারণ মানুষের জীবনই ত এই। এ নিয়ে নালিশের কি আছে?

জীবনের এক মুড়োয় জন্ম, আর এক মুড়োয় মৃত্যু। মাঝখানের যেটুকুতে মানুষ বাঁচে, সেটুকুতে খায় পরে, লেখাপড়া শেখে, রোজগার করে, বিয়ে করে, ছেলেপুলে হয়, হাসি-কান্না, লাভ-লোকসান, ভালো-মন্দ অনেক কিছু নিয়ে টেনে চলে জীবনের বোঝাটা, যতদিন না মৃত্যু এসে তাকে ছুটি দেয়। জীবন কিছুই চায়নি, কিছুই বলে দেয়নি। মানুষের মগজ আছে, হাত-পা আছে, তাই সে বসে বসে অনেক কিছু ভেবেছে, আর সেই ভাবনাকে কাজে রূপ দিয়েছে।

যারা প্রতিভাধর তারা এই সব ভাবা ও করা দিয়ে যা কিছু গড়েছে, তাই হল ইতিহাস। যারা আমাদের মত সাধারণ, তারা তার মর্ম কেউ বুঝেছে, কেউ বোঝে নি। অথচ সেই সামান্য পুঁজি নিয়েই অহংকার, ঝগড়া দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি, কত কি করি আমরা। আমাদের অজান্তেই হঠাৎ একদিন পরদা পড়ে যায়। তারপর আর কিছু নেই। বিজ্ঞেরা বলেন অবশ্য যে দেহটাই মরে, কিন্তু আত্মাটা অজর অমর। তার নাশ নেই।

ওসব স্রেফ বানান কথা। ঈশ্বর, আত্মা, জন্মান্তর ও মোক্ষ এই চার থামের ওপর ধর্মের ইমারত দাঁড় করিয়ে রেখেছে মানুষ, নিজের খেয়ালী কল্পনাকে খুশী করার জন্যে। গুরুপুরুতরা এই পুঁজি ভাঙিয়ে দিব্যি করে খাচ্ছে। আর সমাজের ওপরতলার মানুষরা কর্মফল ও জন্মান্তরের প্যাঁচে বন্দী করে সাধারণ মানুষকে অকেজো করে রেখেছে। তারা বুঝছে তাদের দুঃখ গত জন্মের দুষ্কৃতির ফল। সুতরাং এজন্মে আর শিং নাড়ব না।

কি জান? কি করে পৃথিবীটার উৎপত্তি হয়েছে, কি করে তাতে জীবন এসেছে, কেউ সঠিক জানে না। অনেক খুঁজে পেতে ও ভেবে-চিন্তে জ্ঞানী মানুষরা মোটামুটি যা স্থির করেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ভালো। তাঁরা বলেন, প্রকাণ্ড একটা জলন্ত তেজোময় পদার্থ থেকে ভেঙে ভেঙে গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবী, চাঁদ হয়েছে। ওপরের তাপ জুড়ানোর ফলে পৃথিবীতে মাটি তৈরি হয়েছে, আর ভেতরের তাপ বাষ্প হয়ে সেই মাটিতে এসে জমেছে, তারপর গলে জল হয়েছে।

এই জল মাটি আর উত্তাপের মিলিত ক্রিয়াতেই জীবন জন্মেছে এবং এক জীবন রূপ নিয়েছে হাজার জীবনে। এর ভেতর সৃষ্টিকর্তা-টর্তা কেউ ছিলেন না, এখনো কেউ নেই। বিদ্যুতের বা আগুনের বা হাওয়ার মত একটা জড় শক্তিই চালাচ্ছে পৃথিবীটাকে। যখন সেটা ফুরিয়ে যায়, তখনই আসে হিম যুগ। সব ঢাকা পড়ে যায় বরফে। আবার তাপ ফেরে, আবার জীবন তৈরি হয়। চিরদিন এই চলেছে।

কাজেই জগৎকে জীবনকে সোজা চোখে দেখা, সোজা মনে বোঝা উচিত। তার

মানে অবশ্য এই নয় যে সভ্যতাকে অগ্রাহ্য করবে, সমাজকে মানবে না। মানুষ আর পশু যখন এক ছিল তখন তা মানার চিন্তাই ছিল না। কিন্তু দু-পায়ে উঠে দাঁড়ানোর ফলে মানুষের মগজে যখন বুদ্ধি এল, হাত দুটো হল কাজের হাতিয়ার, তখন সে মাথা ঘামাবে এবং দেহ খাটাবে বৈকি। নূতন করে মানুষ আর কি পশু হতে পারে?

কিন্তু তবু জীবনের মতো একটা সত্যি জিনিসের ওপর কতকগুলো কল্পনা চাপাবে কেন? প্রাণ আর পাঁচটা জীবেরও যা, মানুষেরও তাই। তার আরম্ভ ও শেষ দুই-ই হয় বাঁধা কারণে। আত্মা, কর্মফল ও পুনর্জন্ম সম্পূর্ণ বাজে কথা। আড়াল থেকে সুতো ধরে ঈশ্বর সব কিছু চালাচ্ছেন, পাপপুণ্যের হিসাব রাখছেন—এও বাজে কথা। পাপের ভয়ে নয়, অন্যায় করতে নেই, পাল্টা অন্যায় ফিরে পাবে বলে।

আসলে অন্যায় কি? যাতে অন্যের লোকসান, অপমান, দুঃখ, চলতি ভদ্রতা ও আচার-বিচারের যা বিরুদ্ধ, তাই ত। শান্তিতে নিজে থাকা এবং অন্যকে থাকতে দেওয়ার জন্যেই মানুষকে এগুলো মানতে হয়। স্বর্গে গিয়ে অপ্সরী ও দেবকন্যাদের সঙ্গে পারিজাতের মধু খাবার জন্যে নয়! স্বর্গ-নরক ত মূর্খের আবিষ্কার আর মোক্ষ হল বিলকুল ধাপ্পা! আমি ওসবে তিলমাত্র বিশ্বাস করি না।

সুতরাং সব শেষে কাজের কথাটা শুনে নাও। মৃত্যুকালে আমার মুখে জল দিতে হয় দিও, গঙ্গাজল নয়। ইচ্ছা হলে রবীন্দ্রনাথের গান একটা গাইতে পার মিষ্টি করে। ইষ্টনাম-ফাম শোনাবে না। হ্যাঁ, খাটিয়ায় দেহটা শুইয়ে শ্মশানে নিয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু কাঁধে করে নয়। আর কপালে চন্দন, চোখে তুলসী পাতা, বুকে গীতা চাপাবে না। পাশবিক উল্লাসে কেউ হরি বোলও দেবে না। শ্মশানে প্রেতপিণ্ডটিণ্ডও দেবে না। বেশ ভাল জামা-কাপড় পরিয়ে, দাড়ি কামিয়ে, চোখে চশমা এবং মুখে বাঁধান দাঁত জোড়া পরিয়ে পরিষ্কার বিছানায় শোয়াবে দেহটা এবং সৎকার সমিতির কাঁচের গাড়ীতে সাদা ফুলে ঢেকে নিয়ে যাবে আমাকে ক্রিমেটরিয়ামে। ঐ গাড়ী না পেলে লরীতে নেবে এবং ক্রিমেটরিয়ামে ঠাঁই না হলে চিতায় সৎকার করবে। অস্থি ভুলেও গঙ্গায় দেবে না। অশৌচ ফশৌচ পালন করবে না। শ্রাদ্ধও হবে না। সাত দিন পরে শুধু আমার বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে এই চিঠিটি পড়ে শোনাবে।

আমার বইগুলো কোন বিদ্যালয়ে দান করবে। অল্প টাকা ব্যাঙ্কে আছে, তুলে এনে গরীবদের চিকিৎসার জন্যে কোন হাসপাতালে দেবে। তোমাকে ত আমার ব্যাঙ্কের খাতায় যুগ্ম স্বাক্ষরকারী করাই আছে। জামা কাপড় চাদর বিছানা ঘড়ি অভাবী মানুষদের বিলিয়ে দেবে। আর আমি যাঁদের প্রতি মাসে কিছু কিছু সাহায্য দিতাম, তাঁদের ঠিকানাগুলো পাবে আমার বালিশের তলায় ডায়েরীতে। তাঁদের চিঠি

দিয়ে জানাবে যে আমি মারা গেছি। সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করি নি।

তুমি ত জান, আমি স্ত্রী পুত্র সংসার ও বাড়ীঘর ছেড়ে নিজের আদর্শ অনুসরণের জন্যেই একা এই ঘরটি ভাড়া নিয়ে থাকি। নিজে রেঁধে খাই। তারা আমায় ভালোবাসে, চায়ও, কিন্তু আমার চিন্তাধারাকে সহ্য করতে পারে না। তুমি বাল্যকাল থেকে আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অন্তিম সময়ে তাই প্রতিবেশীরা তোমাকেই খবর দেবেন সব কথা তোমাকেই বলে রাখলাম এইজন্য, যদিও কবে মরব তার কিছুই নিশ্চয়তা নেই।

ইতি,

আশীর্বাদক

সেবক শ্রীতিনকড়ি হালদার

তিনকড়ি হালদারের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় আমার সাংবাদিক জীবনের শুরুতেই। দু-ফসলী ধানের চাষ, লিচু ও পেয়ারার বনসাই বানান, ফুলকপি ও মটরশুঁটিতে কিংবা আলু ও টমাটোতে সংমিশ্রণ ঘটান, রকমারি কৃষিপ্রসঙ্গ নিয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখতেন তিনি এবং ঘণ্টাখানেক টেবিলের উল্টোদিকে বসে বকর বকর করে সেটি ঘাড়ে চাপিয়ে যেতেন ছাপানর জন্যে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে নিতান্তই অনাগ্রহের সঙ্গে ছাপাতে দিতাম লেখাগুলো। কিন্তু মজার কথা যে মফঃস্বল থেকে গাদা গাদা চিঠি আসত কৃষিবিজ্ঞানী তিনকড়িবাবুর গুণপনার স্বীকৃতি হিসাবে। একবার তিনি বাতাবী লেবুর সঙ্গে কমলা লেবুর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জায়াণ্ট অরেঞ্জ বা অতিকায় কমলা তৈরির একটা ফরমূলা লিখেছিলেন, আর একবার গোবরগাদায় আহারযোগ্য পাতাল ফোঁড় বা মাশরুম বানানর সম্ভাব্যতা ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই দুটি ব্যাপারের বিশদ তথ্য জানতে একজন জার্মান ভদ্রলোক এসেছিলেন আমাদের দপ্তরে। তাঁর দার্জিলিঙে নিজস্ব চাষবাড়ি ছিল, সেখানে তিনি এই দুটির পরীক্ষা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই ভাবে আর কিছুদিন চালাতে পারলেই তিনকড়ি নির্ঘাত একটা কেউকেটা হয়ে যেতেন। কিন্তু দম রাখতে পারলেন না, ফট করে লাইন পাল্টে ফেললেন তিনি স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই। কৃষিবিশারদ বনে গেলেন রাজনৈতিক। জানি না এই বিবর্তন কেন হল।

হঠাৎ একদিন এসে উঠলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্ল ঘোষের ওপর লেখা ছোট একটা প্রবন্ধ নিয়ে। তাতে ডক্টর ঘোষের ছাত্র-জীবনের কথা, তাঁর তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক মেধার কথা, কলকাতা মিণ্ট বা টাঁকশালে বড় চাকরি করার কথা, গান্ধীজীর প্রেরণায় তা ছেড়ে কংগ্রেস যোগ দেওয়ার ও সত্যাগ্রহে যোগদানের দণ্ড হিসাবে কারারুদ্ধ হওয়ার কথা, গান্ধীজী কর্তৃক আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিবাহে সম্মত না হওয়ার কথা, নানা তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তিনকড়ি। কারাগারে লেখা ড. ঘোষের 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা' নামক বইয়ের প্রসঙ্গও লিখেছিলেন তিনি। সদ্য স্বাধীন হয়েছে দেশ, সকলেই তখন আগ্রহে উত্তেজনায় ছটফট করছেন। ছাপা হল প্রবন্ধটি। কিন্তু মন্ত্রিত্বের মসনদ স্থায়ী হল না ড. ঘোষের। এক বিখ্যাত মহাজনের গুদামে হানা দিয়ে তিনি ময়দার সঙ্গে চুনা পাথরের গুঁড়ি মেশানোর শয়তানি ধরলেন। ব্যাস, সেই অপরাধেই খতম হল তাঁর মন্ত্রিত্ব। না হবে কেন? গান্ধী তাঁকে একজন মাড়োয়ারি মন্ত্রী নিতে বলেছিলেন। এক চিঠিতে তিনি লেখেন, সর্দারনে কহা কি বংগালমে এক

মাড়বারী মন্ত্রী লেনা আচ্ছা হোতা। হামরা ভি ঐসা মতলব। প্রফুল্লচন্দ্র তাতো শোনেনইনি, উল্টে হাত দিয়েছেন কিনা কশ্চিৎ মাড়োয়ারি মহাজনের গায়ে! গান্ধী-ভারতে আর টেঁকে তাঁর মন্ত্রিত্ব?

এরপর অভিজাত কলকাতার অভিপ্রেতজন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এলেন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব হলো তিনকড়ির। 'মূর্তিমান পৌরুষ বিধানচন্দ্র' নামে এক প্রবন্ধ এনে হাজির করলেন তিনি। কেশব সেনের নববিধান প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর জন্ম বলেই তাঁর নাম বিধান. এই থেকে শুরু করে, কেন তিনি এম বি হতে না পেরে এল এম এস হয়েছিলেন, কেন আজীবন অবিবাহিত থাকার ব্রত নিয়েছিলেন, কি করে প্রথম সি আর দাশের সংস্রবে এসেছিলেন, হাজারো খুঁটিনাটি তথ্য পেশ করেছিলেন এতে তিনকড়ি হালদার। ভাগ্যবান বিধানচন্দ্রের মন্ত্রিত্ব অবশ্য প্রফুল্ল ঘোষের মত ক্ষণস্থায়ী হলো না, তা বেশ টেঁকসই হয় অনেক বছর ধরে। ফলে বিধান-প্রশস্তি লেখাটাও বাৎসরিক কৃত্যে দাঁড়াল তিনকড়ির, যার সমাপ্তি হলো এক জন্মদিনে বিধানবাবুর মৃত্যু হওয়ায়। কিন্তু এখানেই কি হাত গুটালেন তিনকড়ি? না, আরামবাগের গান্ধী বলে কথিত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হলেন, আবার উদয় হলেন তিনকড়ি। 'প্রফুল্ল চরিত' নামে এক প্রবন্ধ হাতে নিয়ে। কিভাবে গান্ধীজীর ডাকে বিলেত যাওয়া বন্ধ করে নিজের কেরিয়ার বিসর্জন দিয়েছিলেন প্রফুল্লদা, কিভাবে গায়ে কেরোসিন মেখে মশা তাড়াতেন গ্রামের মানুষদের সঙ্গে রাত কাটানর সময়, নানা অভিনব তথ্যই পরিবেশন করলেন তিনকড়ি এই প্রবন্ধে। প্রফুল্ল-চর্চাও চলল বেশ কিছুদিন, কারণ তাঁর মন্ত্রীত্বও মন্দ আয়ু পায়নি। তারপর গেলেন তিনি, এল যুক্তফ্রণ্ট। হাল ছাড়লেন কি তিনকড়ি এবার? উঁহু!

মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয় মুখুজ্যে। এবার অজয় কাহিনীকার রূপে দেখা দিলেন তিনকড়ি। পরাধীন ভারতে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিলেন যিনি তমলুকে, যিনি গড়েছিলেন স্বাধীন জাতীয় সরকার, সেই মহাযোদ্ধা গান্ধীগতপ্রাণ অজয়দার জীবন-বৃত্তান্তও পৌছে দিলেন তিনি বাঙালীর হাতে। তদানীন্তন বর্গীবাহিনী যে তাঁকে নাজেহাল করতে চেয়েও পারেনি, নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের জোরেই যে তিনি সমস্ত প্রতি-বন্ধকতার ব্যূহ ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন, একথা দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত করলেন তিনকড়ি।

যুক্তফ্রন্ট নিহত হবার পর ইন্দিরা-প্রসাদপুষ্ট সিদ্ধার্থ রায় এলেন মুখ্যমন্ত্রীর গদীতে। অতঃপর পিছু হঠে গেলেন কি তিনকড়ি? আজ্ঞে না। দেশবন্ধুর সুযোগ্য দৌহিত্র সিদ্ধার্থের চরিতও লিখে আনলেন তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানা সহকারেই। লিখলেন আমাদের আর সব মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন অবিবাহিত, এই প্রথম একজন বিবাহিত মুখ্যমন্ত্রীর

আবির্ভাব হল পশ্চিমবঙ্গে। সুতরাং বেগম সাহেবার প্রসঙ্গও তাঁর প্রশস্তি থেকে বাদ পড়ল না। কংগ্রেস মুখ থুবড়ে পড়ার পর পশ্চিমবঙ্গে আজ বামফ্রন্ট উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে নড়েছে তিনকড়ির টনক। তিনি এবার ধরেছেন জ্যোতিবাবুকে! একটু আগেই এসেছিলেন নাতিবৃহৎ একটি 'জ্যোতিপ্রসঙ্গ' পকেটে নিয়ে। এই প্রথম তাঁকে বিমুখ করলাম, কারণ আর ত আমি কোন কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তরে কর্মনিরত নই। বললাম, তিনকড়ি এত বছর ধরে ত এক-এক করে এতগুলো মুখ্যমন্ত্রীর চরিতামৃত বানালে। আখেরে কিছু হল কি? না শুধু ঐ পঁচিশ তিরিশ টাকা নগদ দক্ষিণাতেই শেষ?

তিনকড়ি হেসে বললেন, কলকাতায় ছোটখাট একখানা বাড়ী, একটা ওষুধের দোকান, দুই ছেলের সরকারী চাকরি, বিলেতফেরত পাত্রের সঙ্গে এক মেয়ের, চার্টার্ড একাউন্টেন্টের সঙ্গে আর এক মেয়ের বিয়ে, নিজের একবার বিদেশে চক্কর দিয়ে আসা— অল্পস্বল্প এই প্রাপ্তিযোগ হল আর কি! কি জানেন দাদা, আমার ত কোন পলিটিক্সের বালাই নেই, আমি তাই পারি সকলেরই গুণ গাইতে। যারা সারা জীবন একটা মত ধরে বসে থাকে, তাদের হয় বিলকুল কপাল ফিরে যায়, নয় কিস্‌সু হয় না।

বুঝলাম তিরিশ বছর ধরে তিনকড়ি আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙেই তিল তিল করে কাজ গুছিয়েছেন।

অপরাজেয় প্রাণকেষ্টদা

বিধান সভার নির্বাচনের তখনো দুচার দিন বাকি। বিকেলের দিকে বাইরের ঘরে বসে একখানা সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাচ্ছি। রাস্তা থেকে বারকতক উঁকি দিয়ে এসে ঢুকলেন প্রাণকেষ্টদা। পাড়ার লোক, ওপর ওপর চেনা আছে, চলতি পথে মুখোমুখি হলে আবহাওয়া, বাজার দর, টেলিফোনের বেয়াড়ামি, নয় তো বিদ্যুতের খামখেয়ালিপনা নিয়ে কথা হয়।

প্রাণকেষ্টদার পুরো নাম জানি না। কত বয়স, কি করেন তাও অজ্ঞাত। চুয়ান্ন থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত যে কোন বয়স হতে পারে তাঁর। এটর্নি, এঞ্জিনীয়ার বা চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট থেকে উঁচু পায়ার করণিক পর্যন্ত যে কোন পেশার লোক হতে পারেন। কৌতূহল বোধ করিনি বলেই তথ্যগুলো সংগ্রহ করে রাখিনি। প্রতিবেশী ও পথের আলাপী হলে এর বেশী দরকারই বা কি? হঠাৎ আজ সোজা ঘরে এসে ঢুকলেন, তাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সামনের সোফাটায় বসতে বললাম।

বসেই প্রাণকেষ্টদা বললেন, আজ আর বেরননি বুঝি। আবহাওয়াটাও সুবিধার লাগছে না।

বললাম, না, শরীরটা ভাল লাগছে না। তাছাড়া একটু কাজও ছিল বাড়িতে। আপনিও ত বেরননি।

আমি সাতদিনের ছুটি নিয়েছি, বলে প্রাণকেষ্টদা টেবিলের ওপর থেকে পত্রিকাখানা উঠিয়ে নিলেন। অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, ভোট ত এসে পড়ল। বিধানসভায় কংগ্রেসই জিতবে, কি বলুন?

কি করে জানব, সংক্ষেপে জবাব দিলাম। তারপর বললাম, লোকসভার ফলাফল দেখে ত মনে হয় না যে দেশে কংগ্রেসের আর সেই আগেকার কদর আছে।

প্রাণকেষ্টদা বিজ্ঞতার হাসি হেসে বললেন, না, ও হিসাব আপনার নির্ভুল নয়। উত্তর ভারতে হাম দো হামারা দো নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটু উত্তেজনা হয়েছিল, তাইতেই লোকসভার নির্বাচনটা পণ্ড হয়েছে। দেখবেন বিধানসভায় ঠিক কংগ্রেসই বেরিয়ে আসবে। আরে মশাই, কংগ্রেসের বিকল্প কোন দল আছে নাকি দেশে? জোড়াতালি দেওয়া কতকগুলি ছোটবড় বামপন্থী জোট, ওর মধ্যে সি পি এম ছাড়া কোনটাই দল নয়। আর সি পি এম-কে ছেলে ছোকরারা চাইলেও, সমাজের ভিত্তি যেখানে, সেই মধ্যবিত্ত মানুষেরা কেউ পছন্দ করেন না। যারা ধর্ম মানে না, ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তির অধিকার মানে না, ছোট-বড়র শ্রেণীভেদ মানে না, এই ভারতবর্ষে তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই জানবেন।

আমি বললাম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টি এবং চিন্তা ত বদলায়। তাছাড়া কংগ্রেস ত পারেনি কোন জায়গাতেই মানুষকে শান্তি স্বস্তি দিতে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বেকারে দেশ ভরে গেছে। এর ওপর প্রতিবাদের গলাটুকু পর্যন্ত টিপে দেবার জন্যে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। পুলিস যাকে তাকে জেলে ঢোকাচ্ছে। মিসা ফিসা কত কি হয়েছে। লোকে তাই কংগ্রেসকে খেদিয়েও দিতে পারে ঘাড় ধরে।

টেবিলে চাপড় মেরে প্রাণকেষ্টদা বললেন, কি যে বলেন, তার ঠিক নেই। তারপর কি মনে করে জানি না ফিক করে হেসে বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি আপনি কংগ্রেসেরই পক্ষে। শুধু তর্কের জন্যেই তর্ক করছেন। নইলে জরুরি অবস্থাকে কখনো আপনি মন্দ বলেন? দেখছেন না কিরকম নিয়মানুবর্তিতা এসেছে দেশে। চুরি ছিনতাই একদম বন্ধ, জিনিসের দাম হু হু করে নামছে! এই হারামজাদা দেশে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া যায় নাকি কাউকে? তাছাড়া কি জানেন? প্রায় একশো বছরের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। কত ত্যাগ, কত মহত্ব বীরত্বে উজ্জ্বল তার ইতিহাস! তাকে হঠান কি চাট্টিখানি কথা! আচ্ছা, ভোটের পরে আবার আসব, এখন চলি।

প্রাণকেষ্টদা চলে গেলেন এবং এই সন্তোষ নিয়েই বোধহয় গেলেন যে আমাকে যা বোঝানর তা বুঝিয়ে ছেড়েছেন তিনি। ভোটের পর আবার সেদিন এলেন প্রাণকেষ্টদা। এবারে সকালবেলা। খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছি। ঢুকেই বললেন, দেখলেন ত কংগ্রেস একদম ধরাশায়ী হয়ে গেল! বলেছিলাম না তখনি যে দেশের মানুষকে যত বোকা ভাবা হয় তাঁরা তা নন। সেই যে কোন বিদেশী পর্যটক বলেছিলেন না যে, এদেশের সাধারণ মানুষরা পুঁথিগত লেখাপড়া না জানলেও জীবনের বৃহত্তর প্রশ্ন যেগুলো, ধর্মাধর্ম ও সত্যাসত্যের সীমা নির্ধারণ, সেখানে তাঁদের মূল্যায়ন দেখলেই বোঝা যায় যে এজাতি খুব বড় একটা সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করছে। এখানে স্বৈরাচার কখনো চলেনি, আজো চলবে না।

আমার তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। হাঁ করে তাকিয়ে আছি প্রাণকেষ্টদার মুখের দিকে। এই ঘরে এই সোফায় বসে মাত্র সেদিন যে তিনি কংগ্রেসের মহিমা গেয়ে গেলেন! ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের ওপর, ভোটে বামপন্থী জোট জয়ী হবার সঙ্গে সঙ্গেই! সহসা কোন কথাই বলতে পারলাম না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রাণকেষ্টদা একটু অপ্রসন্ন হলেন। বললেন, বুঝতে পারছি আপনাদের খুব মনে লেগেছে। আরে মশাই, যতই চোখের জল ফেলুন, কংগ্রেসকে আর খাড়া করা যাবে না। মানুষ মরে গেলে তাকে চিতায় তুলে দিতে হয়। প্রতিষ্ঠান মরলে তাকেও আঁকড়ে থাকতে নেই। দিন বদলেছে বদলাচ্ছে।

কবিতা

সেতু

একদিন ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে চলার ঝোঁকে
চলতে চলতে এসে পড়লাম মাঠের মাঝে।
সবুজে সবুজ প্রকাণ্ড মাঠ, মেঘের কোলে
গলাগলি করে ঘুমোয় তখনো কুয়াসা মেখে।
যত দূর চাই লোকালয় নেই, হয়ত কেউ
কোন দিন ভুলে সেপথে হাঁটে না। মস্ত বিল
ঝিলমিল করে সে মাঠের কোলে দুকূল ঘিরে।

তারি বুক জুড়ে অদ্ভুত এক কাঠের সাঁকো,
কত কাল আগে কারা গড়েছিল কেই বা জানে?
ভোর বাতাসের আলতো ছোঁয়ায় আপনি দোলে,
কুহকী ছায়ায় ডেকে নিয়ে যায় সে কোন্‌খানে?
খেয়াল খেলায় পায়ে পায়ে ভাই সে সেতু বেয়ে
পার হয়ে আসি হলদে বেগুনি ফুলের দেশে,
সারস যেখানে পাখা ঝাপটায় কিনারা ছুঁয়ে,
ভীরু প্রজাপতি সাঁতরিয়ে ফেরে পাখনা মেলে।

দুটি হাত ভরে ফুল নিতে নিতে রৌদ্র হল।
কিনারায় ফিরে গাঙশালিকের জটলা করা
ঝাউ ঝাড় আর শরবন ভেঙে বালির বুকে
খুঁজে হয়রান, কাঠের সে সাঁকো পাইনে আর।
সাঁতার জানিনে, কূলে বসে বসে কান্না আসে,
ফুলের স্বপনে ভুল করে কেন এপারে আসা?

গান ভেসে আসে

গান ভেসে আসে
দূর গৃহবাতায়নে রূপসীর গান।
অলস চোখের পাতে কুয়াসার মত ঢুলু ঢুলু,
বাতাসের কাঁপা ঠোঁটে ফুলের চুমোর মত মিঠে,
পাখির ডানার গায়ে বনের ছোঁয়ার মত লঘুলীলায়িত,
গান ভেসে আসে।

গান ভেসে আসে,
দূর গৃহবাতায়নে পিয়াসীর গান।
পাইন বনের কোলে সোনালি জলের ঝিলিমিলি,
ফসলের পাকা শীষে ফড়িঙের পাখনার দোলা,
আকাশের বোবা চোখে তাকান তারার মত ভীরু,
গানে ভেসে আসে।

গান ভেসে আসে,
দূর গৃহবাতায়নে উদাসীর গান।
অতল ব্যথার গান আহত আশার রঙে লাল,
পুরান মদের গান ঝাঁঝালো মধুর নেশা ধরা,
কোঁকড়া চুলের পরে আলতো মুঠির মিঠে গান,
গান ভেসে আসে।

শকুন্তলা

তোমার চোখে কি ঘুম নেই মোটে শকুন্তলা?
রাত্রি বারোটা এখনো পড়ছ, কি এত পড়া?
পথ নিরিবিলি শহর ঘুমোয় ডিসেম্বরে,
তোমার টেবিলে তবু আলো জ্বলে শকুন্তলা!

বই ফেলে দাও, উঠে চলে এস শকুন্তলা,
উষ্ণ কোমল বিছানা বিছান রয়েছে বৃথা,
আদুল শরীরে এলোচুলে এস লতিয়ে পড়,
আর পড়া নয়, রাত ঢের হল শকুন্তলা!

যৌবন যায় শুভরাত যায় শকুন্তলা,
পাশের বালিশ বুকে চেপে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে,
না-পাওয়া-বঁধুর বাহুবন্ধন নিবিড় ঘুম—
সোনালি স্বপনে লীন হয়ে যাও শকুন্তলা।

জমাট ধোঁয়ায় ধূসর ধরণী শকুন্তলা,
আমি জেগে জেগে চপল হাওয়ায় পরখ করি
তোমার নিটোল নরম গায়ের কুমারী ছোঁয়া,
সাগরদোলার ছলছল ছবি শকুন্তলা।

আমি যে অচেনা রাত্রের সাথী শকুন্তলা,
খোলা জানালার টুকরো আকাশে আমার বাসা,
তোমার টেবিল আলোর কিনারে কামনা ভরা
চোখের ফানুস একলা ওড়াই শকুন্তলা।

অশ্বারোহী

কতদূর তুমি যাবে এই রাতে অশ্বারোহী ?
জংলা পথের পাশে দেখ এই সরাইখানা,
কঠিন নয়ক চা ও চাপাটি বানিয়ে আনা,
এস পাশাপাশি দুজনায় বসি দুকথা কহি।

ক্ষমা কর আজ, আমি চলে যাই হে সুন্দরী,
আমি চলে যাই ফুলকুসমায় কংসাবতীর পার,
দুশো বছরের পুরান বাড়ির একটি কক্ষে তার
মানসী আমার রয়েছে যেখানে চির প্রতীক্ষা করি।

তুমি চলে যাবে ? পউষ রাত্রি কি করে কাটাই আমি ?
যাত্রী যা আছে, সবাই ঘুমোয় যে যার ঘরে,
আমি বসে আছি একা জানালায়, মন যে কেমন করে,
ভোর হয়ে যাক, রাতটা কাটাও এখানে থামি,

আজকের মত শুধু ক্ষমা কর হে সুন্দরী
থাকবে স্মরণে দিয়েছ যে ডাক করুণা করে,
দুর্গম রাতে জঙ্গল পথে না গেলে মরে,
ফেরার বেলায় দেখা দিয়ে যাব শপথ করি।

মধ্যাহ্ন

বসন্তের মধ্য দিন,
বাজছে কার ম্যাণ্ডোলিন ?
অলস চোখ, ঘুমের ঝোঁক
প্রজাপতির পাখায় লীন

তপ্ত বায়ু লাগছে গায়,
ফুলের বাস মূর্ছা যায়,
ভাবছি ভাই জীবনটায়

অর্থ নাই—স্বস্তিহীন!

বসন্তের মধ্য দিন
কাঁদছে কার ম্যাণ্ডোলিন?
গানের সুর নিকট দূর
টানছে রেশ করুণ ক্ষীণ।
উদাস মাঠ, নদীর ঘাট,
বন্ধদ্বার দোকান পাট,
পথিক নাই, ভাবছি ভাই
জীবনটাই খুব কঠিন!

দেখা

প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা হয় টাইগার হিলে,
তখন উঠছে সূর্য, কুয়াসার ধূসর মলাট
উলটে কুমারী উষা দেখা দেয় প্রসন্ন ললাট,
তুমি তারই মত যেন হঠাৎ দিগন্তে দেখা দিলে!
তারপর ফের দেখা মালাবার সমুদ্র সলিলে
যখন বিস্মিত হয়ে দিনান্তের আকাশ বিরাট
লাগে নীলে অপরূপ, হাতে ধরে সন্ধ্যার কপাট
দিবস নিচ্ছে ছুটি, হঠাৎ সম্মুখে এসেছিলে।

তারপর থেকে আমি খালি ঘুরি পথে ও প্রান্তরে,
হিম ঢাকা আলমোড়ায়, আতপ্ত পঞ্জাবে রাজস্থানে,
নদী গিরি সমাস্তীর্ণ শ্যামল আসামে আরাকানে,
হঠাৎ হাওয়ার মত আস যদি ঝির ঝির করে।
আশার পানসী নৌকা ঘুরে মরে প্রমত্ত তুফানে,
তুমি কি ভিড়িয়ে তাকে দেবে নাক নিশ্চিন্ত বন্দরে।

কবিতা

কবিতা ঘুমিয়ে আছে, বুকে মুখে ওড়ে এলোচুল,
অলস শীতের রাতে আলুথালু কবিতা ঘুমায়,
ফেল না নিশ্বাস তার নিমীলিত চোখের পাতায়,
শিয়রে রেখ না হাত, ভেব না হবে সে মহা ভুল

কবিতা ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়েছে ভীরু জুঁইফুল,
চুপি চুপি কাছে এস, টিপে টিপে অতি লঘু পায়,
পাণ্ডুটে জ্যোৎস্নালোকে, ঝিলিমিলি আলোয় ছায়ায়
দূর থেকে দেখ তার দুই চোখ ঘুমেতে আকুল।
বিজন শীতের রাতে যদি বুকে কথা জমে ওঠে,
আজ তা গোপন কর, যদি চোখ জলে ভরে আসে,
নীরবে ঝরিয়ে দিও পদতলে হিমজাগা ঘাসে,
খুঁজ না জবাব তার কবিতার ঘুমে ভেজা ঠোঁটে।
তোমার ছোঁয়ায় যদি কবিতার কাঁচা ঘুম টোটে,
সোনার স্বপন ভেঙে কবিতা সে মিলাবে বাতাসে।

বয়স

সব ক্ষয় সব ক্ষতি নির্বিবাদে এস ভুলে যাই,
আবার আরম্ভ করি পথ চলা ফের শুরু থেকে,
কালের রথের চাকা গেছে যত দাগ এঁকে এঁকে
এস সব মুছে ফেলি সযত্ন মার্জনে পুনরায়।
নির্জন নদীর ধারে সেই চেনা গাছের ছায়ায়
পাশাপাশি ফের বসি। ডালে ডালে খ্যাপা হাওয়া লেগে
খসুক ফুলের পাপড়ি, কাকলি উঠুক ফের জেগে
স্মৃতির কবর থেকে হারান তোমাকে খুঁজে পাই।
বুঝছি হাসছ শুনে, কেননা জান তা অসম্ভব।
স্বপ্নের ময়ূরপঙ্খী কালীদহে ডোবে অকস্মাৎ
একদিন যেতে যেতে। সময়ের হিম পদপাত
ছোঁয় অঙ্গ, সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় সব অনুভব।
তার মানে যৌবনের স্বর্গোদ্যানে বয়স্ক বাস্তব
আসছে লোভীর মত বাড়িয়ে নির্লজ্জ দুই হাত।

সিঁড়ি

জনমানবশূন্য মাঠের বুকে
পরিত্যক্ত জীর্ণ প্রাসাদ বহুদিনের।
ভাঙাচোরা উঠানের ওপর তার আসর জমিয়েছে
অজস্র বাবুই তুলসী আর কালকাসিন্দার ঝাড়,

যার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে
দৌড়ে পালাক অন্ধকার গন্ধগোকুল একটা,
উলটোদিকের ঘনতর অন্ধকারে।
অদেখা প্রেতের থাবড়ার মত
চটাস করে গালে এসে পড়ল
উড়ন্ত চামচিকের ডানার হিমস্পর্শ একটা,
ভাঙা খড়খড়ির ফাঁকে ঘুম ভেঙে গেল যার,
অকস্মাৎ আসা মানুষের পায়ের শব্দে।

উঠানের ডানদিকে পাকে পাকে মোচড় খেয়ে
ওপরে উঠে গেছে পুরান কাঠের সিঁড়ি,
মিশেছে গিয়ে দোতলার চাতালে,
যেখান থেকে আলসের ফাটলে গজান
অসহায় অশ্বত্থের গোটা দুই ডাল ঝুঁকে রয়েছে
নীচের নিরবলম্ব শূন্যতায়।
দেশলাই কাঠির নিষ্প্রভ আলোয়
পরিত্যক্ত ভগ্ন প্রাসাদের
অন্ধকারাস্তীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে
উঠে যাচ্ছি আকাশের সমাপ্তিহীন শূন্যতায়—
যেন উঠছি দুর্নিরীক্ষ্য ভবিষ্যতের চূড়ায়,
ক্ষীণ আশার আলোটুকু সম্বল করে
একান্ত নড়বড়ে বর্তমানের সিঁড়ি বেয়ে।

ফসল

ক্ষেতের ফসল পাকল।
মাঠে মাঠে চাষার আশা।
ধানে ধানে সোনা হয়ে ফুটল।
ওগো চাষী বউ,
হলদে রোদ্দুরে পিঠে চুল এলিয়ে দিয়ে
বস এই ক্ষেতের কিনারে।
আজ আমি তোমার গান গাইব।

গঞ্জের ঘাটে মহাজনি নৌকো
নোঙর ফেলেছে।
ভাঁট, আশশ্যাওড়া, আকন্দ ভরা
মেটে পথে ককিয়ে ককিয়ে
চলেছে গোরুর গাড়ী।
চারদিকে ঝলমল করা জীবন,
যৌবনের প্রদীপ্ত শিখা ধানের শীষে।
ওগো চাষী বউ,
এই আলোয়
নীল নরম ঘুম জড়ান দীঘির মত
কালো চোখ তুলে তাকাও আমার দিকে।
আজ আমি তোমার গান গাইব।

শান্তিনিকেতন

সব কান্না গান হয়ে যায়,
তারা হয়ে ফোটে সমস্ত তৃষ্ণা
হৃদয়ের নিভৃত কামনারা একে একে
সোনার পাপড়ি মেলে যেখানে ফুলের রূপে,
হারান শৈশবে
মায়ের দুধ হয়ে এসে ধরা দেয় যেখানে
নূতন ধানের মঞ্জরীতে—
সেই চির আকাঙ্ক্ষার শান্তিনিকেতনে
এসেছি।

গ্রাম মাঠ ও পথ পেরিয়ে
গেরুয়া খোয়াইয়ের রুক্ষ চড়াই ভেঙে
শীর্ণ রূপালি কোপাইয়ের কূলে
আম, আমলকী, আর শাল সেগুনের
শান্ত ছায়ায় ঢাকা, পাখিডাকা
এই নীড়ে এসেছি।

বন্ধুর ভুবনডাঙার বুকভরা

প্রাণবন্ত সবুজ,
তোমাকে ভালবেসেই ত আজ
ভালবাসতে পারলাম সকলকে।
তোমাকে চিনেই ত চিনলাম আমার আমিকে,
যে আমি ঘুমিয়েছিল এতকাল
আত্মবিস্মৃতির অতল পাতালে।

দীনেশ গুপ্ত

অজস্র বৃষ্টির জুঁই ফুল ঝরছে
কান্না হয়ে,
আমার মনের কান্নাও মিশিয়ে দিলাম তার সঙ্গে।
তোমার শেষ চিঠির জবাব,
আর তোমার চাওয়া সেই অনাগত দিনের কবিতা
পৌঁছে দেওয়া হল না তোমার হাতে!
আলিপুরের লোহার ফটকের ওপরে
আবার শীতের সকালে ফুটবে
রাশি রাশি মরশুমী ফুল,
ভ্রষ্টনীড় শালিকেরা বসন্তের বিকেলে
আবার বসবে এসে
কোমর বাঁকা সেই বাদাম গাছের ডালে।
সেদিন কি কেউ জানবে
একদিন মায়ের মমতার মত মধুর হয়ে
এখানে মৃত্যু নেমেছিল,
নেমেছিল সারা দেশের অশ্রু
বর্ষার অফুরন্ত বৃষ্টি হয়ে ?
তুমি বলেছিলে,
তোমার মুক্তি আসবে অগ্নিরথে।
এল সে মুক্তি আজ দশ দিক আলো করে।
আমার মুক্তি কোথায় ? কতদূরে ?

সাপ

ফণার হাতছানি দিয়ে ডাকছ তুমি।

তোমার চকচকে দুটি চোখে জ্বলছে মিনতি।
হিম দেশের কুণ্ডলীতে
অলস আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ পাক খাচ্ছে অবিরাম।
গুহার গহ্বর থেকে বেরিয়ে
বিভ্রান্তির ফাঁদ পেতেছ তুমি
লক্ষ লোকের এই চলাচলের পথে।

বিলোল ফণায় ফুটছে আরক্ত আফিঙের ফুল,
মসৃণ দেহে উপচে পড়ছে
বিচিত্র রঙের আমন্ত্রণ
অসতর্ক পথচারীকে ভুলের নেশায় আবিষ্ট করতে।
ওগো ভয়ঙ্করী, ওগো সুন্দরী বিষধরী,
কামনার সোনার পেয়ালায়
মৃত্যুর পানীয় তুলে ধরেছ তুমি
তৃষ্ণার্ত মানুষের ঠোঁটের আগে,
তাই ত ভয় পাই তোমাকে।

লেনিন

দূর থেকে ভেসে এল তোমার মহিমময় নাম,
তোমার উদ্দেশে রাখি প্রীতিনম্র প্রাণের প্রণাম।
ক্ষুধাক্লিষ্ট রাত্রি আর বঞ্চনা ব্যাহত রুক্ষ দিন,
ঘিরে ছিল আমাদের। তুমি ভাষা জোগালে লেনিন
আমাদের মূক মুখে। প্রাণে এল বাঁচার আস্বাদ,
ভগ্ন মেরুদণ্ডে দিলে পৌরুষের প্রদীপ্ত প্রসাদ।
ভুলেছি বশ্যতা ভয়, বীর্যবন্ত হে মহানায়ক,
আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তোমার আহ্বান জয়ী হক।
আমরা ছিলাম ছোট, বড় হতে দিয়েছ প্রেরণা,
তুমি ত মানুষ নও, তুমি চির জাগ্রত চেতনা!

জনযুদ্ধ

আকাশে মাটিতে লড়াই বেধেছে জোর
ভেঙে চুরমার যা কিছু যেখানে আছে,

পালিয়ে ভাবিস বাঁচাবি জীবন তোর,
মাথা লুকানর ঠাঁই কি কোথাও আছে ?
বহু কলঙ্ক মানুষ করেছে জমা,
বহু অনর্থে পৃথিবী হয়েছে ভারী,
কালের কলমে নেই নেই তার ক্ষমা,
আসে নির্দয় রোজকেয়ামত তারই।
আসে সুকঠিন সন্তাপহারী মার,
পরম পাবন জলে লেলিহান শিখা,
ভীরু কান্নায় বেলা না কাটিয়ে আর
ছুটে চলে আয় ছিঁড়ে কালো যবনিকা।
নে রে হাতিয়ার আপন শক্ত হাতে,
লড়ব আমরা মানুষের গৌরবে,
ক্ষুধা ব্যাধি ত্রাস থাকে যদি দুনিয়াতে—
বাঁচায় মরায় কিছু কি তফাৎ হবে ?

সাইরেন

মাঝরাতে ঘুম ভাঙে ধড়মড় করে উঠে বসি,
বিকট কান্নার মত সাইরেনে সতর্ক শাসানি :
নিরালোক শহরতলীর সঙ্কীর্ণ গলির একতলে
বিছানায় বসে বসে শুনি সেই দুর্বোধ্য গোঙানি।

জমাট রোমশ কালো কলকাতার সমস্ত শরীর,
আলোরা বুঁজেছে চোখ, কালো ঘোমটা প্রতি দীপাধারে,
চুরি খুন বলাৎকার, অন্ধকার কুটিল কুৎসিত,
প্রেতের মতন খালি ছুরি হাতে ঘোরে চুপিসাড়ে।

হঠাৎ গভীর রাত্রে হেঁকে ওঠে ভয়ার্ত সাইরেন,
সমস্ত সভ্যতা যেন ডাক ছেড়ে কাঁদে সেই স্বরে.
নিভেছে বুদ্ধির বাতি, মূঢ়তায় নিমগ্ন পৃথিবী,
বোমারু বাহনে তাই মনুষ্যত্ব ওঠে বায়ুস্তরে।

ফ্যান

একটুকু ফ্যান দেবে ? জানলার নীচে

ঠিক রাত্রি দশটায় শুনতে পেলাম
একটি করুণ কণ্ঠ। উঁকি দিয়ে দেখি
গোটা বার বয়সের বাচ্চা মেয়ে এক,
ছেঁড়া কানি কোমরেতে, কান্না ভেজা মুখ।
তখনি বসিছি খেতে চাকরি শেষ করে
রাত্রে বাসায় ফিরে। ধরে দিই তাকে
থালা শুদ্ধ ভাত মাছ। না খেয়ে সে বলে,
মা ভাই খায়নি কিছু—নিয়ে যাব বাবু?
চলে গেল গলি দিয়ে অন্ধ অন্ধকারে
অসহায় বাচ্চা মেয়ে। মনে হল ও ত
মেয়ে নয়, বাংলা মা-ই ঘোরে দ্বারে দ্বারে
একটু ফ্যানের জন্যে। সেই মুখখানা
মনে হতে ছ্যাঁৎ করে ওঠে আজও বুক।

মনকে

মনকে জিজ্ঞাসা করি, মন,
এত যে উদয়াস্ত করলে সুখের অন্বেষণ,
পেলে কি সাক্ষাৎ তার?
সমাধান হল কি সমস্ত জটিল জিজ্ঞাসার?
হা হা করে খালি হাসে মন।
বলে, ওটা পাওয়া নয়,
অফুরন্ত দীর্ঘ অন্বেষণ।
দিগন্তের নীল আর সমুদ্রের অতলের মত
অলভ্য গভীর শূন্য,
যত চাও, যত পাও, তত।
প্রেমকে জিজ্ঞাসা করি, প্রেম,
এত যে বুকের রক্তে জমালে নিকষে কষা হেম,
হল কি অভীষ্টলাভ,
একবার সে কথার দাও ত জবাব।
প্রেম হাসে দীপ্ত হাহা হাসি,
বলে, প্রেম ক্ষণিকের ফুল

দিবাশেষে হয়ে যায় বাসি।
নিশান্তের তারা আর ফাল্গুনের কামনার মত
অলীক আশ্চর্য প্রেম,
যত চাও যত পাও, তত।

আগুন

আগুন জ্বলছে,
আগুনের জয় গাও।
টকটকে রাঙা দীপ্ত আগুন,
লকলকে শিখা সাপের মতন
উর্ধ্ব আকাশে উঠছে।
খিলান দালান স্তম্ভ মিনার,
পুরান পাপের আপাদ মস্ত—
জ্বলছে, ফাটছে ফুটছে।
আগুন জ্বলছে,
আগুন মুক্তিদাতা।
ক্ষণভঙ্গুর ক্ষমতার জড়
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম সে করে,
কিছুই রাখে না জমা।
চোরাই পুঁজির দৌলতদার,
দুষমণ ডাকু রাহাজানিবাজ,
কাউকে করে না ক্ষমা।
আগুন জ্বলছে,
আগুনকে পুজো দাও।
ঘৃতাহুতি দিয়ে কর আরো জ্বলজ্বলে।
অকারণ জল ঢালছ বেকুব,
এ আগুন নিভবে না।
বহু শতকের সঞ্চিত দাহ
নিশান তুলছে কালানল হয়ে,
এখনি মেটাও দেনা!

ঘুম

গাছের ছায়ায় বসে বসে একলা জিরোই।
মেঘ বৃষ্টি হীন,
আশ্চর্য সুন্দর নীল দিন।
আলো ঝিকমিকে
হলুদ ফুলের সমারোহ দিকে দিকে।
সবুজ পাতায়
আম জাম গাছের মাথায়
রুপোঝরা রোদ নামে,
ধানভরা মাঠের কিনারে
নদী পারে গ্রামে,
শালিক ছাতারে
কাতারে কাতারে
কিচিকিচি মিছিমিছি কেবল চেঁচায়।
নাকি গান গায়?
টাট্টু ঘোড়া ছোটে সাঁকো দিয়ে,
বাঁশের চুবড়ি কাঁধে নিয়ে
গাঁয়ের মেয়েরা যায় হাটে।
মাঠে
ছেলেরা কপাটি খেলে
বই খাতা ফেলে।
চেনা সবই তবুও নূতন,
জেগে দেখা স্বপ্নের মতন!
আলতো বাতাসে
ঘুম আসে।
গাঢ় নীল ঘুম,
পরীদের পায়ের নূপুর
যেন ঘাসে ঘাসে বাজে ঝুম ঝুম।
ময়ূর গলার রং
রং যেন কলমির ফুল,

ঘুম আসে অচেল অকূল।
চেতনা জড়িয়ে যায়,
হাওয়ায় ছড়িয়ে যায় সব,
দূরের কাঁসির ঢং ঢং
শুনি যেন অপরূপ রব।
চোখে ঘুম নামে,
অন্ধকারে
নদীপারে
ধানক্ষেতে, গ্রামে।
আনাগোনা থামে
এপারে ওপারে।
ফুল পাখি পাতা ঝরে যায়,
আলো মরে যায়,
হাট মাঠ লোকজন ছায়ায় মিলায়।
চেনা সবই, তবুও নূতন,
ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মতন!

বাইশে শ্রাবণ

এখানেই সব শেষ? দিগ্বিজয়ী নাম
এরপর স্মৃতিমাত্র! সময়ের সস্মিত প্রণাম,
তাও ক্রমে শ্লথ হবে
শুধু গান যাবে ভেসে ভেসে,
কাল থেকে কালান্তরে আপন সৌরভে,
প্রশ্ন হবে রচেছিল কে সে?
অথচ যখন ছিলে,
জলে স্থলে আকাশের নীলে,
প্রেমে ছিলে, স্বপ্নে ছিলে,
ভবনে ভুবনে ব্যাপ্ত ছিলে—
ব্যক্ত ছিলে দীপ্ত জ্যোতির্ময়!
মৃত্যু কি কঠিন সত্য! জীবন কি আশ্চর্য বিস্ময়!